সমুদ্রগুপ্ত রচিত

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গ ভঙ্গ

সমুদ্র গুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭৫

মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : ১২·৫০

২৫৩৭

যে কালের কথা লিখছি, সে আমার চোখে দেখা নয়। পড়তে পড়তে জানা, জানতে জানতে লেখা।

জানা ছিল বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম আদি বীজ। পরাধীনতা মোচনের পরম বীজমন্ত্র। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল এই আন্দোলনের ঝড় হাঁকানো দিনের মধ্যে।

কিন্তু সবিস্তারে জানা ছিলনা কবে থেকে, কেমন করে সেই ঝড় কোন্ ঐক্যের রাখী হাতে বেঁধে জমাট বেঁধেছিল বাংলার অগ্নিকোণে, কারা সেই ঝড়ের বুকে ভরে দিয়েছিল অপরাজেয় প্রাণ, কারা মুখে তুলে দিয়েছিল মৃত্যুহীন গান, কারা তার ললাটে এঁকে দিয়েছিল রক্ত চন্দনের তিলক।

সবই পড়তে পড়তে জানা, জানতে জানতে লেখা। ঐতিহাসিক নই। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করার দিকে পা বাড়াইনি। আমার কাজ মৌমাছির মত। এ ফুল ও ফুল থেকে যেখানে যতটুকু মধু পেয়েছি এনে জড়ো করেছি একটা চাকে। যাঁরা পড়বেন, তাঁরা রসাস্বাদ পেলেই প্রকাশকের কাছে আমার দেনা শোধ, পাওনা শুরু।

কিন্তু সেটাই আমার পরম লাভ নয়। লিখতে গিয়ে যে-প্রদীপ্ত যুগের জীবন্ত, জাগ্রত, জ্বলন্ত দিনগুলোর মধ্যে আমার দিনরাত্রির চিন্তা ঘুরে বেড়িয়েছে, লিখতে লিখতে মনে হয়েছে তার মহান স্রষ্টাদের নিশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ এসে যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার চেতনা।

আজকের এই নীতিভ্রষ্টতার, নৈরাশ্যের, নীরক্ত সমাজ জীবনের ভীষণ শীতলতার মধ্যে যদি আজীবন এই উষ্ণ স্পর্শটুকুকে ছুঁয়ে থাকতে পারি, ধন্য হবো।

॥ বঙ্গবিভাগ ॥

রাজার শাসিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারে নি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ !
শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগ-যুগান্তের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ-রেখাগুলি স্থির দৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি। শুধু ক্ষুণ্ন রেখা
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ-কঠোর ? এই ব্যবচ্ছেদ খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাক, তরঙ্গ-ভৈরব
বঙ্গ বক্ষ ক্ষত বিগলিত মেঘনাদ,
রক্তগঙ্গা—পূণ্যস্পর্শ যার দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে, দিবে বরাভয় দান।

বিপিনচন্দ্র পাল

॥ মাথায় বজ্র। বুকে বজ্রানল ॥

বঙ্গভঙ্গ

প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! প্রতিবাদ!

পদ্মা আর গঙ্গা মিলিয়ে যত লক্ষ ঢেউ, তত মানুষের প্রতিবাদ।

দুই জাতি। কিন্তু হৃৎপিণ্ড এক। হৃদস্পন্দনে এক। সেই হৃৎপিণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করতে এগিয়ে আসছে এক উদ্যত খড়্গ।

প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! প্রতিবাদ!

মন্দিরে শঙ্খ-ঘন্টা। মসজিদে আজান। দুই এসে মেশে এক আকাশের নীচে উজ্জ্বল সূর্যোদয়ে, উদাসী সন্ধ্যায়।

ওপারের 'গহনা' বেয়ে মাঝিরা আসে এপারে। গলায় ভাটিয়ালির টান। এপারের মানুষ যায় ওপারে। গলায় বাউলের তান। সুর দুটো। কিন্তু ভাষা এক।

জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তরের সেই ভাষার নিবিড় মিতালী এসে মিলেছে যে লোহার বাসর ঘরে, একটা গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে তারই ভিতরে ঢুকতে চাইছে কাল-কেউটে। ফণায় নীল বিষ, বিচ্ছেদের, বিরোধের, বিদ্বেষের।

প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! প্রতিবাদ!

"গত দেড়শ' বছরে বাঙালীর বুকে এত বড় মৃত্যুবান আর বাজে নি।" লিখলে হিতবাদী।

আর সেই মৃত্যুবানেরই আরেক নাম বঙ্গভঙ্গ। লর্ড কার্জনের তিনবছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

প্রতিবাদের এক সূত্রে মিলেছে দুই বাংলা। দুই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান। মিলেছে অভিজাত ও অভাজন সকল শ্রেণীর মানুষ। কে ছাপছে, কে ছড়াচ্ছে কেউ জানে না। কেবল হাতে হাতে ঘুরছে হাজার হাজার ইস্তাহার, হাতের মুঠোকে বজ্রমুষ্ঠি করে তোলার ডাক দিয়ে। দুই বাংলারই পত্র-পত্রিকা জ্বালাময় অক্ষরে লিখে চলেছে একটি জ্বলন্ত শব্দ—

প্রতিবাদ!

শুধু পূব-বাংলা থেকেই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেছে সত্তর হাজার লোক। দুমাসেই দুশ'টি প্রতিবাদ-সভা। ভঙ্গ-বঙ্গের রচয়িতা কার্জনের বিরুদ্ধে, কার্জনী-কুশাসনের বিরুদ্ধে, রাজপথে জনপদে জনস্রোতের জোয়ার, যৌবন-জল-তরঙ্গ।

তখনো ভারতবর্ষের মাটিতে পা পড়ে নি। সত্য নির্বাচিত হয়েছেন ভারতবর্ষের বড়লাট। সেই উপলক্ষে লণ্ডনে সংবর্ধনা সভা। কার্জন উঠলেন ভাষণ দিতে। বিনীত কণ্ঠস্বর।

"ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। তার অধিবাসী, তার ইতিহাস, তার শাসনপ্রণালী, এবং তার সভ্যতার বহুমুখী বৈচিত্র্যময়তার আমি অনুরাগী।"

অন্য আরেক সভায়—

"ভারতের রাজ-প্রতিনিধির প্রধানত দুটি গুণ থাকা চাই—সাহস ও সহানুভূতি।"

এইখানেই শেষ নয়। আরও এক ভোজসভায় কার্জনের বিবৃতি ছিল—ইংরেজ জাতির বাণিজ্য বা সাম্রাজ্যের স্বার্থে নয়, ভারতবর্ষকে তিনি শাসন করবেন ভারতীয় স্বার্থে।

"বাহুবলের সাহায্যে ইংরেজ জাতি একদিন যা অর্জন করেছে, তা রক্ষা করতে হবে ন্যায়ধর্মের সাহায্যে।"

এর আগে আর কোনো ভারত-শাসকের কণ্ঠে শোনা যায় নি

এমন সুস্পষ্ট ভারত-প্রেম-কথা। দোলা লাগল ভারতবাসীর মনে। যাক্, এতদিনে বিধাতা সহায়! এতদিনে ভারতবর্ষের কপালে জুটল এমন এক ভারত-বিধাতা যিনি বুদ্ধিতে, চিন্তায়, বিবেকে বড় মনের মানুষ।

কার্জন যে সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসতে আসছেন, এদেশের আকাশে তখন অন্ধকার। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়—

"১৮৯৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন বোধ হয়েছিল। সরকারের দমননীতি ও তার ফলে গণ-বিক্ষোভে এর প্রকাশ দেখা যায়। তার উপর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া দেশের উপরে পড়েছিল। প্লেগের প্রতিষেধক কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা পুনা শহরে এমন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে জনসাধারণের উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। এর পরই দুজন ইংরেজ কর্মচারী হত্যা, নাটু-ভ্রাতাদের নির্বাসন এবং বোম্বাই প্রদেশে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের উদ্‌ঘাটনে সমগ্র দেশে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই বিক্ষুব্ধ সময়েই লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন।"

নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের ইতিহাস এবং বোম্বাইয়ের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ঘটনাটা না জানলে এই মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশের পটভূমিকাকে চিনে নিতে অসুবিধে হবে।

১৮৯৭। বোম্বাই আর মহারাষ্ট্রে প্লেগ আর দুর্ভিক্ষের মহামারী। দুর্দিনের দুঃখমোচনে এগিয়ে এলেন তিলক। প্রথমে চাইলেন সরকারের সাহায্য। পেলেন না। শেষে নিজের পরিশ্রমে, নিজেদের চেষ্টায় অল্পমূল্যে অনাহারীকে অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু প্লেগ? তিলক তার জন্যে হাসপাতাল খুললেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চলল রোগী দেখা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে সেবা। শহরের বাইরে তৈরি হল ছাউনি। যারা আক্রান্ত হয় নি তাদের রক্ষার জন্যে।

কিছুদিন পরে সরকার পক্ষের টনক নড়ল অবস্থার ভয়াবহতা

লক্ষ্য করে। প্লেগ দমনে সরকার নিযুক্ত করলেন গোরা সৈন্য। গোরা সৈন্যেরা ঘরে ঘরে ঢুকে গা টিপে টিপে দেখতে লাগল প্লেগ হয়েছে কিনা। এই গা টিপে দেখার হাত থেকে মহিলাদেরও নিস্তার নেই। গৃহস্থের চোখে মুখে আতঙ্ক। একি উৎপাত। তিলকের কাগজ 'মারাঠা' লিখলে—'যাহারা শহরে রাজত্ব করিতেছে (অর্থাৎ প্লেগ দমনের কাজে নিযুক্ত) তাদের চেয়ে প্লেগ ভাল।' গোরা সৈন্যদের এই নির্লজ আচরণের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন সর্দার নাটু। প্রতিবাদের অপরাধে তাদের দুই ভাইয়ের ঘাড়ে ঘা পড়ল নির্বাসন-দণ্ডের।

এরই কিছুদিন পরে পথিমধ্যে বন্দুকের গুলিতে নিহত হলেন দুই ইংরেজ রাজকর্মচারী। একজন লেফটেনাণ্ট আয়ার্স্ট। আরেকজন মিঃ র‍্যাণ্ড। তিনি ছিলেন প্লেগ-অফিসার। হত্যাকারীরা হলেন দামোদর আর চাপেকার নামক দুই মারাঠী যুবক। সারা দেশ জুড়ে হুলুস্থুল। সরকারী কাগজের রণচণ্ডী মূর্তি। তিলকও পেছপাও নয়। তাঁর 'কেশরী' আর 'মারাঠা'ও সরকারী-জুলুমের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। সরকার ভেবে নিলে সংবাদপত্রই এই গুপ্তহত্যার প্ররোচক। তিলকই যত নষ্টের গোড়া। বাঁধো ওর হাত-পা। হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পরে তিলক গ্রেপ্তার।

পুনা শহরে শুরু হল পিউনিটিভ পুলিসের দাপট। তারপর এল সংবাদপত্রের টুঁটি টিপে ধরার চেষ্টা।

রমেশচন্দ্র দত্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু সিডিশান বিল এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের পক্ষে নন। লণ্ডনের 'ডেইলি নিউজে' লিখলেন এই দুটি সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধেই দুটি কড়া চিঠি। "সিঁধেল চোরের সুবিধার জন্য রাস্তার বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া আর সন্দেহবশত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা একই কথা।"

রমেশচন্দ্র দত্ত তখন বিলেতে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে

ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আর আধুনিক অর্থনীতির গবেষণায় মগ্ন। রাজকার্য থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে নয়। নিজস্ব অধ্যাপনা-গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে সাময়িক প্রবন্ধ লেখা। ইংরেজ শাসনের আগে ভারতবর্ষের মহাঅতীত, ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে রাজনীতির ভবিষ্যৎ, অর্থনীতির বর্তমান, এই হল তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর মূল বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার কথা প্রসঙ্গে বিনয়কৃষ্ণ দেবকে বলেছিলেন—"দত্ত সাহেব বেদের বাংলা-অনুবাদ করছেন আবার ভারতের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চিন্তা করছেন, এ কী কম প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। এবার তিনি যখন দেশে ফিরবেন আমাকে তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দেবেন।"

দুই মহান পুরুষের মিলন ঘটে গেল লণ্ডনে। ১৮৯৯-এ। মধ্যস্থ নিবেদিতা। অল্প আলাপেই রমেশচন্দ্রের অনুরাগিণী। রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দের হাতে তুলে দিলেন তাঁর স্বরচিত শ্রদ্ধাঞ্জলী—'Civilization in Ancient India'—বই। স্বামীজী সে বই পড়ে মুগ্ধ। এক চিঠিতে জানালেন তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

"প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এমন সুনিপুণ চিত্র এর আগে আমি আর কোন বইতে পাই নি; নিঃসন্দেহে ইহা আপনার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে স্বীকৃত হবে। প্রথম যৌবনে একদা আপনার 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাস দুইখানি পাঠ করে আমি যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি আপনার সম্পর্কে আমার অন্তরে শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি। আমাদের কর্মের ক্ষেত্র পৃথক হলেও চিন্তার ক্ষেত্রে বোধ হয় আমি আপনার সগোত্র।"

রাজনৈতিক প্রবন্ধ-রচনায় তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা, নিপুণ বিশ্লেষণ, ক্ষুরধার যুক্তি। তাঁর অর্থনীতির প্রবন্ধাবলীই প্রথম ভারতবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল—'এই শাসনের নাম শোষণ'। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক চিন্তা ভিন্ন বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের 'বয়কট' এত সহজে হতে পারত কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে তিনি শুধু ইতিহাস লেখেন নি, ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।"

"এক গরুর গাড়ি বোঝাই কংগ্রেস বক্তৃতা অপেক্ষা রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি অনেক মূল্যবান।"—এই ছিল এন. এন. ঘোষের মতো নির্ভীক সমালোচকের মত।

দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তখন খুব জনপ্রিয় পত্রিকা। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশব সেন। তখন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। নরেন্দ্রনাথ খুঁজছিলেন একজন লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা। রমেশ দত্তের বড় ভাই যোগেশচন্দ্রকে গিয়ে ধরলেন নরেন্দ্রনাথ। তুমি একটু বলে-কয়ে বুঝিয়ে বল না, রমেশকে ঐ দায়িত্বটা নিতে। দাদার অনুরোধে রমেশচন্দ্র রাজী। এক একটা প্রবন্ধের জন্যে দেওয়া হবে দু'গিনি দক্ষিণা। ১৮৯৮এর সেপ্টেম্বর থেকে রমেশচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র লণ্ডনের সংবাদদাতা হলেন।

রমেশচন্দ্র লণ্ডনে থাকতে থাকতেই কার্জনের মনোনয়ন। লণ্ডনের রাজনৈতিক মহলে তাঁর ছিল অবাধ আসা-যাওয়া। ঘনিষ্ঠ সংযোগ। হাউস অব কমন্সের নিয়মিত শ্রোতা, বহু রাজনৈতিক সংগঠনের তিনি সম্মানীয় বক্তা। ১৮৯৮এর মে মাসে মৃত্যু ঘটল প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের। 'ন্যাশনাল রিফর্ম ইউনিয়ন' নামে রাজনৈতিক সংস্থা থেকে আমন্ত্রণ এল ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কিছু বলার জন্যে। তাঁর সেদিনের বক্তৃতা সমাদৃত হয়েছিল বিপুল করতালিধ্বনিতে।

'ইণ্ডিয়ান মিরর' হাতে পেলে বাংলাদেশ তাই আগে পড়ে

রমেশ দত্তের লেখা। কার্জন ভারতের নতুন ভাইসরয় নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিররে' লিখলেন—

"কার্জনের দক্ষতা আছে, আছে প্রতিভা। আছে নিজের প্রতি গভীর আত্মবিশ্বাস। একথা তাঁর নির্মম শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে। আমার মনে হয়, কোনও গুণ নেই এমন একজনের চেয়ে ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদে কার্জনের এই নিয়োগ বরং মঙ্গলের, যাঁর আত্মপ্রত্যয় আছে, প্রত্যয়কে কাজে পরিণত করার সাহস আছে। আমার বিশ্বাস তাঁর শাসনে লর্ড এলগিনের পর ভারতবর্ষে পরিবর্তনের হাওয়া বইবে।"

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রমেশচন্দ্রর এই একটি ভবিষ্যদ্বানীই বোধহয় ব্যর্থ। কিংবা আদৌ ব্যর্থ নয়। কার্জনের শাসনে ভারতবর্ষে যে পরিবর্তনের হাওয়া বয়েছিল—তা দক্ষিণের মৃদুমন্দ মলয় সমীরণ নয় অগ্নিকোণের প্রবল প্রমত্ত ঝড়। ঝড়ের ঘূর্ণি।

রমেশ দত্তর মন্তব্য ভারতবাসীর মনের গোপন প্রত্যাশাকে আরও জাগিয়ে দিলে। চোখে দেখার আগেই কার্জনের জন্য ভারতীয় নেতাদের মনের কোণে পাপড়ি ছড়িয়ে ফুটে উঠল আন্তরিক অনুরাগের রঙীন ফুল। অবশ্য বছর না পেরোতেই ফুল শুকিয়ে গিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছিল তীক্ষ্ণ ফলার কাঁটা। পরের অধ্যায়ে সেই কাঁটার বেড়া দেওয়া দিনগুলোয় সব কিছুই বদলে গেল। কার্জনকে যারা ভেবেছিল কাছের মানুষ, কাজের মানুষ, তারাই তাঁকে উপাধি দিলে 'কুখ্যাত কার্জন'।

রমেশচন্দ্রের সঙ্গেও লেগেছিল সংঘাত। প্রথমে আলাপ-আলোচনা। মুখোমুখি বসে। বিষয় রাজস্ব আর শাসন পরিষদে, অধিকসংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের দাবি। তারপর পত্রালাপ। বিষয়, ভারতের দুর্ভিক্ষ।

"বিগত চল্লিশ বৎসরে দশবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং দেড়কোটি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে।" কেন? কার্জনের

কাছ থেকে যে সরকারী জবাব এসেছিল—তা দয়িত্ববানের সদুত্তর নয়। দায় এড়ানো কৈফিয়ৎ। বিচক্ষণ রমেশচন্দ্র বুঝলেন—কার্জন স্বৈরাচারী। "An autocratic rule was his ideal".

আবার আগের কথায় ফিরে যাই।

কার্জন তখন ভারতবর্ষে আসেন আসেন। সেই সময় কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে মাদ্রাজে। আমন্ত্রণ এল আনন্দমোহন বসুর কাছে। সভাপতি হতে হবে। তাঁর শরীর তখন অসুস্থ। দেহ দুর্বল। বিশ্রামের শয্যাই তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তখনও আপন দেহের চেয়ে আপন দেশ তাঁর কাছে বড়। তাই তুচ্ছ হয়ে গেল আপনজনের বারণ। ডাক্তারের নিষেধ। আনন্দ মোহন গ্রহণ করলেন আমন্ত্রণ।

১৮৯৮। জাহাজের নাম S. S. Bancoora. সেই জাহাজে চেপে আনন্দমোহন সদলবলে রওনা হলেন মাদ্রাজের পথে। ২৩শে ডিসেম্বর। সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, গুরুপ্রসাদ সেন, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি কলকাতার নেতার দল।

জাহাজ এসে ভিড়ল মাদ্রাজের উপকূলে। ২৯শে ডিসেম্বর। ঐদিনই আনন্দমোহন সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন কংগ্রেস মঞ্চে। পাশে সুরেন্দ্রনাথ।

বহুদিন থেকেই এঁরা দুজন পাশাপাশি, দুঃখ-দুর্দশায়, রাজদ্রোহীতায়। জাতির সংকটে, জাতির সংকল্পে, জাতির সংগঠনে এই দুটি মানুষ সকল সময়ই বড় ঘনিষ্ঠ। এক আত্মত্যাগী বাসনার সূত্রে দুজনের নিবিড় আত্মীয়তা।

মেধাবী আনন্দমোহন বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারী পড়তে। ঘরে ফেরার আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লিখে রেখে এলেন এক স্মরণীয় স্বাক্ষর। তিনি সেখানে প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার। ফেরার মুখে বোম্বায়ে নেমে চোখে পড়ল

সেখানকার ছাত্র-আন্দোলন। তারা চাইছে দেশে জনশিক্ষার বিস্তার। স্ত্রী-শিক্ষার বিকাশ। তাদের নেতৃত্বে শহরে গড়ে উঠেছে কয়েকটা বালিকা বিদ্যালয়। তাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ আনন্দমোহনকে করল উদ্বুদ্ধ। ক্রমে এই উদ্যোগ থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল Decan Education Society. তিলক, গোখেলের মতো দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ জননায়কেরা তাঁদের দেশার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের প্রেরণালাভ করেছিলেন এই সোসাইটি থেকেই।

কলকাতায় ফিরেই আনন্দমোহন গড়তে চাইলেন ঐ রকম একটা সোসাইটি। সহকর্মী জুটে গেল, সুরেন্দ্রনাথ। নিজে শিক্ষক। ছাত্রসমাজ তাই তাঁর অপরিচিত নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনিও অনুভব করছিলেন নিছক পুঁথি-পড়ার গণ্ডীর মধ্যে দেশের এত বড় একটা প্রাণবন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রাখাটা হবে দেশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে পঙ্গু করে তোলা। আজ যে ছাত্র, কাল সেইই দায়িত্বশীল নাগরিক। জাতির উত্থান-পতন, আন্দোলন-আলোড়নের সঙ্গে ছাত্রসমাজের নাড়ীকে জুড়ে দিতে হবে, তাদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে রাজনৈতিক চেতনায়। দেশের সুখ-দুঃখের-সংগ্রামের-সংহতির অভিযানে তাদের হতে হবে অগ্রবর্তী বাহিনী।

তৈরি হল ছাত্র-সভা। নাম Calcutta Students Association. সভাপতি—আনন্দমোহন। সহকারী সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ।

এই সভাতেই সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা—Rise of the Sikh Power in India. যেমন বক্তৃতার বিষয়, তেমনি বক্তার উন্মাদিনী ভাষা। "সেদিন সন্ধ্যায় সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর ঘন ঘন করতালিধ্বনিতে গোলদীঘির চারিদিকে যেন একটা প্রবল ঝড় উঠেছিল।"

বিপিন পাল লিখেছেন—"তাঁহার শিখের ইতিহাসের বক্তৃতাতে আমরা প্রথম দেখিয়াছিলাম যে, য়ুরোপের স্বদেশভক্তি আমাদের দেশেও ফুটিয়াছিল। ঐ দেশধর্ম বা দেশচর্যা বা Patriotism

য়ুরোপের একচেটিয়া নহে। ভারতবর্ষের লোকেও অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংহত প্রজাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জনশক্তির হাতে এদেশেও একতন্ত্রী রাজশক্তি পরাভূত হইয়াছে।"

তারপর ভারত-সভা।

সেখানেও দুই সুহৃদ পাশাপাশি। সভাপতি আনন্দমোহন। সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ। এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিপিন পালের বিশ্লেষণী বিবরণ খুবই উল্লেখযোগ্য।

"কলিকাতার শিক্ষিত যুবকগুলির মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, কি করিয়া তাহা রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে গড়িয়া ওঠে, ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তরবারি ধরিয়া আমরা স্বাধীন হইব, এ কল্পনাটা তখনও জাগে নাই। ক্ষাত্রবীর্যের উপরে দেশের স্বাধীনতা যে একান্তভাবে নির্ভর করে, ইহা তখনও শিক্ষিত বাঙালী একান্ত-ভাবে অনুভব করে নাই। তখন আমাদের একটা রেষারেষি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এদেশের ইংরাজ অধিবাসীদিগের সঙ্গে, ব্রিটিশ প্রভু-ভক্তির সঙ্গে তখনও আমাদের বিরোধ জাগে নাই। আমরা আইনের গণ্ডীর ভিতরে আসিয়া কেবল আমাদের অভাব-অভি-যোগের আন্দোলন-আলোচনা করিয়াই ইংরাজ পার্লামেন্টের ধর্ম-বুদ্ধিকে জাগাইয়া ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারলাভ করিব, ইহাই আমাদের সেকালের রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল। সুতরাং দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাগাইবার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে আপনার শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করেন।...বিলাতে যেমন লোক-মতের বা বহুমতের প্রভাবে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া থাকে, ব্রিটিশ-ভারতেও সেইরূপ হইবে।...এই পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল সমিতির বেড়াজালে সমগ্র দেশকে ঘিরিতে হইবে।...এই লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইয়াই তিনি সর্বপ্রথমে

ভারত-সভার বা Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনুষ্ঠানে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ—ব্রাহ্মসমাজের এই সকল চিন্তা ও কর্মনায়কেরা সুরেন্দ্রনাথের এই নূতন রাষ্ট্রীয় কর্মে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে পাওয়া যায় এই সভার ভূমিষ্ঠলাভের পটভূমিকা।

"যখন ব্রাহ্মসমাজে কেশববাবুকে লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে আর-এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এক কথা উঠিত যে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়। অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক।...যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন এতদ্বারা দেশের একটি মহাঅভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।"

বিলেত-ফেরতা দুই নেতা বিদেশ থেকে একটাই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলেন। রাজনীতি-চর্চাকে দূরে সরিয়ে দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রাজনীতি মুক্তি-রথের চাকা। সেই রথের রশিতে হাত লাগাতে হবে সমাজের সব মানুষকে।

চাই লক্ষ হাতের সবল টান। লক্ষ প্রাণের ঐক্য। তবে ঘুরবে চাকা। ভাঙবে চক্রান্ত।

এই ভারত-সভাই বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'প্রথম রাজনৈতিক বিক্ষোভ-প্রদর্শন'-এর নেতৃত্ব দিয়েছিল লর্ড লিটনের শাসনকালে দেশীয় পত্রপত্রিকার কণ্ঠরোধকারী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে।

তারপর ন্যাশনাল-ফণ্ড।

সুরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"ইহাই প্রথম জাতীয় ধনভাণ্ডার —National Fund স্থাপনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। অতঃপর ইহারই আদর্শে অনেক স্থলে 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' স্থাপিত হইয়াছিল। মোট কুড়ি হাজার টাকা তখন উঠিয়াছিল। সংগৃহীত এই অর্থ রাজনৈতিক কর্মের উন্নতি সাধনের জন্য ভারত-সভার হস্তে প্রদান করা হইব।"

'ন্যাশনাল ফণ্ডে'র সাফল্যের পথ দিয়েই আবির্ভাব ঘটল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর। উদ্বোধনী ভাষণে আনন্দমোহন যাকে অভিনন্দিত করলেন—"First stage towards a National Parliament."

এর পরের অধ্যায়েই সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রয়াসী হৃদয়ের আর্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নিল জাতীয় কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতির কণ্ঠে ঘোষিত হল তার আদর্শ।

"এই কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একতা স্থাপন করবে এবং জাতীয় ভাব জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি করবে। আমরা য়ুরোপের দেশগুলির মতো আমাদের শাসনকার্যে আমাদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ গ্রহণ করতে চাই।" বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের কথা মনে রেখেই আনন্দমোহন সুরেন্দ্রনাথেরা যোগ দিলেন এই কংগ্রেসে।

সুরেন্দ্রনাথ আর আনন্দমোহন যেন একই আগুনের দুই জ্বলন্ত শিখা। তখনকার যে কোন আন্দোলনের পুরোভাগে আনন্দমোহন।

সমর্থক, সহায়ক। পিছনে সুরেন্দ্রনাথ। সংস্থাপক, সংগঠক। আনন্দমোহন অবিকম্প। সুরেন্দ্রনাথ উদ্ভ্রান্ত। আনন্দমোহন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। সুরেন্দ্রনাথ বহু নিন্দায় অভিনন্দিত। আনন্দমোহন ideal. সুরেন্দ্রনাথ Political. তবু দুজনে অভেদ-একাত্ম্য।

বিপিন পালের ভাষায় "আনন্দমোহন বসুর সাহায্য না পাইলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে যে কাজটা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা পারিতেন না।...সেকালের কোনো বিলাত-ফেরত বাঙালী আনন্দমোহনের মতন দেশের লোকের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধালাভ করেন নি; সুরেন্দ্রনাথও নন।...সুরেন্দ্রনাথের যাহা ছিল না আনন্দমোহনের তাহা ছিল। তাঁহার মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা ছিল। আনন্দমোহনের Idealism-এর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের Practical Politics এবং অসাধারণ বাগ্মীতা মিলিত হইয়াই আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা করে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে পৃথক করা যায় না।"

আনন্দমোহন সম্পর্কে নিবেদিতা বলেছিলেন, "সে-সময়ে ও-রকম উচ্চ-আদর্শবাদী ব্যক্তি এদেশে আর বড় একটা দেখতে পান নি।"

এই আনন্দমোহন মাদ্রাজ-কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন আসন্ন ভারত শাসকের উদ্দেশে। কার্জনের প্রগল্ভ বাক্-চাতুরীর মোহজালে সকলেই তখন বিভ্রান্ত। তখন ভারতীয় নেতাদের মনে গভীর প্রত্যাশা, এই নব নির্বাচিত রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে।

আনন্দমোহন তাঁর ভাষণে কার্জনকে ভারত-বন্ধু গ্ল্যাডস্টোনের নামের সঙ্গে তুলনা করে উচ্ছ্বসিত এক বক্তৃতা দিলেন।

"এইটেই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাজকার্য সমাধা করে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় কার্জন যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন সমগ্র

দেশবাসীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। রাজকীয় আড়ম্বর-ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী। প্রবর্তিত ন্যায়-নীতির দ্বারা অর্জন করা সুনাম-সুযশ দীর্ঘজীবী। কার্জন যেন তাঁর রাজ্যশাসনকালে সেই সুখ্যাতির অংশীদার হন।”

আনন্দমোহনের পাশে সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব পড়ল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কার্জনকে অভিনন্দিত করে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের। রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারী কংগ্রেসেও তখন প্রচলিত ছিল রাজভক্তি প্রদর্শনের রীতি। যার বন্দীশালায় বাস, বাঁধন-ছেঁড়ার আগে তার বন্দনা গেয়ে নেওয়া। অবশ্য কংগ্রেস তখনও একান্তভাবে নিজের পায়ে হাঁটতে শুরু করে নি। অভিভাবকের আঙুল ধরে তার চলা।

সুরেন্দ্রানাথ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কামনা জানালেন কায়মনোবাক্যে, যেমন বেন্টিক, ক্যানিং আর রিপন এদেশে শাসক হিসেবে যে সুনাম ও সুখস্মৃতি রেখে গেছেন, কার্জন যেন সেই সুনামের ধারাকে অব্যাহত রাখেন। তাঁর নামও যেন ভারতীয় কণ্ঠে উচ্চারিত হয় প্রিয়জনের মতো।

কার্জন বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন ৩০শে ডিসেম্বর। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি তাঁকে অর্পণ করল অভিনন্দন-পত্র।

পরের দিন কার্জন তাঁর ভাষণে বললেন—“আপনাদের আন্তরিক শুভাগমন-মূলক বার্তায় (cordial message of welcome) আমি অত্যন্ত বিগলিত। আমি আশা করি আমার প্রতি নিয়োজিত কর্মভার শেষ করিয়া আমি যখন পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিব, তখন আমার কার্য দেখিয়া সকলে যেন অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় যে, আমি ইংলণ্ডের পরেই আমার বাঞ্ছিত দেশে (next to my own country is nearest to my heart) ভারতভূমির জন্য, অকিঞ্চিৎকর হইলেও, অন্তত কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি।”

১৮৯৯। কার্জন হাতে নিয়েছেন শাসনভার। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত-সভা আয়োজন করল এক সভা। উদ্দেশ্য কার্জনকে অভ্যর্থনা জানানো। তারপর ভারত-সভার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের উপর ভার পড়ল সভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কার্জনের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এবং তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত মানপত্রটি পাঠ করে শোনানো। স্থান—রাজভবন।

সেদিনের অনুষ্ঠানে একটি ছোট্ট আকারের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। আকারে অঙ্কুর। কিন্তু তারই মধ্যে কেউ কেউ আভাস পেয়েছিলেন বিশাল কাণ্ডের।

"কার্জন কলকাতা পৌঁছিলে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারত সভার কয়েকজন সভ্য কার্জনকে অভিনন্দন জানাবার জন্য লাটভবনে গমন করেন। এই দলে সুরেন্দ্রনাথের জামাতা ব্যারিস্টার জে. চৌধুরীমশায়ও ছিলেন। তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের একজন বিশিষ্ট ব্রতী ছিলেন। তাই তিনি ও অপর একজন ভদ্রলোক বিলাতী-বুট জুতার পরিবর্তে দেশী নাগরা জুতা (দিল্লী ফ্যাসনের) পরে গিয়েছিলেন। কার্জন সভাস্থলে আসবার আগে তাঁর একজন এডিকং ঐ ঘরে প্রবেশ করে ভদ্রলোকদের পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করেন ও মিঃ চৌধুরী ও অপর ভদ্রলোকটিকে বাইরে জুতা ছেড়ে আসতে নির্দেশ দেন। এতে তাঁরা অপমানিত বোধ করেন ও ঐ কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যান। এই ঘটনায় বাংলা-দেশের লোকেরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। এই হতেই কার্জনের প্রতি লোকের মনে বিরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ও তাঁর প্রত্যেক কার্যের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা ও দূরভিসন্ধির অভিপ্রায় দেখতে আরম্ভ করেন।"

সৌন্দর্যের দিকে তাকানোর চোখ ছিল। রুচি ছিল। অনুরাগ ছিল শিল্পে। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল ভারতীয় স্থাপত্যের উন্নত মহিমা, ভাস্কর্যের নয়নাভিরাম ভঙ্গী। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির

স্মৃতিস্তম্ভগুলিকে অনিবার্য ধ্বংস ও অনাদরের ক্ষয় থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তিনি। 'Preservation of ancient monuments of India act' সেই উদ্দেশ্যেই রচনা।

১৯০১-এ পরলোকগমন করলেন মহারানী ভিক্টোরিয়া। তাঁর স্মৃতিকে সৌধে রূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগল কার্জনের মনে। চোখে ভেসে উঠল শুভ্র তাজমহলের ছবি। সেই ছবিকে মনে রেখে তৈরি হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ছবি শুধু তাঁর চোখেই ছিল না। ছিল হাতের তুলিতেও। অবসর সময়ে ছবি-আঁকা ছিল, অভ্যাস না হলেও, নেশা। ছিলেন রসিক পাঠক। সমঝদার শ্রোতা। বিলাসী ভাবুক। কিন্তু তবুও সকলের উপরে ইতিহাসের পাতায় নিজেই কঠিন অক্ষরে নিজের যে স্থায়ী পরিচয় লিখে রেখে গেলেন তা শিল্প-রসিকের নয়, বিদ্যোৎসাহীর নয়, হৃদয়বান পুরুষের নয়, গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীর, জবরদস্ত বড়লাটের, নির্দয় শাসকের।

সিংহাসনে গদীয়ান হয়ে কার্জন একটা জিনিস হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পয়লা নম্বরের দুশমন হল বাঙালী, যারা পাশ্চাত্যের ধাঁচে শিক্ষিত। ইংরেজী শিক্ষাই এদের হাতে তুলে দিয়েছে ইংরেজ-নিধনের হাতিয়ার। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এরা জেনেছে পৃথিবীকে। চিনেছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার স্বরূপ। তাই নেমেছে স্বাধীনতার আস্বাদন লাভে, ইংরেজী-প্রভুত্বের খুঁটি-নড়ানোর প্রচেষ্টায়। এর পিছনে উদ্যোক্তারা হল Discontented B. A-এর দল। এরা শিক্ষিত ও বেকার। দেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এই বিক্ষুব্ধ বেকারের সংখ্যা। আর তারই ফলে আজ এ-নিয়ে কাল ও-নিয়ে সরকারী হুকুমতনামার বিরুদ্ধে গড়ে তুলছে আন্দোলন-আলোড়ন। শিক্ষিতরাই যত নষ্টের মূল। অশান্তির গোড়া।

কার্জন বুদ্ধিমান। অল্প চিন্তাতেই বুঝে নিলেন যে বাঙালীকে খর্ব করার চরম অস্ত্র একটাই। সেটা তার শিক্ষা-দীক্ষা, তার

রাজনৈতিক-চেতনা, তার সাহিত্যের গৌরবকে অকালমৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে পাঠানো। অস্ত্র হবে উচ্চ শিক্ষার সংকোচন।

কার্জনের যেমন ভাবা তেমনি কাজ। শান দিতে বসে গেলেন অস্ত্রে। প্রথম আঘাত এল অন্য পথে। যেন পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া কতটা শাণিত হল অস্ত্র।

১৮৯৯। অনেকদিন থেকেই একটা 'বিল' নিয়ে তুমুল-বাক্‌বিতণ্ডা চলেছিল কলকাতায়। 'কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট'। বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির মগজ থেকে উদ্ভুত, তাই তার আরেক নাম 'কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিল'। দেশশাসনের সবকটা সদর মহলের চাবির গোছাই ইংরেজদের হাতে। যাদের দেশ তাদের কোথাও হাত লাগাবার নাক গলাবার অধিকার নেই। তবু ওরই মধ্যে ধু ধু মরুভূমিতে ছিল একটুখানি ওয়েসিস, মিউনিসিপ্যালিটি। সেখানে স্বায়ত্ত-শাসনের যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ হিসেবে কলকাতার নাগরিকদের অধিকার ছিল পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের। বাকী পঁচিশ জন বাছাই হবে সরকারী শুভদৃষ্টিতে। ম্যাকেঞ্জীর সহ্য হল না কলকাতাবাসীর এতটা সুযোগ-সম্মান। তিনি বললেন, এখন থেকে পৌরসভার যিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন, তিনিই হবেন সর্বেসর্বা। পৌরসভা, কমিশনার বা কলকাতার নাগরিকদের কাছে তিনি তাঁর কৃতকার্যের জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

উঠল সোরগোল। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিলের স্বপক্ষে-বিপক্ষে বয়ে চলল বাদ-প্রতিবাদ, বিতর্ক-বিক্ষোভের একটানা ঘূর্ণিমাতন। এমন সময় এল কার্জনের আমল। দেশের নতুন মাথা, নবাগত মাতব্বর। মাতামাতির দল ভাবলে এবার রাতারাতি ঘটবে একটা কিছু অঘটন। ম্যাকেঞ্জির মুখে পড়বে ছাই। কিন্তু হায়, সবই আশার ছলনা। কালক্রমে দেখা গেল কার্জন কাল-

বিলম্ব না করেই মঞ্জুর করেছেন ম্যাকেঞ্জির বিল। কিছুই সংশোধিত হয় নি বরং সংযোজিত হয়েছে নাগরিক-ক্ষমতা-হ্রাসের নীতি। কলকাতার নাগরিক-পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাকে কেটে দু-আধখানা করেছেন তিনি। পঞ্চাশ হয়েছে পঁচিশ। এখন থেকে চেয়ারম্যান হবেন সরকারের বাছাই-করা লোক। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি এখন থেকে পুরো-দস্তুর সরকারী প্রতিষ্ঠান।

১৮৯৯এর ২৭ শে ডিসেম্বর। বিল পাস হল ব্যবস্থাপক সভায়। সেইদিনই ছিল রাজা রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকী দিবস। বিলের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিতর্ক চালিয়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না সুরেন্দ্রনাথ। অবশেষে তাঁর খেদোক্তি—"এটা বেশ ভালই হয়েছে যে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর তিরোধানের দিনটিকে তাঁর প্রিয় বাসভূমি কর্মভূমি এই মহানগরীর স্বায়ত্তশাসনাধিকারের মৃত্যুদিন বলে স্মরণ করবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা।"

পরের দিন থেকেই গর্জে উঠল হৃত-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রতিবাদে ২৮ জন কমিশনারের পদত্যাগ। রসরাজ অমৃতলাল লিখলেন প্রহসন—'সাবাস আঠাশ'। সেটা অভিনীত হল জনসমক্ষে। সংবর্ধনা জানানোর মাতামাতি শুরু হয়ে গেল চারিদিকে পদত্যাগী কমিশনারদের নিয়ে। সংবাদপত্রও বোবা হয়ে বসে নেই। তারও অক্ষরে অক্ষরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কলকাতাবাসীর কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডকে কেন্দ্র করে শহরে যে উত্তেজনা উথলে উঠেছিল, এর কাছে তা ম্লান। সরকারী-তাঁবের কাগজ 'স্টেটসম্যান' পর্যন্ত না লিখে পারল না "পৌরসভার অধিকার, ম্যাকেঞ্জি বিল মঞ্জুর করা নিয়ে সারা দেশে যে তিক্ত বিতর্ক আর তীব্র বিক্ষোভ জেগে উঠেছে, কলকাতার ইতিহাসে তা তুলনাহীন।"

তুফান উঠল। বাতাস ছুটল। কিন্তু কর্ণধার কার্জনের তরী ঠিক ভিড়ল তীরে। প্রথম আঘাতের সাফল্যে উল্লসিত কার্জন

এবার কোমর বাঁধলেন পরবর্তীর জন্যে। দ্বিতীয় আঘাত ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট বা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইন।

১৯০১। সুদূর সিমলার শৈল-চূড়ায় বসেছে গোপন বৈঠক। যোগদানকারীরা সকলেই বিদেশী শিক্ষাবিদ্। আলোচ্য বিষয়, ভারতীয় উচ্চশিক্ষার মূলোচ্ছেদ। শিক্ষাই বাঙালী জাতির স্বাদেশিকেতার উৎস। সেই উৎসকে আরো উৎসাহ দিলে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজের উৎসন্নে যেতে খুব বেশী সময় লাগবে না। সুতরাং চাই শিক্ষার সংস্কার। আসলে সংস্কার নয়, সৎকার।

সিমলা বৈঠকের পরেই তৈরি হল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। শিক্ষা কমিশনে কোন হিন্দু প্রতিনিধির ঠাঁই নেই। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' বিদ্রোহী বাঙালীর মুখপত্র। সুরেন্দ্রনাথ কলম ধরলেন। দেখতে দেখতে দানা বেঁধে উঠল একটা উচ্চকণ্ঠ জনমত। বাধ্য হয়ে স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীকে গ্রহণ করল কমিশন।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বললেন, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে (১৮৮২) ভারতবর্ষে প্রথম যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাতে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে একজন করে শিক্ষিত প্রতিনিধি। তার পর দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছে। অথচ এখন শিক্ষা কমিশনে ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হচ্ছে মাত্র দুজন। এটা খুবই নিন্দার কথা।

স্যার গুরুদাস কমিশনে যেগে দিলেন বটে, কিন্তু কমিশনের সিদ্ধান্তে নিজের কণ্ঠস্বর মেলাতে পারলেন না। নির্ভয়ে জানালেন নিজের প্রতিবাদ, Note of dissent. তাঁর মতে কমিশনের সিদ্ধান্ত হল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী দখলে আনার এবং সার্বজনীন শিক্ষাকে সংকুচিত করার অপচেষ্টা।

১৯০২এ স্যার গুরুদাসের Note of dissent সহ কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশিত হলে আরেকবার ঘা পড়ল প্রতিবাদের

দুন্দুভিতে। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী', নরেন্দ্রনাথের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' 'অমৃতবাজার', রামানন্দের 'প্রবাসী', রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শন' কাগজের পাতায় পাতায় কালো কালো অক্ষরে ফুটে বেরুল সমগ্র জাতির নিন্দা ও ধীক্কারের অগ্নিকণা।

সিমলায় যেদিন থেকে গোপন বৈঠকের শুরু সেদিন থেকেই সুরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর বাঙ্ময়। "এই গোপন বৈঠকে বড়লাট ঘোষণা করেছেন যে ভারতবর্ষে তিনি যে নীতি অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন, তার মধ্যে গোপনীয়তার স্থান নেই—শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে-কোন রকম গোপনীয়তার প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক, তা বলাই বাহুল্য। কারণ কথায় ও কাজে এমন বৈষম্য বিরল। কারণ যে-সময়ে ও যে-ব্যাপারে গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল, সেই ব্যাপারে ও সেই সময়েই ঐ নির্লজ্জ উক্তি করতে মাননীয় বড়লাট সাহেব কোন সংকোচ অনুভব করেন নি। কিন্তু ইহাই তাঁহার নীতি ছিল, এবং এজন্যে অনুকম্পা ছাড়া আর কি অনুভব করবো, কারণ এই লর্ড কার্জনই ছিলেন পাশ্চাত্য ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

এই সময়ে আর একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যা অন্যায়ের প্রতি ক্ষামাহীন রোষে উদ্দীপ্ত। সে কণ্ঠস্বর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। ডন সোসাইটির জনক। ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে তাঁর একান্ত নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আগ্রহ আর অক্লান্ত পরিশ্রমেই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল পাল্টা আর এক প্রতিষ্ঠান—জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলার শিক্ষাজগতে এসেছিল যুগান্তর।

ব্যঙ্গ-কবিতায় কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার সিদ্ধহস্ত। কলম তো নয় যেন শাঁখের করাত। আসতে যেতে কাটে। 'বঙ্গ-মঙ্গল' তাঁর একটি খণ্ডকাব্য। বিষয় বঙ্গভঙ্গ। তারই প্রথম পর্ব 'মন্ত্রণা'য় শিক্ষা-সংকোচনে কার্জনী চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠিন কশাঘাত।

হিমালয়ে শিমলার তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা—
নির্জন মার্জন করে পর্জন্য আপনি,
কর্জন বসিয়া তথা কনক আসনে
ভাষেণ অমৃতবাণী বাণী-বিড়ম্বিনী,
সম্ভাষি সচিবে, মিত্রে, পাত্রে, কোতোয়ালে।
"বিদায়িতে ভারতীরে মারুতির রথে
পূর্ণ আজি আয়োজন, চূর্ণ আন্দোলন।
হে পাত্র! পড়িয়া শাস্ত্র গাত্র দাহ কারো
নাহি হবে; রবে সবে নীরব জগতে।
ছল-ধরা রোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হ'বে তাহা গুপ্ত-বিধির প্রচারে;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে।
শান্তির কুলীশ দিব পুলিশের হাতে;
আঁট ঢাল, কোতোয়াল, শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিয়া।
সচিব! রচিব আমি অন্য নব বিধি,
ঠাণ্ডা করি দেশ, তুমি পাণ্ডা হও তার।"
শুনি সে অমৃত বাণী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিববৃন্দ; বন্দী গাহে গান।

(বন্দীর গান)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ রাজাগণে।
রহিবে নাম ছাপা (ধামা চাপা)
পুলিশ কমিশনে।
ইউনিবরসিটি বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে

করিবে ভারতীর মতিস্থির
কুলোর বাতাসেতে।
গুপ্ত বিল খুলি বিলকুলই
মহিমা জারি হোলো।
প্রভুর জয়গানে একতানে
সকলে হরি বলো।

'বঙ্গ-মঙ্গলে'র দ্বিতীয় পর্ব, 'উদ্যোগ'-এ, সদ্য-প্রচারিত বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের যেন বিস্ফোরণ।

"মধুমাখা ইতিবৃত্ত প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি, বাঁচিল বাঙালী।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ সে ছিল তিন দেশ
এক সঙ্গে তার শাসন গর্হিত।
বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
ঝালাপালা করি কর্ণ। জ্বালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।"
উচ্চারিয়া কথা গুলি হস্তে লয়ে ছুরী
দক্ষ সার্জনের মত দাঁড়াল কর্জন।
কহিলা সচিব তবে যুক্ত কর যুগে :
"ছুরী হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি ;
কিম্বা যদি ধড় হ'তে স্বতন্ত্রিতে মাথা
শঙ্কা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?"
বর্ষি রসনায় লক্ষ ভৎর্সনা বচন,
কহেন শেতাঙ্গ-পতি : "অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা, মজা ওতে আছে বহুবিধ।
উহাতে চীৎকার করা ভাবপ্রবনতা।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা শিখাব এবার,
থাকে প্রাণ ধড় মুণ্ড বিভক্ত করিলে।

যতটুকু যাবে কাটা ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া ;
সব গুলো হবে তাজা সমান সমান।
বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ ; প্রত্যঙ্গ ত সেটা।
কলিঙ্গ কিষ্কিন্ধা জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব দেহ সৃষ্টি। ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্য রূপে হইবে সাধিত।"
তথাস্তু বলিয়া সবে শির করি নত
রত হল নব বিধি করিতে প্রচার।
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে। উঠিল রোদন
বুদ্ধিহীন বঙ্গমুখে, অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে।

চারদিকের এত কোলাহলেও কর্ণপাত নেই কার্জনের। ১৯০৪-এ তিনি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি বিল পাস করলেন। সারা দেশে ফেটে পড়ল 'a violent outburst of indignation.'

ইতিমধ্যে, ১৯০৩ থেকেই, চলেছিল আর এক প্রবল আঘাতের প্রস্তুতি। কার্জনের শেষ ব্রহ্মাস্ত্র। নাম বঙ্গভঙ্গ।

১৭৭৪ সালের কথা। হেষ্টিংস তখন ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল। তখন বাংলার লাটই ভারতের বড়লাট। ১৮৬৪ পর্যন্ত তাই চলেছিল। ১৮৫৪ সাল থেকে তৈরী হল আলাদা করে ছোটলাটের পদ। বাংলাদেশটা আকারে নেহাত ছোট নয়। আর তখন বাংলা বলতে বোঝাত শিলেট, গোয়ালপাড়া, গারো হিল্‌স পর্যন্ত ব্যাপ্ত সুদূর সীমা। সুতরাং একজন লেফটেনান্ট গভর্নরের পক্ষে এতবড় দেশ সামলানো কি সহজ কথা, না, সম্ভব ? অগত্যা ছোটলাট বহাল হলেন।

বেশ দিন কাটছিল। হঠাৎ সরকারী মগজে চেপে বসল আর এক দুশ্চিন্তা। একজন ছোটলাটের পক্ষেও কি সম্ভব এতবড় একটা দেশ শাসন করা? তাহলে উপায়? উপায় একটাই। দেশটাকেই কেটে ছোট করে দেওয়া। বাঃ, এটা তো খুবই সহজ সমাধান। তাহলে তাই হোক্। ভাবতে বসা যাক, কিভাবে ছুরি-কাঁচি চালানো যেতে পারে। মাথা ঘামাতে বসলেন সরকারী মহল।

বুদ্ধি বেরুল ১৮৭৪-এ। বাংলাদেশ থেকে আসামকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হল। তৈরী হল নতুন আসাম প্রদেশ। শিলেট, কাছাড় আর গোয়ালপাড়া এই তিনটে বাংলা ভাষাভাষি জেলাকে বাংলার মাটি থেকে উপ্ড়ে নিয়ে ছুঁড়ে এবং জুড়ে দেওয়া হল নতুন আসাম প্রদেশে। এই শুরু। কিন্তু শেষ নয়।

কিছুদিন কাটল। আবার হঠাৎ সরকারী-টনক নড়ে উঠল। হ্যাঁ হে, এত কেটে-ছেঁটেও তো দেখছি বাংলাদেশটা বেশ বৃহদাকার। কি করা যায় বলতো? আর একটু মুড়িয়ে দেবে নাকি?

বসে গেল শলা-পরামর্শের আসর। ১৮৯১। আসরে যারা যোগ দিলেন তাদের মধ্যে আছেন বাংলার ছোটলাট, আসাম ও ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনার, আর সামরিক বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

ভাবতে ভাবতেই উপায় বেরুল। লুসাই পাহাড় আর চট্টগ্রাম বিভাগকে যোগ করে দিতে হবে আসামের সঙ্গে। তাতে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রক্ষারও সুবিধে। বাঃ, এতো তোফা যুক্তি। কিন্তু কেন জানা গেল না, যুক্তিটাকে তখুনি কাজে লাগানো হল না। অকেজো পড়ে রইল।

আগুনটা নিভে আসছিল। মরা আগুনে ঘি পড়ল ১৮৯৬-এ। ঢাললেন আসামের চীফ কমিশনার ওয়ার্ড সাহেব। তিনি

এক পরিকল্পনা বানিয়েছেন। তাতে প্রস্তাব, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগ আর ময়মনসিং জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। তাহলে বাংলার শাসন চালাতে একজন ছোটলাটকে আর দমে লাট খেতে হবে না। ওয়ার্ড-এর প্রস্তাব সরকার কানে তুললেন, তবে তখুনি হাতে তুলে নিলেন না। ভেবে-চিন্তে দেখা যাক।

ওয়ার্ড গেলে তার জায়গায় আসামে নতুন চীফ কমিশনার হলেন স্যার হেনরী কটন। সরকার পক্ষ কটনকে শুধালে, আচ্ছা, ওয়ার্ডের পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমার কি মত?

কটনের সোজা উত্তর।

ওটা অবিবেচকের প্রস্তাব। তবে লুসাই পাহাড়কে আসামের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে।

তাই করা হল।

এরপর বেশ কিছুদিন চুপচাপ। ভাগাভাগি নিয়ে কালনেমি-দের মাথা ব্যথাটাও বন্ধ। হঠাৎ কোন্ দূরের সেই মধ্যপ্রদেশ থেকে সেখানকার চীফ কমিশনার স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজার নামে এক সাহেব হাঁক ছেড়ে বসলেন। কি ব্যাপার? না, উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ থেকে উপড়িয়ে নিয়ে উপঢৌকন দেওয়া হোক মধ্য-প্রদেশকে। কার্জন তখন গদীতে বসে গেছেন। ফ্রেজারের বাণী কানের মধ্যে দিয়ে একেবারে সোজা গিয়ে প্রবেশ করল তাঁর মরমে। তিনি বললেন তথাস্তু। এর পরেই ফ্রেজার সাহেব চলে এলেন বাংলার ছোটলাট হয়ে। উঠে পড়ে লাগলেন বঙ্গ-ভঙ্গের খসড়া রচনার কাজে।

১৯০৩। ৩রা ডিসেম্বর। ফ্রেজার সাহেবের সুদীর্ঘ পরিকল্পনার নীচে স্বাক্ষর পড়ল ভারত সরকারের সেক্রেটারী রিজলী সাহেবের। পরিকল্পনায় নতুন করে স্থির হল, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা, ময়মনসিং জেলা যোগ করা হবে আসামের সঙ্গে।

এই গোপন-পরিকল্পনা যেদিন সাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তিন জেলাতেই জ্বলে উঠল ক্রোধের তুষানল। কলকাতাও প্রতিবাদে কল্লোলিত।

মাদ্রাজে বসেছে কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি লালমোহন ঘোষ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর মুখ দিয়েই প্রথম উচ্চারিত হল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ।

"লর্ড কার্জন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব বিস্তারে তিনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইয়াছেন। লাল-মোহন বলিলেন যে, কৈ—না। কোন ঈশ্বরের হস্ত তিনি দেখিতে পান নাই। বেচারী ঈশ্বর!"

"তারপর, ইংরেজ রাজত্বে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা (Pax-Britanica) হইয়াছে—এ কথার জবাবে লালমোহন বলিলেন যে, ইহাতে কোন লাভ হয় নাই। চুরি ডাকাতি লুঠ-তরাজে যত লোক মরিত, তার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে এখন বেশী লোক মরে।"

প্রতিবাদ ক্রমশ বলবান হয়ে উঠছে দেখে কার্জন বেরিয়ে পড়লেন তদন্তে। প্রত্যক্ষদর্শনে তিনি বুঝে নিতে চান, এই প্রতিবাদের পিছনে কতটা রয়েছে দেশের মানুষের উদ্দীপ্ত ঐক্য, আর কতটা দেশ-নেতাদের উত্তপ্ত বাক্য। ১৯০৪-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণে যাত্রার দিন।

ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। শক্ত শিরদাঁড়ার মানুষ। কার্জন সাহেব প্রথমেই অতিথি হলেন তাঁর। সকাল সাড়ে আটটায় এসে পৌঁছলেন। মহারাজা সূর্যকান্ত অতিথি-সমাদরে কোথাও কোন খুঁত রাখলেন না। কার্জনও তুষ্ট। ভাবলেন ইনি বুঝি রুষ্টের দল লোক নন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কথা পাড়তে গিয়েই তাঁর সে-ভুল ভাঙলো অচিরাৎ। তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁর প্রস্তাব। কার্জন অবস্থা বুঝে আর

কথা বাড়ালেন না। বিকেল সাড়ে চারটে বাজতেই পা বাড়ালেন ঢাকার দিকে।

ঢাকায় গিয়ে তিনি এক বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে বসলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে ঢাকার মুসলমানদের কি কি সুবর্ণ-সুযোগ মিলবে তারই লম্বা ফিরিস্তি।

প্রস্তাব কার্যকরী হলে ঢাকাই হবে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী। বাড়বে মুসলমানদের ঐক্য। তারা আত্মনির্ভর হবার সুযোগ পাবে। পাবে তাদের বহু যুগের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করতে। তারা একযোগে বড় হয়ে ওঠার এমন সুযোগ পাবে, যা ভারতবর্ষে মুসলমান রাজাদের অধীনেও কখনও ঘটে নি।

এমন দরদী-বক্তৃতার আসল উপলক্ষ্য হল ঢাকার নবাব সলিমুল্লার মন ভেজানো। আশ্চর্যের বিষয়, কার্জন সার্থক হলেন তাঁর চাতুরীতে। সলিমুল্লা রাজী বঙ্গ বিচ্ছেদে।

এই সময়ে নবাব সাহেব ঋণে ভারাক্রান্ত। কার্জন কথা দিলেন তিনি নামমাত্র সুদে তাঁকে টাকা কর্জ দেবেন। দেশ-দ্রোহীতার বিনিময়ে তাঁকে এই প্রাপ্য পুরস্কার দিতে কার্জন কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি অবশ্যই। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ধার-স্বরূপ দিলেন প্রায় ১০০,০০ পাউণ্ড।

ভারত পর্যটনকারী সাংবাদিক নেভিনসনের মতে আন্দোলনের বিরুদ্ধে নবাবকে প্ররোচিত করাই এই ঋণ-দানের আসল উদ্দেশ্য। বঙ্গভঙ্গের পিছনে উদ্দেশ্য একটা নয়, একাধিক।

মুসলমানকে ছিনিয়ে নিতে হবে হিন্দুর উষ্ণ বুকের পাশ থেকে, নিবিড় আলিঙ্গন থেকে।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের একটা শক্ত আর উঁচু পাঁচিল তুলতে পারলে দু-পক্ষই হবে কিছুটা হীনবল, ক্ষীণতেজ।

মুসলমানদের নানা রকম সুযোগ দিয়ে সরকারী তাঁবেদার

বানানো যাবে। আর মুসলমান সমর্থকদের হারিয়ে হিন্দুদের প্রতিবাদের কণ্ঠ হয়ে যাবে বেশ কিছু নিস্তেজ।

এসব ছাড়া আরেক লাভ, নতুন প্রদেশে নিয়োগ করা যাবে অসংখ্য ইংরেজকে, নতুন জীবিকায়, নতুন সরকারী পদে।

সলিমুল্লার সমর্থন পেয়ে কার্জন কি হাতে স্বর্গ পেলেন? তা নয়। তবে কার্জন চাইলেন শুভস্য শীঘ্রম্। তিনি বেশ হাড়ে-হাড়েই টের পেয়েছেন দেশের মানুষের ঘৃণা ও বিরোধিতা। বেশী সময় দিলে প্রতিবাদী পক্ষও ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই কলকাতায় ফিরেই ঘোষণা করলেন বঙ্গভঙ্গে দেশবাসী সম্মত। ইতস্তত এই যে আন্দোলন, এসবই artificially got-up, রাজনৈতিক নেতাদের বানানো, কৃত্রিম কারসাজী।

ইতিমধ্যে কার্জনের কপালে জুটে গেল আর এক চেলা। ময়মনসিংহ জেলার ধনবাড়ী গ্রামের এক অশিক্ষিত খুদে জমিদার নবাব আলী চৌধুরী।

কার্জন বঙ্গভঙ্গের নতুন প্রস্তাব পাস করলেন এবার। ঠিক হল, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগ, দার্জিলিং বাদ দিয়ে সমস্ত রাজশাহী বিভাগকে এক করে তৈরী হবে নতুন প্রদেশ।

কার্জনের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠল সারা দেশ।

এইখানে আরেক-দফা কার্জন-বিরোধিতার কথা না উল্লেখ করলে কার্জন আমলের ছবিতে খুত রয়ে যায়।

১৯০৩। ঘটনা, দিল্লীর দরবার। উপলক্ষ্য, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক। উদ্দেশ্য বেপরোয়া রূপোর চাকতি ছড়িয়ে দিল্লীতে যদি একটা রূপের হাট বসিয়ে দেওয়া যায় ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের চোখ-ধাঁধানো জেল্লায়, হয়তো মন গলবে ভারতবাসীর, অনেকেই ঐশ্বর্যবিলাসী ইংরেজদের অন্তরঙ্গ হতে চাইবে, বাড়বে রাজভক্তির বহর।

এদিকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে তখনো মিলিয়ে যায় নি ১৯০১-এর দুর্ভিক্ষের কালো করাল ছায়া। অনাহার-অর্ধাহারের বিভীষিকা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী'তে প্রশ্ন তুললেন, একটা দেশ যখন সবেমাত্র ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে উঠতে চাইছে, ঠিক সেই সময়ে এই অকারণ আড়ম্বরের প্রয়োজনটা কেন?

সমালোচনায় কার্জন চিরদিনই অসহিষ্ণু। তিনি বললেন, দরবার হবেই। তবে যতটা সম্ভব কম খরচে।

সুরেন্দ্রনাথ থামলেন না। বললেন—

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকরা অতীত ইতিহাসের কাছ থেকে একটা শিক্ষা ও সাবধান বাণী নিশ্চয়ই শিখতে পারেন, যে ইতিহাস নিদারুণভাবে নিন্দিত করেছিল ১৮৭৭ সালের দরবারকে।

তবু দরবার বসল। দরবারে যোগদান করলেন প্রখ্যাত মনীষী ও অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত। দরবার শেষ হল। রমেশচন্দ্র ইংলণ্ডের হৃদয়বান রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে বললেন,

"ভারতবর্ষ প্রশ্ন করতে চায়, যদি ১৯০৩-এর এই দরবার সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরিণাম হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এযুগে ইংলণ্ডে কি এমন কোন নেতা নেই যিনি এই অপব্যয়ী ও অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনগণের সত্যিকারের মঙ্গল করতে পারেন।"

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ।

"আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এই জন্য ত্রিশকোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লীর দরবার নামক একটি সুবিশাল অত্যুক্তি বহু চিন্তার, চেষ্টার ও হিসাবের বহুরূপ কষাকষি দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন—দয়াহীন, দানহীন, দরবার ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।"

১৯০৩ পার। এখন ১৯০৪-এ পা।

পূর্ববঙ্গ সফর সেরে কার্জন কলকাতায় ফেরার পর থেকেই কলকাতা শুরু করল বদলাতে। গালে হাত দিয়ে দুশ্চিন্তার বদলে দেখা দিতে শুরু করল গলা-ছেড়ে প্রতিবাদ, নিন্দা, ধিক্কার। ১৯০৪-এর ১৮ই মার্চ। টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভা। ইতিপূর্বে "এমন সভা কেহ কখনও দেখে নাই। টাউন হলের দ্বিতলে সমস্ত লোকের স্থান না হওয়াতে একতলে দ্বিতীয় সভা করিতে হইয়াছিল।...পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।"

সভার শেষে রচিত হল একটি যুক্তিপূর্ণ যুক্ত আবেদনপত্র। তাতে আবেদন, বঙ্গভঙ্গ নামক এই অযৌক্তিক উদ্যোগ থেকে সরকার যেন বিরত হন। আবেদনপত্রটি পাঠানো হল সরকারী ঠিকানায়। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কোন উত্তর নেই। দেশবাসীর ধারণা হল, এতদিনে বুঝি দেখা দিয়েছে সরকারের সুবুদ্ধি, বুঝতে পেরেছেন নিজেদের ভ্রান্তিবিলাস।

নেতারা নিশ্চিন্ত। ফাঁড়া তাহলে কাটল। উদ্যত খড়্গ অবনত। ফলে আন্দোলনের জোয়ারে লাগল ভাঁটার টান। নিরাপত্তার আশা এনে দিল কিছুটা নিশ্চেষ্টতার আরাম। কিন্তু আশার দিন দীর্ঘস্থায়ী হল না।

এলাহাবাদের বিখ্যাত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'পায়ওনীয়ার'। সেই পত্রিকায় নভেম্বরে ছাপা হল এক আকস্মিক দুঃসংবাদ। সমগ্র পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং বাদে সমস্ত উত্তরবঙ্গ, মালদহ আর আসাম এই নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবে ভারত-সরকার সম্মত।

মড়মড়িয়ে ভেঙে গেল শীতল তন্দ্রার আবেশ। গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠল দেশ, দেশের নেতারা। চোখে উদ্বেগ, মুখে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, একি সত্য?

১৯০৪-এর ডিসেম্বরে বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি স্যার হেনরী কটন। জাতে ইংরেজ। কাজে রাজপুরুষ। ঝানু সিভিলিয়ান। সেক্রেটারী হিসেবে সাত-সাতটি লেফটেনাণ্ট গভর্নর পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। কিন্তু তিনি শাসকের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখেন নি। দেখেছেন শ্রদ্ধার চোখে। ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বেদনা ও বিক্ষোভের তিনি একজন সহানুভূতিশীল সমর্থক। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের দিনে তাই তাঁকে দেখা গেল সামনের সারিতে।

কংগ্রেস মঞ্চে সভাপতির পদ গ্রহণের আগেই এপ্রিল, ১৯০৪-এ বিলেতের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ একটা চিঠি লিখেছেন।

প্রকাশ্যে সরকারী-সিদ্ধান্তের নির্মম সমালোচনা।

"বাংলাদেশের একটা অতি প্রাচীন, জনবহুল ও সমৃদ্ধ অংশকে বিভক্ত করার, এবং বাংলার অধিবাসীদেরও দু'ভাগে ভাগ করার এই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত, সমগ্র বাঙালী জাতিকে এমন এক গভীর আঘাত হেনেছে, এবং তাদের মধ্যে এমন এক গভীর ঐক্যানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যা এর আগে কখনো দেখা যায় নি। নিজেদের ভাই, বন্ধু, এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের এই যে আসামের মত একটা অনুন্নত দেশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, শাসন তন্ত্র, ভাষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, এবং জাতিতত্ত্ব, সব ব্যাপারেই বাংলাদেশের সঙ্গে যে দেশের গভীর প্রভেদ, এটা তাদের কাছে এতই অসহ্য যে, তার ফলে সারা পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি শহরে-বাজারে প্রতিদিনই চলেছে জনসভা, প্রতিটি জনসভাতেই বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনা ধিক্কৃত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে।"

বোম্বাই কংগ্রেসেও "কটন সাহেব সভাপতির আসন হইতে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। লর্ড কার্জনের যুক্তি খণ্ডন করিলেন। বাঙালী সন্তুষ্ট হইল। কটন সাহেব বাঙালীর প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বাঙালীরা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম

লোকমত সৃষ্টি করেন এবং পরিচালিত করেন (···Babus from Bengal, strenuous and able, who rule and control public opinion from Peshawar to Chittagong."....) এমনকি তিনি রাজা রামমোহনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিলেন—যাহা এক র‍্যানাডে ছাড়া আর কোন প্রদেশের নেতাকে বড় একটা উল্লেখ করিতে দেখি না। বঙ্গভঙ্গের দ্বারা বাঙালী জাতির একতা নষ্ট করিবার যে চেষ্টা, ইহাকে তিনি নিন্দা করিলেন এবং দুহাজার সভায় বাঙালী এই বঙ্গ-ভঙ্গের যে প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা অত্যন্ত কড়া কথায় নিন্দা করিলেন (···a most arbitrary and unsympathetic evidence of irresponsible and autocratic statesmanship"....) (hear, hear). এতবড় কড়া কথার পর লর্ড কার্জন কটন সাহেবের হস্ত হইতে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ-প্রস্তাব হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে সোজা অস্বীকার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।"

এল ১৯০৫। ১১ই জানুয়ারী। টাউন হলে আরেক জনসভা। সারা দেশের তিনশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত। সভাপতি স্যার হেনরী কটন। তিনি আবার প্রতিবাদ জানালেন সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

"শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে দেশবিভাগ যদি একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, তাহলে এর সত্যিকারের সমাধান হল বাংলায় প্রেসিডেন্সী গভর্নরশিপ স্থাপন করা। তারপরেও যদি সীমানা নিয়ে সংকট দেখা দেয়, তাহলে বিহার ও ছোটনাগপুরকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া যেতে পারে, একজন চীফ কমিশনারের অধীনে। সেটা বিহারী জনসাধারণের পক্ষে খুব আনন্দেরও হবে। আর অন্যদিকে শিলেট এবং চাচর, আসামের এই দুই বাংলাভাষাভাষি অঞ্চলকে আসাম থেকে সরিয়ে বাংলার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হোক্, বাঙালীরা উপকৃত হবে।"

ঐ সভাতেই গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকারকে জানানো হল, এখনো পর্যন্ত সরকার উথাপিত বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি জেনে এই সভা আশ্বস্ত। সভা প্রার্থনা করছে, যদি পরিমার্জিত অথবা পরিবর্ধিতরূপেও বঙ্গচ্ছেদের কোন নতুন প্রস্তাব চিন্তা করে থাকেন, তবে যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে দেশবাসীর অবগতির ও আলোচনার জন্যে প্রকাশ করা হয়।

সরকার পক্ষ নিরুত্তর।

অকস্মাৎ মে মাসে বিলেতের কাগজ 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বাতাসে খবর ছড়িয়ে দিলে, ভারত-সচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করেছেন। পার্লামেন্টের সদস্য হার্বার্ট রবার্টস ভারতসচিবকে প্রশ্ন করলেন, ঘটনা কি সত্যি? ভারতসচিব জানালেন, না, প্রস্তাব এখনো বিবেচনাধীন। বাংলা-দেশ থেকে টেলিগ্রাম ছুটলো বিলেতমুখো। তাতে অনুরোধ, দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে আবেদন-পত্র পাঠানো হচ্ছে তা পৌঁছবার আগেই যেন ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হয়।

নেতারা ঠিক করলেন আবেদনপত্রে সংগ্রহ করা হবে তিন লক্ষ লোকের স্বাক্ষর।

সবে স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে ৫০।৬০ হাজার। সেই সময়ে হঠাৎ নির্মেঘ আকাশে চমকে উঠল বজ্র। নিষ্কম্প বাতাস দুলে উঠল বজ্রাঘাতের বিপুল শব্দে। কেঁপে উঠল পায়ের তলার নিথর মাটি। বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর।

জাতির জীবনে ঘোর অমাবস্যার রাত। বাইরে দুর্যোগের ইসারা। মনে দুঃস্বপ্নের ইংগিত। বিশ্বজগত নিশ্বাসবায়ু সম্বরি। স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে। ঠিক সেই ভয়ংকর শ্মশানে শব-সাধনার নর-কঙ্কাল-রচিত আসন ছেড়ে যেন উঠে দাঁড়াল করাল মূর্তি এক কাপালিক। তার রক্তচক্ষু। তীক্ষ্ণ নাসা। মুখ-গহ্বরে দুই দন্তপংক্তির অবিরাম ঘর্ষণের বজ্র-কঠিন দৃঢ়তায় সমস্ত মুখমণ্ডলের মাংসপেশী নির্দয় উল্লাসে উদ্ভাসিত। তবে কি তিনি

কৃতসংকল্প ? তবে কি তিনি সিদ্ধ ? তবে কি এবার মহাউল্লাসে বেজে উঠবে বলির বাজনা ? খড়্গো ঝলসে উঠবে রক্তের ক্ষুধা ?

হ্যাঁ, তাই। আর কোন সংশয় নেই। সমস্ত উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠার অবসান। বঙ্গভঙ্গ স্থির। ব্রিটিশ সিংহের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

আবার ফিরে যাই বিজয়চন্দ্রের সেই 'বঙ্গ-মঙ্গলে'। এবার তৃতীয় পর্ব। 'তূণক ছন্দে' গাঁথা 'সিদ্ধি' অধ্যায়। কৃতসংকল্প-কার্জনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের অপরূপ কাব্যরূপ।

অস্ত্র-হস্ত লাট, মস্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে।
সাধ্যকার আজি তার নায্য কার্য রোধিবে ?
মন্ত্রপূত লাট-দূত দেশ দেশ ধাইল ;
ভেদমন্ত্র-বেদমন্ত্র, কণ্ঠ তার গাইল।
হর্ষ নেত্র পাত্র মিত্র লম্ফ-ঝম্ফ ঝাঁপিল।
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড হইল তায় দুঃখ কি ?
খণ্ড-শূন্য মেদপূর্ণ রৈল লাট-বাক্যটি।
দেব সর্ব লাট-গর্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল,
বঙ্গমুণ্ড দেহপিণ্ড ছাড়ি ভূমি স্পর্শিল।
স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ম সাঙ্গ, লাট ঘাড় নাড়িল।
তূণকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাড়িল।
মাথাটা গেল যবে, ত্যাখে সবে
দেহটা ঠাণ্ডা !
কেহবা ভাবে মনে সংগোপনে
গেছে বা প্রাণটা।
উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে,
তবুও নড়ে না !
আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা
শ্বাস যে পড়ে না।

টিপিয়া নাড়ী তার ফেরেজার
কহেন লাটকে,
"আবার দেহটিতে পার দিতে
মাথাটা আটকে ?"
কহেন লাট যে সে কড়া ভাষে :
"কোরো না বিজ্‌বিজ !
জুড়িয়া দিলে মাথা রবে কোথা
আমার Prestige."
খণ্ড হল বঙ্গ দেশ
খণ্ড কাব্য হল শেষ ;
বঙ্গের মঙ্গল আজি করিল কর্জন।
শ্রীবঙ্গ-মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজন॥

৬ই জুলাই-এর 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক তার সম্পাদকীয়তে লিখলে, বঙ্গের সর্বনাশ।

৭ই জুলাই সিমলা থেকে খবর এল যে আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, দার্জিলিং ছাড়া রাজশাহী বিভাগ একসঙ্গে মিলিয়ে গঠিত হয়েছে নতুন প্রদেশ। আপাতত কিছুদিনের জন্যে এই প্রদেশ থাকবে কলকাতা হাইকোর্টের অধীন। পরে নতুন প্রদেশে তৈরী হবে নতুন চীফ্‌ কোর্ট। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন একজন স্বতন্ত্র ছোটলাট। রাজধানী হবে, ঢাকা।

৮ই জুলাই, শনিবার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাংলার ছোটলাট এন্‌ড্রু ফ্রেজারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "মোগল বা পাঠান শসনকালেও আমাদের জাতির এমন সর্বনাশ হয় নাই, আমাদের পক্ষে এমন বিপদ আর কখনও হয় নাই। মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে আমাদিগকে

যে-সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান গভর্নমেণ্টের আমলে আমরা সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত।"

সভাপতি অম্বিকাচরণও ছোটলাটকে সম্বোধন করে বললেন, "স্যার, অতি বড় অপরাধীরও অধিকার আছে চূড়ান্ত বিচারের আগে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের। কিন্তু সরকার ত্রিশ কোটি দেশবাসীর ভাগ্য-নির্ধারণে নির্দোষ দেশবাসীকে তার মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ দিলেন না।"

১৯শে জুলাই সিমলায় বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত অনু-মোদন করলেন। ২০ জুলাই তা প্রকাশিত হল সংবাদপত্রে। স্থির হল, আগামী ১৬ই অক্টোবর, বাংলার ৩০শে আশ্বিন থেকে শুরু হবে বঙ্গভঙ্গের কাজ। নামবে ক্ষুরধার ফলা বাংলার হৃৎপিণ্ডের উপর।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "The announcement fell like a bomb-shell upon an astonished public.....We felt that we had been insulted, humilated and tricked."

তারপর থেকেই প্রতিবাদ।

গঙ্গা আর পদ্মা মিলিয়ে যত লক্ষ ঢেউ, তত লক্ষ মানুষের প্রতিবাদ।

প্রতিবাদ রূপ নিতে লাগল বিক্ষোভের, বিদ্রোহের। যে-মাটিতে বিগ্রহ গড়া হয়, তাকে আগে ভেজাতে হয় জলে।

১৯০৩-এ ছিল আশঙ্কার মেঘ। ১৯০৪-এ আবেদন-নিবেদনের অশ্রুপাত। ১৯০৫-এ এসে ভিজে বারুদ শুকিয়ে ধীরে ধীরে রূপ নিতে লাগল বিস্ফোরক বিদ্রোহের।

কৃষ্ণকুমারের 'সঞ্জীবনী' তার নিজের সম্পাদকীয়তে ক্ষমাহীন ভাষায় লিখলে, "লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দ্বিতীয় আয়ার্লণ্ড করিবেন। বঙ্গদেশ চিরদিন রাজভক্ত, বাঙালী চিরদিন নিরীহ, শান্ত, শিষ্ট ও আইনানুগত। কিন্তু লর্ড কার্জন যে বিষম শেল বাঙালীর প্রাণে বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার যাতনায় বাঙালী দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য

হইয়াছে। বঙ্গদেশে মহা অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। লর্ড কার্জন বাঙালীর আন্দোলন উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এই উপেক্ষার ফল শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন।”

সরকারী আমলারাও সেদিন কর্তার ইচ্ছায় কর্মকে কুর্নিশ ঠুকে স্বাগত জানায় নি। তাদের মতে এই সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বকে করবে ক্ষত-বিক্ষিত, ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার আর্থিক বনিয়াদ। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স ইংরেজী স্বার্থ-পুষ্ট প্রতিষ্ঠান। তারও দুজন প্রভাবশালী সদস্য প্রকাশ্যে সমর্থন জানাল বাঙালী জাতির প্রতিবাদে।

সমর্থন জানাল কলকাতার হাইকোর্ট। তাঁদের মন্তব্য, সরকারী সিদ্ধান্ত একটা “retrogate and mischievous step.” ‘সন্ধ্যা’ লিখলে,—সরকারের আসল উদ্দেশ্য হল বাঙালীকে ধ্বংস করা এবং তাকে ইউরোপীয়ানদের মোসাহেব বানানো।

‘চারুমিহির’ লিখেছিল, ‘বাংলা ভাষা-ভাষি একটা সমগ্র জাতির ঐক্যমতকে অগ্রাহ্য করে কার্জন একটা কথাই জানাতে চান যে ইংরেজ শুধু অস্ত্রের জোরেই ভারতবর্ষে শাসন চালিয়ে যাবার অধিকার বজায় রাখবে এখন থেকে’।

প্রতিবাদের বিস্ফোরণ শুধু দেশী পত্রিকা, দেশীয় নেতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। আধা-সরকারী মুখপাত্র হিসেবে যাদের পরিচয়, সেই সব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র-পত্রিকাও অন্তরালে মুখ লুকিয়ে নেই, প্রতিবাদে মুখর। তাদের মধ্যে রয়েছে ইংলিশম্যান, স্টেটস-ম্যান, পায়ওনীয়ার, দি ক্যাপিটল। সরকারী মুখপাত্র যাঁরা, তাঁরাও নির্বাক দর্শক নন।

অন্যের কথা বাদ দিই, স্যার বমফীল্ড ফুলার, নতুন প্রদেশের ছোটলাট হবার পর সারা পূর্ববঙ্গে যিনি ত্রাসের রাজত্ব, নৃশংস অত্যাচারের নরক গড়ে তুলেছিলেন, তিনিও গদীয়ান হবার আগে ছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী।

লর্ড মর্ল্‌ি, ১৯০৬ সালে যিনি ভারত-সচিবের পদ পেয়েছিলেন, তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে কার্জনের ভুল। স্বীকার করতে হয়েছে দেশব্যাপী আন্দোলন দেশের মানুষেরই বুকের বেদনা, মনের তেজস্বীতা দিয়ে গড়া, কার্জনের মতানুযায়ী কয়েকজন 'Political wire-pullers and political agitators'-এর উত্তেজনা নয়। স্বীকার করতে হয়েছে, জনমতকে অগ্রাহ্য করে কার্জন যা করছেন তা অন্যায়।

'লণ্ডন ডেইলী' সাগরপারে খাস ব্রিটিশরাজের দেশের কাগজ। লিখলে—

"ভারতবাসীর কাছে এই ঘোষণা খুবই বেদনা-দায়ক মনে হওয়া স্বাভাবিক। ১৯০৩-এই উঠেছিল সমালোচনা ঝোড়ো হাওয়া। কার্জনকে অবনত হতে হয়েছিল।

বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে ২৫ লক্ষ বাঙালী অধিবাসীকে বিনা বাক্যব্যয়ে, তাদের কোনরকম আলোচনা বা মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ না দিয়ে, তুলে দেওয়া হচ্ছে এক নবগঠিত প্রদেশে।

বাংলাদেশে জ্ঞানীগুণীর দুর্ভিক্ষ নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই রকম একটা বিরাট ভয়ংকর রূপান্তর ঘটাবার আগে দেশের সেই সব স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, মত-বিনিময়ে লর্ড কার্জনের বাধাটা ছিল কোথায়? এর একটাই উত্তর আমাদের জানা। কার্জন জনসাধারণের মতামত জানতেন। তাই মুখের তর্কে কালক্ষয় না করে তাদের ঘাড়ে জোর করে সিদ্ধান্তটা চাপানোই শ্রেয় মনে করেছেন।"

পরিশেষে দুর্বিনীত রাজশক্তির প্রতি বিনীত অনুরোধ— "ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করে দেখা দরকার।"

ইংলণ্ডের আরেক নামজাদা কাগজ "টাইম্‌স"। কার্জনের

প্রিয় পত্রিকা। কার্জন এক সময়ে ছিলেন ঐ কাগজের লেখক। টাইম্‌স এতদিন পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে কার্জনের। পঞ্চমুখে প্রশংসা। হ্যাঁ, বড়লাটগিরি করার মত মদত্‌দার মানুষ বটে একটা! কিন্তু সেই টাইম্‌সও সুর পাল্টাল। ১৯০১ সালে পাঞ্জাব থেকে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে যে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল ভারতবর্ষে, টাইম্‌স লিখলে, তা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল সরকারী মহলে। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আজ যে প্রবল প্রতিবাদ জেগে উঠেছে—তার ধরণ আলাদা। তা মুষ্টিমেয়র নয়, অপরিমেয় জনসমষ্টির।

টাইম্‌স-এর বিশ্লেষণে, এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই আসামের সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে সবসুদ্ধ হয়তো তিন লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সারা বাংলায় তাদের সংখ্যা ৪১ লক্ষ। এখন এই বিশাল জনসংখ্যাকে ভাগ করার অর্থ দাঁড়াবে, বাঙালীকে দু'টুকরো করা, যার বড় অংশটা যাবে নতুন সরকারের শাসনাধীনে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বৃহৎ প্রদেশ হিসেবে বাংলার গর্ব যাবে মুছে। শুধু তাই নয়। কলকাতা বাঙালীর প্রাণ-কেন্দ্র। বাঙালীর যা কিছু সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক চেতনার যা কিছু বিকাশ, তা সবেরই পীঠস্থান এই কলকাতা। বাঙালীর একটা বৃহৎ অংশ এই কলকাতাকে হারাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে নেতারা দেশবিভাগ, ও দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তুলেছেন, তাকে সমর্থন বা সহানুভূতি না জানিয়ে উপায় নেই।

টাইম্‌স-এর সময়োচিত সুচিন্তিত মন্তব্য বাংলায় অনুবাদ হয়ে বেরুল 'সঞ্জীবনীতে'।

প্রথমে মনে হয়েছিল, এ বুঝি আভিশাপ। সর্বনাশ। সে ভুল ভাঙতে লাগল। ক্রমশ আর দুর্ভাগ্যবলে মনে হয় না দেশকে দু-ভাগ করার চক্রান্ত। এ যেন শাপে বর। অভিশাপ নিতে

চলেছে আশীর্বাদের রূপ। মার খেয়ে জেগে উঠছে মরা। রামানন্দের প্রবাসীতে তারই পূর্বাভাস—

"লর্ড কার্জনের মত খারাপ শাসনকর্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমরা ঠিক তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে ?

বঙ্গবিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন করিয়া এ পর্যন্ত যে সকল সরকারী কাগজপত্র বাহির হইয়াছে তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত হইয়াছে। গভর্নমেণ্টের কোন যুক্তিই প্রবল বলিয়া মনে হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। একই কারণে গভর্নমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজ করিতে চাহেন। যেমন এক ভাষাভাষি লোকদিগকে একত্রে করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট মধ্যপ্রদেশের ওড়িয়াদিগকে ও বাঙলার লেফটেনেণ্ট গবর্নরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙ্গলা বলে, ও একই শাসনকর্তার অধীনে এক প্রদেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতেছে! অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ, ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়ামমতার (old association) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিঙ্গকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গলাকে এসকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন! তর্ক যুক্তিতে গবর্নমেণ্টের হার হইয়াছে। তবু গবর্নমেণ্ট নিজের গোঁ ছাড়িবেন না।······এইরূপ একগুঁয়েমীর গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই। হয়তো বা কোন গোপনীয় কাগজে আছে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু আসল কারণ উচ্চশিক্ষা যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা। তজ্জন্যই

লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন 'I have always thought that Dr. Gooroodas Banerjee held a brief for his unworthy client, the Bengali student, when it is our desire politely to suppress.' কার্জনের ভাষায় বাঙালী ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অযোগ্য, অপদার্থ। তাই প্রয়োজন তাদের সে-সুযোগ কেড়ে নেওয়া।"

জাতির কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বরাভয়।

"বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা একত্র হইব। বাহিরের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ আবেদন-নিবেদনের বিরোধী। যার হাতে মার খাওয়া, তাকেই গিয়ে মারের ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার নিতে বলা—এটা পৌরুষের প্রহসন। তাই প্রথম দিকে নেতারা যখন সরকারী কুশাসনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে সরকারী দুঃশাসনের দরজায় মাথা গলাচ্ছিলেন, সেই সময়ে কবিকণ্ঠে বেজে উঠল নির্দয় ভর্ৎসনা—"যদি সত্যিই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালী জাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইতেছে,—যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ?"

না আর করুণা ভিক্ষা নয়। এবার জীবন-পণ সংগ্রামের প্রস্তুতি।

দুর্ধর্ষ নেতা সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের কাগজ 'বেঙ্গলী' বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে বললে—"A great national disaster." সেই সঙ্গে সতর্কবাণী—"আজ আমরা এমন এক আন্দোলনের মুখে

এসে দাঁড়িয়েছি, বেগের তীব্রতায় ও বোধের ব্যাপকতায় যা একদিন এই প্রদেশ সৃষ্টি করবে এক অলঙ্ঘনীয় ইতিহাস, এই সত্য-ঘোষণায় একবিন্দু অতি-কথনের অপরাধ নেই।" আর বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ টাউন হলের এক ঐতিহাসিক জনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—"I will unsettle settled fact."

তাঁর সেদিনের উদ্যত তর্জনীর লক্ষ্য ছিল একজনই। লর্ড কার্জন। আর কার্জন মানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যাশা, স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয় নি। ব্যর্থ হয় নি বাঙালী জাতির আকাঙ্ক্ষা।

বজ্রাঘাতের মতো যে অভিশাপ সহসা বাঙালী জাতির মাথায় ভেঙে পড়েছিল, তাইই তার বুকের পাঁজরে জ্বালিয়ে দিল সাহসের, শক্তির সংগ্রামের বিদ্রোহের বজ্রানল।

আগুন ছড়িয়ে শহর থেকে গ্রামে। প্রাসাদ থেকে কুটীরে। রাজপথ থেকে জনপদে। কবিরা লিখলে গান। চারণ কবির ভূমিকায় এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। শিল্পীরা আঁকতে বসলেন ছবি। নাট্যকার লিখলেন নাটক। নেতারা যোগালেন বাক্যের বারুদ। ছাত্ররা স্বেচ্ছায় ক্লাস ছেড়ে হল স্বেচ্ছাসেবক। জনসাধারণ গলায় তুলে নিলে বাঁচার নতুন মন্ত্র—'বন্দেমাতরম'। স্বদেশের মানুষ গড়ে তুললো 'স্বদেশী আন্দোলন'।

কোন কোন রাজভক্ত, রাজত্বপ্রিয় ইংরেজ ভেবেছিলেন বাঙালীর 'স্বদেশী আন্দোলন' 'ন' দিনের তামাশা'। দেখতে দেখতে উবে যাবে কর্পূরের মতো। কিন্তু যায় নি। দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল একেবারে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের শেষ দিন পর্যন্ত, নানা বিপর্যয়ে কোথাও না থেমে, পথের নানা বাঁকে নানান রূপ নিয়ে, কখনো আগুনের শিখায় কখনো অসহযোগের নম্র, নিরুপদ্রব অথচ উন্নত শক্তিতে। গান্ধিজী পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন, যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-

সাম্রাজ্য বিনাশের পথপ্রদর্শক। "the Partition of Bengal led to the Partition of British Empire."

উইল ডুর‍্যান্ট তাঁর ইতিহাসের বইয়ে লিখলেন, ১৯০৫ থেকেই ভারতবর্ষে বিপ্লবের শুরু।

চিন্তাবিদ্ বিনয় সরকারের স্বীকারোক্তি।

"বাঙালীর বাচ্চা আমি, বাঙালীর চোখে ছুনিয়া দেখি। আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এ একটা খাঁটি যুগান্তর।"

অরবিন্দের মতে, বঙ্গ-ভঙ্গ হল বিধাতার মহা আশীর্বাদ। এর ফলে ইংরেজ সম্পর্কে মোহ, মীরচিকা (illusion) দূর হয়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লিখেছিলেন—

"প্রাণের যে বন্যা, সে তো অঙ্কশাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন তো হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায় সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না। না-জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই জন্মায়।......এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া-ডুবিয়া বাঁচিয়া আছি। বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সততা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি।"

জন্মভূমির চেয়ে বড় ভারতবর্ষ। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও যাঁর জীবনের যোগ শুধু ধ্যানে নয়, কর্মে, স্বপ্নে নয় সংগঠনেও। সেই নিবেদিতা লিখেছেন—

"এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজচিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের

সর্বক্ষেত্রে যেন সহস্রদল কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের জীবনের সর্বপ্রান্তরে নবস্রোতধারা সৃষ্টি করিয়াছে।

এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছে। বাংলাদেশের অগ্নিসাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যে আদর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছেন, যেভাবে তাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আপনাদের অস্থি-পঞ্জর জ্বালাইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন—তাহা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলার একক সাধনা।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"স্বাধীনতার আন্দোলন পৃথিবীর নানা দেশেই হয়েছে, কিন্তু এমন সুসংযত, সুসঙ্গত, সুপরিকল্পিত আন্দোলন আর কোথাও হয়েছে বলে জানি না। রাজনৈতিক আন্দোলনও যে কতখানি সুষমামণ্ডিত হোতে পারে বাংলাদেশ ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত রেখেছে। রাজনীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাষায় এবং ব্যবহারে রুক্ষ। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তারি একটা স্নিগ্ধ রূপ ছিল, কিন্তু সেটি তার দুর্বলতা নয়, কারণ বৃটিশ সরকারকেও এর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।"

অবনীন্দ্রনাথও এঁকেছেন স্বদেশী যুগের এক ছবি, তাঁর কলমের তুলিতে।

"হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বলতে পারি নে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে বুড়ো, বড়লোক মুটে-মজুর সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ। সবাই বলে হুকুম আয়া। আরে এই হুকুমটাইবা দিলে কে, কেন। তা জানে না কেউ, জানে

কেবল—হুকুম আয়া। তাই মনে হয় এটা সবার ভিতর থেকে এসেছিল। রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, তিনিও বোধ হয় বলতে পারবেন না কে দিল এই তাগিদ, কোথেকে এল এই স্বদেশী হুজুগ। আমি এখনো ভাবি—এ একটা রহস্য। বোধ হয় ভূমিকম্পের পরে একটা বিষম নাড়াচাড়া—সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। বড়ো ছোটো মুটে-মজুর সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল। তখনকার স্বদেশী যুগে এখনকার মত মারামারি ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল না। তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙতো না কিছু। সবাই দেশের জন্যে ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্যে কিছু করতে হবে।”



॥ বিদ্রোহের হাতিয়ার বয়কট ॥



ঝড়ের বেগে, তুফানের টানে, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল একটা নতুন শব্দ—বয়কট। ব্রিটিশ-বিরোধী অগ্নিযজ্ঞের নতুন মন্ত্র।

কি শহরে, কি গ্রামে এমন একটা দিন যায় না যেদিন মিটিং নেই। এমন একটা মিটিং হয় না যার শুরু ও শেষে নেই বিরাট মিছিল। এমন মিছিল হাঁটে না যাতে উচ্চারিত হয় না ঐ সুদৃঢ় শপথ—বয়কট।

কথাটা এদেশে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমদানী। প্রখ্যাত আইরিশ-নেতা পার্নেল রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের একটা অস্ত্র হিসেবে শাসক ইংরেজ জাতির সঙ্গে সকল প্রকার সামাজিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধকে বর্জন করার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় বয়কট নীতি। 'বয়কট' আসলে একজন লোকের নাম। জমিদারের কর্মচারী। জমিদার কোন প্রজার জমি বিক্রি করে দিতে চেষ্টা করলে অন্য কোন প্রজা তা কিনবে না। যদি কেনে তাকে বর্জন করা হবে। পার্নেলের এই নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার ফলে ক্যাপ্টেন বয়কটকে 'একঘরে' করা হয়। প্রজাদের অনুরোধে ও ভয়ে ক্যাপ্টেনের চাকর-মজুররাও তাঁকে ত্যাগ করে যায়। তাঁর ক্ষেত পড়ে থাকে অনাবাদী। কেউ রাজী হয় না তাঁর গাড়ি চালাতে, ঘোড়ার নাল বাঁধতে, কাপড় কাচতে, বেচা-কেনা করতে। শেষ পর্যন্ত জমিদারের চেষ্টায় কামান বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে সৈন্যরা

আসে সাহায্য করতে। ক্ষেতের চাষ-আবাদ, ফসল-সংগ্রহ করে তারাই। ৫ হাজার টাকার ফসলের জন্যে খরচ হয় ৫৭ হাজার টাকা। তারপর থেকেই 'বয়কট' কথাটার প্রচলন।

'ডন সোসাইটির' সতীশ মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের জনক। এই বয়কট নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সেদিন জানালেন—

"সরকার সমগ্র বাঙালী জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ও বয়কট করেছে। সরকারী বয়কটের পাল্টা জবাব হিসেবে জাতি গ্রহণ করেছে আর এক ধরনের বয়কট। তত্ত্বের দিক থেকে বয়কট মতবাদ যতই হিংসাত্মক মনে হোক না কেন, আমাদের পক্ষে এই বিশেষ অবস্থায় বয়কট-দর্শন হল জাতির আহত আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুরেন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিলেন,

"বয়কট-ই জাতির নব-জাগ্রত মুক্তি-আন্দোলনের শেষ কথা নয়। বয়কট হল একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—এটা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। এর একমাত্র লক্ষ্য হল বাংলার অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বঙ্গভঙ্গ রদ্ করে ঐ অভিযোগ দূর করা হলে বয়কট-ও প্রত্যাহৃত হবে।"

'বয়কট' প্রস্তাবের প্রথম উত্থাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাঁর 'সঞ্জীবনী'র ১৩ই জুলাই-এ সম্পাদকীয় বেরুল—

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয়, ততদিন বাঙালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ বন্ধ হইবে। বাঙালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহা-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে, তপশ্চর্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী-দ্রব্য স্পর্শ করা

মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে; তবু বিদেশী নুন খাইবে না। গুড় খাইবে; তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা-বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের সভ্য, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতে পারিবে না। জাতীয় অশৌচের সময়ে বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না।······যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজ-পুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের আমোদে কেহ যোগ দিতে পারিবে না।"

১৭ই জুলাই অমৃতবাজারে বেরুল একটা চিঠি। কোন এক ছদ্মনামীর লেখা। চিঠির মূল কথা, বিলেতী দ্রব্য তো বটেই, তবু বিশেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার ক্লথ বয়কট করা হোক। তার ফলে ইংরেজ-প্রভুদের টনক নড়বে। ঐ দেশের জনসাধারণ উঁকি মেরে দেখতে চাইবে সত্যিই ভারতবর্ষে কি ঘটতে চলেছে।

অনেকের মতে ঐ ছদ্মনামী লেখক সেকালের বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ। লালমোহন সোজা কথার, এবং কঠিন ভাষার মানুষ। দিনাজপুরে জুলাই-এর এক জনসভায় বললেন,—সভা-সমিতি করে কোন কাজের কাজ হবে না। সরকারের কাজে গড়ে তুলতে হবে অসহযোগ। তার তিনটে রাস্তা। ১। সরকারী খোলস খুলে সমস্ত অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেরিয়ে আসতে হবে পদত্যাগ পত্র লিখে। ২। জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, আর পঞ্চায়েতের সদস্যদের ছাড়তে হবে পদমর্যাদা। ৩। আগামী এক বছর ধরে পালন করতে হবে জাতীয় শোক। আমোদ-উৎসব বন্ধ।

সংবাদ পত্রের পাতায় প্রথম ফুটে বেরুল শোক চিহ্ন। চারপাশে কালো বর্ডার দিয়ে বেরুতে লাগল পত্র-পত্রিকা। দেখতে দেখতে সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠল বয়কট-প্রতিজ্ঞা গ্রহণের

জনসভায়। শুধু কলকাতা নয়। শুধু রাজপথে নয়। সুদূর জনপদেও জনতার জাগরণ। আজ সভা বসছে পাবনায়। কাল বগুড়ায়। পরশু টাঙ্গেলে। সাড়া পড়ে গেছে যশোরে, ময়মনসিংহে। মানিকগঞ্জ, নারাণগঞ্জ, ঢাকা, বীরভূম, নওগাঁ-র গাঁয়ে গাঁয়ে চলেছে বয়কট-এর অভিযান।

কলকাতার আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছে ছাত্রসমাজ। ১৭ই জুলাই রিপন কলেজে ঘটে গেছে এক ছাত্রসবাবেশ। আবার সভা বসবে ২৪শে, ২৯শে, ৩০শে। ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিক ২০০জন ছাত্র স্বাক্ষর দিয়েছে বয়কট-প্রস্তাবে।

৩১শের মিটিং আরও বড়। প্রস্তাব নেওয়া হল, বয়কট-আন্দোলনকে বলবান করে তোলার জন্যে গড়া হবে ছাত্র-কমিটি, সরকারী-বেসরকারী সমস্ত কলেজের প্রতিনিধি নিয়ে।

নেতারাও বসে নেই। কেবল কনফারেন্স। আজ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে, কাল ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাড়িতে, পরশু টাউনহলে। ঠিক হল 'বয়কট' আর 'স্বদেশী আন্দোলন' ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের প্রান্তে-প্রান্তে, প্রাণে প্রাণে।

৭ই আগস্ট।

সেদিন সকাল থেকে কলকাতার দোকানপাট, বাজার-হাট সব বন্ধ। সমস্ত শহর যেন শোকের পাষাণপুরী। পুলিসী রিপোর্টও এটা অস্বীকার করতে পারে নি। লিখেছিল, শহরের কোন কোন অংশে এক বোতল লেমনেড পর্যন্ত কোথাও কিনতে পাওয়া যায় নি। সমস্ত শহর তাকিয়ে আছে যেদিকে, সেটা টাউন হল। একাগ্র দৃষ্টি। উদ্গ্রীব অপেক্ষা।

সেদিন টাউন হলে ঘটতে চলেছে এক ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রতিনিধিরা এসেছেন বাংলাদেশের সমস্ত জেলা থেকে। সারা দেশের নেতারা উপস্থিত। যোগ দেবে ছাত্ররাও।

সভা পাঁচটায়। কিন্তু তার আগেই বেলা দুটো থেকে, কলকাতার বুঝি কোন রাজপথ বাকী নেই, কালো পতাকা আর কালো মাথার মিছিল দিয়ে ছাওয়া। ছাত্ররা আসছে টাউন হলের মিটিং-এ যোগ দিতে। দুজন দুজন করে সারি বাঁধা। সামনে নীল রঙের ফেস্টুন। তাতে লেখা—বাংলা অখণ্ড।

প্রথমে চারদিকের দলগুলো এসে জমায়েত হল কলেজ স্কোয়ারে। সেখান থেকে পাঁচ হাজার ছাত্রের মিছিল যাত্রা করল টাউন হলের দিকে। ধীর গতি, ভারী পদক্ষেপ, কালো পতাকা, ভারাক্রান্ত হৃদয়, সব মিলিয়ে যেন একটা বিপুল শোকযাত্রা। রমাকান্ত রায় পরিচালকরূপে পুরোভাগে।

দেশের বৃহত্তর সমাজে জাপান-প্রত্যাগত স্বদেশ-প্রেমিক রমাকান্ত রায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা এই ৭ই আগস্টের দিনটিতে। সেদিনের শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাত্র-অভিযানের মূলে তাঁরই প্রবল প্রচেষ্টা। সহযোগী যোদ্ধা শচীন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'স্মৃতি-তর্পণে' জানিয়েছেন—

"৭ই আগস্ট টাউনহলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। বাঙালী যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত এবং সংহত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এ বিশ্বাস পূর্বে অনেকেরই ছিল না। আমাদিগেরও যে organisation করিবার ক্ষমতা আছে, আমরা এইদিন তাহার প্রথম আভাস পাইলাম এবং এই দিনই এই শাল-প্রাংশু মহাভুজের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ হইল। রমাকান্ত রায়ের বীরত্বব্যঞ্জক দীর্ঘবপু দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে পাঞ্জাবী বলিয়া মনে করিতেন; আমরাও সেদিন তাঁহাকে বাঙালী মনে করিতে পারি নাই। শেষে অনুসন্ধানে জানিলাম তিনিই জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায়। সমাজে এমন দু-একজন লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যে, তাঁহারা নেতৃত্ব

করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং মানুষ দলবদ্ধ হইলেই তাঁহারা সমাজের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ..... রমাকান্ত রায়ের সেই যে ৭ই আগস্টের বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছি, তাহার পরে কলিকাতায় যত মিছিল বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে রমাকান্তের উন্নত মস্তক সকলের অগ্রে দেখা গিয়াছে।"

দশটা টাউন হলে আঁটবে না বুঝি, এত লোক। জনসমুদ্র। রাজা মহারাজা, উকীল-মোক্তার, ছাত্র-শিক্ষক, কুলি-মজুর, সাধারণ মানুষ সব একাকার। শেষপর্যন্ত ঠিক করা হল উথলে-পড়া এই উদ্বৃত্ত জনতাকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না ঘরমুখো। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো সভার আয়োজন।

প্রধান সভা টাউন হলেই রইল। সভাপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। দ্বিতীয় সভা টাউন হলের একতলায়। সভাপতি ভূপেন্দ্র-নাথ বসু। তৃতীয় সভা টাউন হলের সামনের মাঠে। সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার।

সভাপতির ভাষণে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ব্যথিত কণ্ঠস্বর,—এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী জাতির উপরে এতবড় দুর্যোগ আর কখনও আসে নি।

সভায় গৃহীত হল চারটি প্রস্তাব।

প্রথম। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কারণ এটা দুই বাংলায় সামাজিক, নৈতিক, ঐতিহ্যিক, ব্যবসায়িক, ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্তরায়। পরিশেষে সরকার পক্ষকে এই অযৌক্তিক আইন প্রত্যাহারের জন্যে অনুরোধ। প্রস্তাবক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। সমর্থক আশুতোষ চৌধুরী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

দ্বিতীয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সমর্থন।

তৃতীয়। যতদিন না এই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হচ্ছে, ব্রিটিশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার ততদিন নিষিদ্ধ। ভারতবাসীর সম্পর্কে ব্রিটিশ-জাতের অবজ্ঞা, উদাসীনতার বিরুদ্ধে এটাই এদেশের চরম জবাব। প্রস্তাবক নরেন্দ্রনাথ সেন।

চতুর্থ। আন্দোলন থামবে না। অব্যাহত থাকবে যতদিন না মিটবে দাবি।

সবকটি প্রস্তাবই গৃহীত হল সাদরে, সর্বসম্মতিক্রমে। বিরুদ্ধে কে বলবে? কি বলবে? সকলেই তো একই রুদ্ধ বেদনার অংশীদার। এক সর্বনাশের শরিক।

'স্বদেশী-যুগের স্মৃতি' মতিলাল রায়ের স্বদেশী-জীবনের ধারা-বিবরণী। তাঁর চোখে দেখা ৭ই আগস্ট দিনটির বিশাল তাৎপর্য, বিপুল উপলব্ধি তাঁর ভাষাতেই উল্লেখযোগ্য।

"একদিন প্রভাতে রাজনগরীর পথে পথে বৃহৎ রক্তাক্ষরে ঘোষণাপত্র আঁটিয়া দেওয়া হইল। ৭ই আগস্টের বিরাট সভায় ব্রিটিশপণ্য বর্জনের জন্য দলে দলে লোক সমবেত হওয়ার আহ্বান —সেদিন বিধাতার ডাকের মতো, তাহা বাঙালীর অন্তঃস্তলে নূতন আশার ফুলঝুরি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সে উৎসাহের আগুন স্পর্শ করে নাই, এমন লোক ছিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অবচেতনার স্তরে অপমানের কশাঘাত বুঝি বড় নির্মমরূপেই বাজিয়াছিল এবং তাহার প্রতিশোধকামনায় অন্তরে বৃশ্চিকজ্বালার মতো তীব্র অনুভূতি সেদিন জাতিকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে মহাসমারোহ ব্যাপার! সেদিন জাতির বৈশিষ্ট, স্বাতন্ত্র্য, ভীরু বাঙালীর সুপ্ত বীর্য নতুন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছিল। কাতারে কাতারে, রাজপথের উপর দিয়া হরিদ্রাবর্ণরঞ্জিত উষ্ণীষ মাথায়, স্কুল-কলেজের অসংখ্য ছাত্র সেদিন গভীর নিনাদে 'বন্দেমাতরম' শব্দে জগতের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিল। তেমন শোভাযাত্রা বোধ হয় আর হইবে না।...কল্পনা-কাহিনী নহে, সত্যই রুগ্ন যে সেও লাঠি হাতে পথের

ধারে এই অপূর্ব জাগরণচিত্র দর্শনে উৎসাহে আত্মহারা হইয়াছিল, মুমূর্ষুর নয়নে আশার বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল।...সেদিন ভাবার অবসর ছিল না। সেদিন কোথায় কাহার স্বার্থ, আভিজাত্য, ভবিষ্যতের পরিণাম চিন্তা সব যেন লোপ পাইয়াছিল। তাই ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তিস্বরূপ কাশিমবাজারের রাজবংশ তিলক স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিবাদ-সভায় নেতৃপদ গ্রহণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'We shall be strangers in our own land'."

৭ই আগস্টের রাত পোয়াতে তর সইল না। খবর পৌঁছে গেল ইংল্যাণ্ডে। পরের দিন সেখানকার একাধিক পত্র-পত্রিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল, কলকাতার ৭ই আগস্টের ঐতিহাসিক জনসমাবেশ ও বাঙালীর সংগ্রাম ঘোষণা।

পরের দিন মঙ্গলবার। পার্লামেণ্টের অধিবেশন। সেই অধিবেশনে মিঃ হার্বার্ট রবার্টস প্রস্তাব তুললেন, বঙ্গচ্ছেদের হুকুম কাগজে বেরোবার পর বাংলাদেশে অতি ভয়ংকর অবস্থা উপস্থিত। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা না-হওয়া পর্যন্ত পার্লামেণ্টের অন্য সমস্ত আলোচনা স্থগিত থাকুক।

শুরু হয়ে গেল বাদ-বিসম্বাদ। প্রতিপক্ষের যুক্তির প্রতিবাদে রবার্টস সাহেব সরোষে জানালেন, সরকারী কর্মচারীদের ইচ্ছাতেই বঙ্গবিভাগ হবে—এটা অন্যায়। সকলের আগে যেটা গ্রহণ করা উচিত সেটা হল বাঙালী জাতির মতামত ও মনোভাব।

তর্কের গুরুগম্ভীর গর্জনেই শেষ হল অধিবেশন। হল না কোন সুশীতল ধারাবর্ষণ।

এদিকে বয়ে চলেছে প্রবল ধারাস্রোত। আর পরোয়া নেই সরকারী অনুগ্রহের। দেশের অণু-পরমাণুতে জেগে উঠেছে বে-পরোয়া আবেগ। আন্দোলন আর কেবল নেতাদের বজ্রমুষ্টি কিংবা সিংহনাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রান্তে প্রান্তে, গঙ্গা ডিঙিয়ে, পদ্মা পেরিয়ে, মানুষের

সংসারে, ছাত্রসমাজে, ছাত্রসমাজের চওড়া বুকের ছাতি ছাড়িয়ে সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষের অস্থি-মজ্জায়।

বরিশালের ছাত্ররা চলেছে স্কুলে-কলেজে। নগ্ন পা। বিদেশী জুতো, সুতরাং বর্জনীয়। ময়মনসিংহের মুচিরা বললে, বিদেশী জুতো আর বানাবে না। উড়িয়া রাঁধুনী-চাকররা জানিয়ে দিলে, তারা সেসব মনিবের হুকুম মানতে নারাজ যারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করছে। কালীঘাটের ধোবারা জানালে, বিদেশী বস্ত্র কাচবে না। পুরোহিতরা জানালে আমরা সেইসব বিবাহানুষ্ঠান বর্জন করবো, যেখানে বিলেতী বস্ত্র বর্জন করা হয় নি। এমনকি গোঁড়া পণ্ডিতেরা এগিয়ে এল হিন্দু শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা-ভাষ্য নিয়ে। বিদেশী নুন বা চিনি খাওয়া অশাস্ত্রীয়। ছাত্ররা বর্জন করল পরীক্ষা। কারণ যে-কাগজে পড়ার বই, প্রশ্নপত্র ছাপা তা বিদেশ-জাত। বইখাতায় আগে যারা লিখতো God is good কিংবা শ্রীহরি, তারা সেসব ঘষে-মেজে তুলে দিয়ে নতুন করে লিখলে, বন্দেমাতরম্।

সন্ধ্যা, বঙ্গবাসী এইসব কাগজ নিয়মিত প্রচার করে চলল, বিলেতী নুন আর চিনির মধ্যে মেশানো রয়েছে শুয়োর আর গরুর হাড়ের গুঁড়ো। খাওয়া মানেই ধর্মনাশ। ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা দুজন প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন তাঁদের মধ্যে থেকে, যাঁরা সারা দেশে প্রচার করে বেড়াবে স্বদেশী আদর্শ।

কতদূরে পুরী। 'বয়কট' আন্দোলনের ডাকে সেখানকার পুরবাসীরাও বেরিয়ে এল দরজা খুলে। সভা ডেকে শপথ নিলে একশ'জন সাধু ও শ্রমণ। তাঁরা এখন থেকে সারা ভারতবর্ষে স্বদেশী মন্ত্র ব্যাখ্যা করে বেড়াবে।

ব্যারাকপুর আর ফোর্ট উইলিয়ামের সেনাবাহিনীর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে স্বদেশী অনুভব। সেপাইদের তিনটে রেজিমেন্ট জানিয়ে দিলে তারা বিদেশী কাপড়ে বানানো পোষাক পরতে

নারাজ। পরিণামে তাদের হাতের অস্ত্র নেওয়া হল ছিনিয়ে। তাদের চালান করে দেওয়া হল সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

এইসব উত্তাল ঘটনাবলীর পাশেই ছোট্ট এক তিল একটা ঘটনা। জ্বলন্ত রোদের পৃথিবীতে এক ফোঁটা শিশির, যতটুকু পারে সেও যেন বুকে ভরে নিতে চাইছে রোদের আগুন, উত্তাপ। মাত্র ছ' বছরের মেয়ে। শুয়ে আছে রোগশয্যায়। রুগ্ন, জীর্ণ। জীবন তার কাছে কত লোভনীয়। বাঁচার তার কত আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য তার জেদ। বিদেশী ওষুধ খাবে না। ছোঁবে না। বাবার চোখ রাঙানীতেও না। মায়ের চোখের জলের মিনতিতেও না।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন নিজের পাঁচ বছরের নাত্নীর কথা। নরম তুলতুলে একজোড়া জুতো কে যেন তাকে দিয়েছিল উপহার। ভাল লেগেছিল। কিন্তু নিল না। কারণ সেটা বিদেশী।

'স্বদেশী যুগের স্মৃতি'তে প্রাণের উচ্ছ্বসিত অন্তরঙ্গ আবেগে দেশের এই জেগে ওঠা যৌবনের ছবি—

"৭ই আগস্টের বয়কট ঘোষণা অগ্নিশিখার ন্যায় বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলি বাঙালীর প্রতিজ্ঞা বাণীতে পূর্ণ হইয়া বাহির হইত। সভা-সমিতির খবর ব্যতীত, ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিও বড় বড় অক্ষরে জাগরণের সাড়া তুলিত। মূকের ভাষা ফুটিয়াছিল, পঙ্গুও সেদিন গিরিলঙ্ঘন অসম্ভব মনে করে নাই।

শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এই মহা-উত্তেজনা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। চারণের কণ্ঠভেরী পল্লীকৃষক, শ্রমজীবীর প্রাণে আগুন জ্বালিয়াছিল এবং তাহা আর নিভিবার অবকাশ পায় নাই; কেননা বাঙালীর পণ—বিদেশী দ্রব্য বর্জন। কাজেই তাঁতী জোলার কর্মবিহীন শীর্ণ বাহুযুগল আশায় উৎসাহে আবার সবল হইয়া উঠিয়াছিল, কামারের

হাপরে আগুন জ্বলিয়াছিল, কুম্ভকার, মালাকর, বাংলার কারিকর শ্রেণীর সুপ্ত প্রতিভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা বেকার বসিয়াছিল, তাহাদের চক্ষেও আশার বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের তরুণ স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি এমন অনুরক্ত হইয়া পড়িল, সে চা খাইবার জন্য চায়ের পেয়ালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নারিকেল মালা হাতে তুলিয়া লইল। বাংলায় বিশ্বকর্মার কারখানা বসিয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, সমুদ্রতটের ঝিনুক-কড়ি শার্ট-কামিজের বোতাম হইয়া স্বদেশী বাজার সাজাইয়া তুলিল, নারিকেল মালা হইতে কোর্টের বোতাম প্রস্তুত হইল, কুললনার হস্ত হইতে কাঁচের চুড়ি খসিল, রাশি রাশি আলুর চুড়ি, শাঁখায় বাজার ছাইয়া গেল—হাতের কাছে যাহা সহজে মিলিল, তাহা দিয়াই স্বদেশী পণ্য উৎপাদন করার সে উৎসাহ ভাষায় বর্ণনা করার নয়। ছাত্রগণ, কেরানীগণ প্রকাশ্য সভায় বিলাতী সিগারেট ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করা মাত্র বেকার যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের প্রাণে শক্তির সঞ্চার হইল, পথের ধারে ভদ্রসন্তানগণ পান বিড়ির দোকান খুলিয়া বসিল। কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রই স্বদেশী যুগ সফল করার দায়িত্ব মাথায় বহে নাই, অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত লক্ষ্মীছাড়া তরুণের দল সেদিন দেখাইয়াছিল, তাহাদের ইউনিভার্সিটির চাপরাশ লওয়ার বুদ্ধি-প্রতিভা না থাকিলেও, দাসত্বের বন্ধনী গলায় পরিয়া উপার্জনের প্রবৃত্তি না থাকিলেও, দেশের ডাকে সাড়া দেওয়ায়, প্রাণ দেওয়ায় তাহাদের বাধে নাই; এবং সে যুগে এই বেকার লক্ষ্মীছাড়ার দলই স্বদেশী যুগের শক্তিস্বরূপ হইয়াছিল, বিধাতা যেন এই জাগরণ-যুগের সেনাবাহিনী-রূপেই তাহাদের গড়িয়াছিলেন।”

৭ই আগস্ট বাংলাদেশে ভূমিষ্ঠ হল বয়কট আন্দোলন। একই সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনও। যেন যমজ।

৭ই আগস্ট আর একটি কারণেও ঐতিহাসিক। ঐদিন থেকেই

বাংলার যাবতীয় জাতীয়-সংগ্রামের মন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হল 'বন্দেমাতরম'। পরের যুগে লক্ষ লক্ষ প্রাণ এই মন্ত্র উচ্চারণের অপরাধে মাথায় খেয়েছে লাঠির মার, হাতে পরেছে লোহার শিকল, পায়ে বেড়ী, গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ফাঁসীর দড়িতে। কামানের চেয়ে এই মন্ত্রের শক্তি সেদিন কম ছিল না। তলোয়ারের মত ছিল তার ধার। অগ্নির মতো তা লেলিহান। বন্যার মতো বেগবান। মড়কের মতো সংক্রামক। মৃত্যুর মতো ভয়ংকর। ব্রিটিশ শাসকেরা তাই এই মন্ত্র-কে সেদিন ভয় পেয়েছিল যমের মতো। বাঙালীর কণ্ঠ থেকে এই মন্ত্র-কে মুছে দেবার জন্যে তারা যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণায়-মন্ত্রণায়।

৭ই আগস্টের পর ২৩শে সেপ্টেম্বর।

সভাপতি, আবদুল রসুল। রাজাবাজারে মুসলমানদের জনসভা। সর্বসম্মতিক্রমে সেখানেও গৃহীত হল তিনটি প্রস্তাব।

এক। মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক নয় এই ধারণা বা সংবাদ মিথ্যা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের তারাও সর্বতোভাবে উৎসাহী-আগ্রহী-শরিক। সংগ্রামী সৈনিক।

দুই। শুধু বঙ্গভঙ্গের বেলাতেই নয়। হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য ঘটার প্রয়োজন তাদের পারস্পরিক আরও বহু স্বার্থে।

তিন। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের স্বপক্ষেও তাদের সমর্থন আন্তরিক, সহযোগিতা সক্রিয়।

কদিন পরেই এল পুণ্য মহালয়া তিথি। ২৮ শে সেপ্টেম্বর। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। দুর্যোগের ঘনঘটা আকাশে-বাতাসে। সেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দলে দলে শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ হেঁটে চলেছে চীৎপুর দিয়ে, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে। যত এগিয়ে চলেছে, ততই তা রূপ নিচ্ছে বিশালতর। চলেছে কোথায়? কালীঘাটে। সেখানে

আজ মাতৃমূর্তির উদ্দেশ্যে মাতৃমন্দিরের সামনে উদ্‌যাপিত হবে প্রার্থনা, উদ্‌ঘাটিত হবে সংকল্প, আসন্ন দেশ বিভাগের দুঃসময় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে। জনস্রোতের সঙ্গে মিশে রয়েছে সংকীর্তনের দল। দলের সংখ্যা একশো-র কম নয়। তারা গাইছে জাতীয় সংগীত। হাতে উড়ছে পতাকা।

কালীঘাটে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই। পঞ্চাশ হাজার মানুষ। নাটমন্দির যেন ডুবে গেছে জনসমুদ্রে। পূব দিকের প্রাঙ্গণও স্রোত-মগ্ন। শুধু মানুষ, মানুষ। পরিধানে সিল্ক বা তসরের বস্ত্র। নগ্ন পদ। নত মস্তক।

বেলা এগারোটায় শুরু হল পূজা। হোমে পড়ল ঘৃতাহুতি। আগুনের প্রজ্বলন্ত শিখা উঠল উর্ধ্বমুখী হয়ে। চন্দন কাঠের আগুন। বাতাস ভরে উঠল সৌরভে পবিত্রতায়। পুরোহিত পড়লেন শক্তির মন্ত্র, ভক্তির মন্ত্র। শত শত কণ্ঠে একযোগে পুনরুচ্চারিত হল সেই মন্ত্র। পূজা শেষ হলে দলে দলে সবই মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা পালন করবো স্বদেশী আদর্শ, সার্থক করবো স্বদেশের উজ্জীবন, উন্মীলন।

এদিকে যখন জনশক্তি কার্জনী-চক্রান্তের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতার পথে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে, ওদিকে তখন কার্জন প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁর সাত-বছরের দীর্ঘ বড়লাট-জীবনের শেষ মুহূর্তের যবনিকা পতনের মুখোমুখি হতে।

বসেছিলেন বেশ জাঁকিয়ে। কিন্তু ভারত-সেনাপতি জঙ্গীলাট লর্ড কিচেনারের সঙ্গে খিটির-মিটির করতে গিয়ে বীরবাহুর পতন। কার্জন চাইলেন জঙ্গীলাট থাকবেন তাঁর অধীন। কিচেনার অসম্মত। বিলেতের কর্তৃপক্ষও কড়া রায় দিলে কিচেনারের সমর্থনে। কার্জন উদ্ধত, অহংকারী। পদমর্যাদা বোধের তাড়নায় বাধ্য হলেন পদত্যাগপত্র লিখতে। সেটা ৭ই আগস্টের মাত্র পাঁচ দিন পরের ঘটনা।

পদত্যাগপত্র লিখলেও এবং গৃহীত হলেও কার্জন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন না। রয়ে গেলেন আরো কয়েক মাস। নভেম্বর পর্যন্ত। অনেকে মনে করেন কাটা-গর্দান নিয়েও কার্জনের গদী আঁকড়ে থাকার পিছনে ছিল বিলেতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। ১৯০৫ এর ডিসেম্বরে যুবরাজ, যিনি পরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ, আসছেন ভারত-পরিভ্রমণে। কার্জনের তার আগে কলকাতা ত্যাগ করা উচিত নয়। অনেকে মনে করেন কার্জন নিজেই চেয়েছিলেন তাঁর বহু সাধের, বহু সাধনার বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনাকে তিনি কাজে লাগিয়ে তবে পা বাড়াবেন স্বদেশের পথে।

স্বদেশের পথে পাড়ি দেওয়ার দিনে সিমলায় এক বিদায়-ভোজের অনুষ্ঠানে কার্জন ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন—যদি এক কথায় আমার শাসনকার্যকে ব্যক্ত করতে হয়, তাহলে বলবো সেটা হল দক্ষতা ("if I were asked to sum up my work in a single word, I would say efficiency....)

কী অপূর্ব আত্মহননকারী আত্মপ্রসাদ!

পাশাপাশি, সমান্তরালভাবে চলেছে এগিয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি। একদিকে বঙ্গভঙ্গের অনুশাসন। শাসকের জেদ। অন্যদিকে বয়কটের আন্দোলন। শাসিতের জোর।

পুলিসী অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল দেশব্যাপী এই আন্দোলনের পিছনে অগোচর থেকে সাহায্য, অন্তরাল থেকে সাহস যুগিয়ে চলেছেন বড় বড় ভূস্বামীরা। তাদের নায়েব-গোমস্তা, লোক-লস্করের মারফত। তাই কঠোর শাসনেও দাবানো যাচ্ছে না তাদের দাবি। এদিকে বয়কট-আন্দোলন যত হয়ে উঠছে তীব্র, ইংরেজ-মহলে ততই দেখা দিচ্ছে তার কুটীল প্রতিক্রিয়া।

'হিতবন্ধু' ঠিকই লিখেছিল—"ইংল্যাণ্ডকে শাসন করে তার বণিকেরা। মাঞ্চেস্টারের তাঁতীদের টনক নড়িয়ে দিতে পারলে, তারাই সেদেশে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। এর জন্যে

আমরা যেটা করতে পারি তা হল ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় ব্যবহার করা একেবারে বরবাদ।”

হতে চলেছে ঠিক তাই। ছদিন আগেও যারা ছিলেন ভারত-হিতৈষী, সমর্থন জানিয়েছিলেন সরকারী ভেদ-নীতির বিরুদ্ধে দেশ-বাসীর আইনসঙ্গত বিক্ষোভে, তাদের গলা বাজতে লাগল বেসুরে। কারণ ঘা পড়ছে আঁতে। আঁতে নয়, তাঁতে। একেবারে ভাতে-কাপড়ে।

পাটোয়ারী ব্যবসাবুদ্ধি যাদের রক্তের কণায় কণায়, তাদের কাছে নীতির মূল্য কানাকড়ি। সুতরাং ক্রমে ক্রমে খসতে লাগল জন-দরদের মুখোস, ফুটে বেরুল বিকট মুখভঙ্গী। বিদেশী বণিকেরা তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করলে বাঙালী-কর্মচারীর ছাঁটাই-পর্ব। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা সদম্ভে গর্জন করে উঠল—দরকার পড়লে আমরা হাতে তুলে নেবো তলোয়ার।

এতখানি ক্রোধ একেবারেই অকারণ নয়। ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতটাকে অনেকদিন থেকেই তারা দেখছে। মুখে এরা অনেক কিছু বলে। কাজে করে না। মুখের কথাকে যে এমন নিদারুণভাবে কাজে খাটাতে মন-প্রাণ উজাড় করে বসবে সে-অভিজ্ঞতা তো এই প্রথম।

এ-রকম বয়কটের কথা আগেও উঠেছিল অনেকবার। ১৮৭৫-৭৬ এবং ৭৮-এ প্রথম। বোম্বাই-এ ভারতীয় উদ্যোগে সদ্য-গড়ে উঠেছে কাপড়ের কল। ম্যাঞ্চেস্টার তাতে রেগে আগুন। ম্যাঞ্চেস্টারের মাতব্বরির বিরুদ্ধে এবং ভারতের স্বাবলম্বী ব্যবসা-বাণিজ্যকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় প্রস্তাবিত হয়েছিল বয়কট-এর ডাক। অবশ্য সে-ডাক বেশী দূর ছড়াল না। তার আগেই এগিয়ে এল ব্রিটিশ-বণিক-স্বার্থের চক্রান্ত।

ক'বছর পরে আবার একবার সাড়া উঠেছিল বয়কটের। ১৮৮৩-৮৪। ইলবার্ট বিল আর সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসকে কেন্দ্র

করে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ-বিরোধী একটা সার্বিক বিক্ষোভ।

চেষ্টা হয়েছিল বয়কট-প্রচলনের। সার্থক হয় নি।

এবারেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে, বয়কটের হুমকী এগোতে না এগোতেই হুমড়ী খেয়ে পড়বে মাটিতে। এটাই স্থির জানা ছিল ইংরেজদের।

কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের স্টেটসম্যান চোখে আঙুল দিয়ে ভাঙিয়ে দিলে ভুল। হিসেবে দেখা গেল, বিলেতী বস্ত্রের বাজার বাংলায় ক্রমশ শোচনীয় পতনের মুখে। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে যশোহর জেলায় যেখানে ৩০,০০০ হাজার টাকার বিলেতী কাপড় বিক্রি হয়েছিল, ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বরে সেটা এসে ঠেকেছে মাত্র হাজারে। বরিশাল কুমিল্লায় এই পতনের গতি আরও নিম্নমুখে।

এমন দুঃসমাচারে ইংরেজ বণিকদের কপালের শিরা, আর চোয়ালের হাড় যদি রাগে-রোষে টনটনিয়ে ওঠে, খুব কি দোষের?

দেশবাসী বয়কট মেনে নিয়েছে, কায়মনোবাক্যে। কিন্তু কংগ্রেস? তার নেতারা কি একমত?

১৯০৫-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন, কাশীতে। দেখা যাক কি ঘটে সেখানে, ভাবছে দেশবাসী।

কাশী কংগ্রেসের অধিবেশন বসার তিন দিন আগে নিবেদিতা কলকাতা থেকে রওনা হলেন কাশীর পথে। যাবার আগে প্রচারিত হল তাঁর একটি আবেদন, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনকে উপলক্ষ্য করে।

"কংগ্রেস নিশ্চয়ই তার সদস্যদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে জাতীয়তাবোধ। প্রকাশ করবে সেই পারস্পরিক সহানুভূতি যা হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, মণিপুর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটা বিশাল পরিবারকে বেঁধেছে একসূত্রে।"

নিবেদিতার এই ঘোষণা ছিল উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত। ভারতের

অখণ্ড ঐক্য এবং সদ্য-জেগে-ওঠা জাতীয় আন্দোলনের উদ্বেলিত অগ্রগতিকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন তাঁর ঐকান্তিক ভারত-প্রেমের গভীরে। তিনি দ্রুত দেখতে চেয়েছিলেন পর-শাসন মুক্ত ভারত-বর্ষের মুক্তিস্নান। চান নি বিভেদে কণ্টকিত হয়ে উঠুক এই নব প্রস্ফুটন। দল-উপদলের উপদ্রবে যেন উৎসন্নে না যায় একতার এই শতমুখী উন্মীলন।

মনে ছিল ভীরু আশংকা। আশংকার পিছনে ঘটনার সমর্থন। কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকেছে কলহ। শিক্ষা-প্রসঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন করার প্রশ্নে, বয়কটের প্রশ্নে দেখা দিয়েছে মতভেদ। আসন্ন কংগ্রেস-অধিবেশন থেকে যদি আসন্ন বিভেদ-বিতর্ককে ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, সেটাই হবে জাতির জীবনে সবচেয়ে শুভময়। এই উদ্দেশ্যেই ঐ ঘোষণাপত্র।

কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের একটা সরু গলিতে খোলার ঘরে বসল নিবেদিতার আপিস। সঙ্গে কয়েকজন সেক্রেটারী।

কংগ্রেস-অধিবেশন বসতে চলেছে। সভাপতি গোখলে।

গোখলে বাঙালী-প্রিয়। কিন্তু বাঙালীর প্রাণের নেতা নন। গোখলের সম্বন্ধে অনেক সংশয়, দ্বিধা, সন্দেহ। কাশী কংগ্রেসের অল্পদিন আগেও তিনি বিলেতে। নিবেদিতা তাঁকে চিঠি লিখলেন।

"...এখানে একটা গুজব রটেছে। কর্তৃপক্ষ বলছেন, তুমি নাকি বঙ্গ-বিচ্ছেদের স্বপক্ষেই মত দিয়েছ। আমরা অবশ্য জানি, এ-কথা সত্য নয়। কিন্তু এ-গুজবে লোকের মন এত বিগড়ে গেছে যে তোমার স্বাক্ষরিত একটা সুস্পষ্ট প্রতিবাদ বেরুলে কাজ হত। কাউন্সিলের কোনও ইউরোপীয়ান সদস্য কি তোমার মতামত চেয়েছিল? তখন কি তুমি এমন-কিছু বলেছ যার ভুল অর্থ করা হয়েছে? যদি বলেও থাক, তবুও দেশবাসীর স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে তাদের মতটাই যে চূড়ান্ত, একথা লেখবার পথ তোমার খোলাই আছে।...

সারা দেশে এমন কি মেয়ে-মহলেও বিলাতী-বর্জনের ধুম পড়ে গেছে। দেশের লোক যে-পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করছে তা একেবারে অসাধারণ। প্রবল স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপনায় অখ্যাত সাধারণ লোকেও যে ছোটখাট মহত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছে, আমার মতে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। এতেই দেশের সুপ্ত সামর্থ্যের একটা নিরিখ পাওয়া যায়। রুশবাসীর এমনি তেজেই নেপোলিয়নের মস্কো-অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। এমনি করেই আমেরিকা স্বাধীন হয়েছিল। ইতিহাসে আরও নজির আছে। এই করেই পর পর সব কিছু এসে যাবে। কয়েক মাস আগে ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের ছিল না। আজ চারদিকে এর চিহ্ন দেখছি। এই হল আদত আশার কথা, আর-সব সে-তুলনায় নেহাত তুচ্ছ। খরিদদার কোনও বিলাতী মাল চাইলে সাধারণ একটা মুদীও তাকে বয়কট করছে এমনও দেখা যাচ্ছে। পুরনো দিনের যে সব কথা ওদের কানে ঢোকে নি ভেবেছিলাম, আজ সে সব কথা হাওয়ায় ফিরছে। দেখছি, হারায় নি কিছুই, সব জমা আছে মনের গোপনে…”

গোখলে সম্পর্কে বাঙালীর সন্দিগ্ধ শ্রদ্ধার শুরু কয়েকবছর আগে। ১৮৯৭-এ। বোম্বাই-এ প্লেগ দমনের নামে গোরা সৈন্যদের উৎকট-অশালীন উপদ্রবকে কেন্দ্র করে ব্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ড, এবং তারই পরিণামে তিলকের কারাদণ্ডের পটভূমিকায়। গোখলে বিলেতে। বম্বে থেকে খবর গেল সরকারী অত্যাচারের। গোখলে খবর জানালেন স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্নকে।

বিলেতের পত্র-পত্রিকাতেও খবর বেরুল গোখলের মারফত। ওয়েডারবার্ন প্রশ্ন তুললেন পার্লামেন্ট। মহা শোরগোল। বম্বে-গভর্নমেন্টের তীব্র সমালোচনা। পার্লামেন্ট কৈফিয়ত চেয়ে পাঠাল এই অপকর্মের। জবাবে বম্বে গভর্নমেন্ট জানালে, যা শুনেছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা। কিছু প্রমাণ আছে ?

পার্লামেণ্টে ওয়েডারবার্নকে জানালে, প্রমাণ চাই। ওয়েডারবার্ন গোখলেকে জানালেন, প্রমান চাই। গোখলে কোন প্রমাণ যোগাতে পারলেন না। ওয়েডারবার্ন ক্ষমা চাইলেন পার্লামেণ্টের কাছে।

বিলেত থেকে ফিরছেন গোখলে। বন্দরে থেমেছে জাহাজ। মাটিতে পা দেবার আগেই বোম্বাই-এর পুলিস-কমিশনার উপস্থিত। বিলেতে থাকাকালে বোম্বাই-সরকারের বিরুদ্ধে আপনি অযথা নিন্দা প্রচার করেছেন। ক্ষমা চাইতে হবে। গোখলে বললেন, বিলেতে যা বলেছি সত্য জেনেই বলেছি। কিন্তু প্রমাণ যখন নেই তখন তার জন্মে ক্ষমা চাইবো।

তাঁর এই ক্ষমা চাওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল দেশবাসী। সংবাদপত্রও ক্ষীপ্ত। অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। গোখলে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা তুললে হিস্ হিস্ শব্দের ঝড়।

বন্ধ হল বক্তৃতা। অপমানিত গোখলে তারপর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন বটে কিন্তু পর পর ছ'বছর একবারও মুখের দরজা খোলেন নি বক্তৃতার জন্মে, একেবারে খিল-আঁটা।

গোখলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতি। আইন-অমান্মের বিরোধী। বাঙালীর প্রতি তাঁর আবেদন ছিল—"Agitate moderately, Loyally, without obstinacy and folly and trust in Mr. Morley."

বাংলাদেশে তখন মডারেটদের পড়তির দশা। সুরেন্দ্রনাথের শৌর্য ম্লান হবার মুখে। বিপিনচন্দ্র এগিয়ে আসছেন বীর-বিক্রমে। কাশী-কংগ্রেসের আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে বিপিনচন্দ্রের উৎসাহে তৈরী হয় চরমপন্থী 'স্বদেশ মণ্ডলী'। সর্বপ্রকারে ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগ 'স্বদেশ মণ্ডলী'র মূলকথা।

কাশী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে লণ্ডন থেকে বারাণসীতে এসে পৌঁছলেন গোখলে।

"মহাসমারোহের মধ্যে গোখলে পুণ্যধাম কাশীতে ঢুকলেন। বাজনা বাজিয়ে জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা করল। স্টেশন থেকে একটু দূরে জমকালো একখানা জুড়ি দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। দেশের নিয়ম, একটি মেয়ে পুরবাসীদের হয়ে নেতাকে স্বাগত জানাবে। সবাই একবাক্যে নিবেদিতাকে এ-কাজের ভার দিল। গোখলে নামতেই নিবেদিতা এগিয়ে এসে তাঁর সামনে ধরলেন এক পাত্র দুধ, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। তারপর গলায় পরিয়ে দিলেন সোনালী জরির থোপনা-গাঁথা ফুল-কর্পূরের মালা।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে শহরের দিকে। নিবেদিতা চলেন গোখলের বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল, অধীর উত্তেজনায় ঘিরে ধরল গোখলের গাড়ি। গোখলেকে দেখতে চায়, ছুঁতে চায় তারা। একখানা খোলা গাড়িতে গোখলেকে চড়ানো হল। তারপর ঘোড়া খুলে দিয়ে সবাই মিলে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

এমনই প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জাতীয়-মহাসভার অধিবেশন শুরু হল। অধিবেশন গৃহেও যেন উৎসবের উচ্ছ্বাস। রঙিন কাগজের ঝুলন-মালা আর নিশান উড়ছে চারদিকে। আশপাশের অলি-গলিতে লোকের কী হৈ-চৈ, যেন মেলা বসেছে। যাওয়া-আসার পথে দোকানীরা দোকান খুলেছে, বই-এর দোকানই বেশী। গাছের তলায় বসেছে অস্থায়ী ভিয়ান, বিক্রি হচ্ছে কচৌড়ি, পকৌড়া, ডালমুট।"

রবীন্দ্রনাথ গাইলেন 'বন্দেমাতরম্' গান। সভা শুরু হল।

সভার শুরুতেই চরমপন্থী দলের নেতা বিপিনচন্দ্র প্রস্তাব তুললেন, এবারের কংগ্রেসকে বাংলার 'বয়কট' আন্দোলনের প্রতি জানাতে হবে পূর্ণ সমর্থন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের

আগে কলকাতার চরমপন্থী নেতারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গৃহে গড়েছিল 'স্বদেশী মণ্ডলী'। বিপিনচন্দ্র সেই 'স্বদেশী মণ্ডলী'র মুখপাত্র।

সভাপতির ভাষণে নরমপন্থী গোখলের ভিন্নমত। তিনি স্বদেশীর সমর্থক। স্বদেশী নিষ্পাপ পবিত্র, এতে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নেই। শুধু বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষও এই আন্দোলন গ্রহণ করতে পারে, কোন বাধা নেই। কিন্তু বয়কট বা ব্রিটিশ-পণ্য বর্জনের আন্দোলন ভিন্ন ব্যাপার। এর মধ্যে আন্দোলনের চেয়ে আক্রোশটা যেন বেশী। যেন একটা প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা রয়েছে এর মধ্যে। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে সম্পর্ক তাতে কংগ্রেস এই বয়কটকে সারা ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বরণ করে নিতে পারে না। এটা বাংলায় চলতে পারে। কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালীর ক্রুদ্ধ মনোভাব থেকেই এর জন্ম। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করার ব্যাপারে ইংলণ্ডের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্যেই বাঙালীরা এটা গড়েছে। এবং বাঙালীর এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের সহযোগিতা ও সমর্থন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ 'বয়কট' আন্দোলনকে গ্রহণ করতে অপারগ।

ব্যক্তিগতভাবে 'বয়কট' আন্দোলনের পক্ষপাতী না হলেও, বাঙালীর আন্দোলনের প্রতি গোখলের সমর্থন আন্তরিক। তিনি বললেন—

"বঙ্গভঙ্গের ফলে বঙ্গদেশে যে বিরাট আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে স্মরণীয়। এদেশে বৃটিশ-শাসন প্রবর্তনের পর এই প্রথম বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে জনগণ সকলে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনা ব্যতীত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশের উপর প্রকৃত দেশাত্মবোধের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্পর্শে এখন পুরাতন বিভেদ

বিদূরিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ঈর্ষার অবসান হইয়াছে, আর সব বিতর্কের বিলোপ ঘটিয়াছে। উগ্র ও অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙলা যেভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছে এবং বাংলা যে লাঞ্ছণা সহ্য করিয়াছে, তাহাতে সমগ্র দেশ সহানুভূতিতে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সম্মিলিত হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে বাঙলার লাঞ্ছনাভোগ ব্যর্থ হয় নাই।

বাঙলায় যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা বন্যার জলোচ্ছ্বাস, তাহাতে সময় সময় কোথাও কোথাও তীরভূমি প্লাবিত হইয়া যায়, তাহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, যখন অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, পরবশ্যতা হইতে স্বাধীনতার দিকে জনগণ স্বতঃ অগ্রসর হয়, তখন এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে অধিক বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই আন্দোলনে লক্ষ্য করিবার সর্বপ্রধান বিষয় এই যে, ইহাতে জাতির বিশেষ শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং সেজন্য সমগ্র দেশ বাঙলার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে বদ্ধ। একথা বলা বাহুল্য যে বাঙলার জননায়কদিগকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সে সব অসাধারণ, হয়ত বিপদ কেবল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমি জানি, কোনরূপ দায়িত্ববিমুখ হইবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের নাই—যত ত্যাগ স্বীকারই কেন প্রয়োজন হউক না, তাঁহারা সানন্দে তাহাতে সম্মত হইবেন। সমগ্র দেশ আজ বাঙলার নেতৃগণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের কর্মে সকল প্রদেশের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিবেন। তাঁহাদিগের পরিবাদ আমাদিগেরও পরিবাদ হইবে। বাঙলার নেতারা যেন একথা বিস্মৃত না হয়েন যে, বর্তমানে সমগ্র ভারতের সম্মান তাঁহাদিগের উপরে নির্ভর করিতেছে।"

অধিবেশনের অপর বক্তা লালা লাজ্‌পত রায়। তিনি বাঙালীর আন্দোলনের স্বপক্ষে, বয়কটেরও স্বপক্ষে। বললেন—

"আমরা বাঙলার ভ্রাতৃবৃন্দের দুর্দশার কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সর্বনিয়ন্তা ভগবান এদেশে যে নতুন রাজনীতিক জীবনের উষালোক বিকাশের সৌভাগ্য বাঙলাকে দিয়াছেন, সেজন্য বাঙলাকে অভিনন্দিত করিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে। আমার মনে হয়, বাঙলাই সর্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষার স্বাদ পাইয়াছিল বলিয়া এই কাজ করিবার সম্মান বাঙলার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কোন কারণে বাঙলা-সিংহ অবনত হইয়া শৃগালে পরিণত হইয়াছিল—এখন লর্ড কার্জন তাহার বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করায় সে আপনার সিংহত্ব উপলব্ধি করিয়াছে।……বাঙলার লোকের পদাঙ্কানুসরণ করিলে ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিবে।"

বয়কট-এর সমস্যাটা কোনমতে মিটল। গোখলে স্বীকার করলেন বয়কট আন্দোলন বাঙালীর পক্ষে "Perhaps only constitutional and effective means left."

কিন্তু নরম বনাম গরমের সংঘাত তীব্র হয়ে উঠল যুবরাজের সস্ত্রীক ভারত পরিদর্শনের সময়ে অভিনন্দন জানানো নিয়ে। চরমপন্থীরা ঐ অভিনন্দন জানাতে রাজী নয়। নরমপন্থীরা রাজী। শেষপর্যন্ত চরমপন্থীরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কংগ্রেস অধিবেশন ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

নিবেদিতা যা আশঙ্কা করেছিলেন তাইই ঘটল। কংগ্রেসের অখণ্ড ঐক্যের গায়ে আঁচড় পড়ল বিভেদ-বিরোধের।

নিবেদিতা ছিলেন ঐ অধিবেশনে কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সংবাদদাতা। 'An English observer' ছদ্মনামে প্রতিদিন সন্ধ্যেয় পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিপকে পাঠাতেন ডেস্‌প্যাচ।

সাংবাদিক হিসেবেও নিবেদিতা নগণ্যা নন। নিউ ইণ্ডিয়া, প্রবুদ্ধ ভারত, ইণ্ডিয়ান রিভিউ, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড, ভারতী, প্রবাসী,

মডার্ন রিভিউ এই সব পত্রিকার তিনি প্রায় নিয়মিত্ব লেখক। অরবিন্দের অবর্তমানে তাঁর 'কর্মযোগীন' পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্বও নিয়েছিলেন কিছুদিন। নিবেদিতার প্রতি জাত-সাংবাদিক রামানন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলী—"She was a born journalist. She wrote with briliancy, vigour, and originality, and even, on common place themes, with something like inspired fervour."

আসলে কাশী-কংগ্রেসে সাংবাদিক-সাজটা ছিল বাইরের ছদ্ম-বেশ। নিজেকে গোপন করার ছল। নেপথ্যের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বকে যদি অন্তর্হিত করা যায়। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যাতে কংগ্রেস একটা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর আপিসঘরে তাই দেখা যেত নরম-গরম দু-দলের নেতাদেরই আনাগোনা, আলোচনা। আসতেন রমেশচন্দ্র, সঙ্গে বরোদার মহারাজা।

"প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর তিল-ভাণ্ডেশ্বরের বাসাটি হয়ে ওঠে নেতাদের বৈঠকখানা। একটা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে নিবেদিতার কাছে যাওয়াই চাই সবার। তা ছাড়া ওখানে তাঁদের মন্তব্যগুলো খবরের কাগজওয়ালাদের কানে ওঠবার ভয় নাই। বিভিন্ন দল আর বিরোধী সংখ্যালঘুরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতভেদ নিয়ে আলোচনা চালান ওখানে। খুশীমত যাওয়া-আসা চলে। বন্ধুজনেরা করেন দ্বাররক্ষীর কাজ।

নীচের তলার ঘরগুলোতে আপিসের কাজ হয়। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়ে নিবেদিতা ওখানে কাজ করেন। অধিবেশনের অনেক ভাষণই প্রথম তাঁর হাতে এসে পড়ে, তিনি চমৎকার ইংরেজীতে সেগুলো মার্জিত করে দেন। অনেক সময় বক্তাদের সাহায্যে তাদের আবার ঢেলে সাজা হয়। সরকারী সমালোচনার জবাবস্বরূপ প্রচুর পরিসংখ্যান আগে-ভাগেই ঠেসে দেওয়া হয়

তাদের মধ্যে। সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোও নিবেদিতা তেমনি যত্নে সংশোধন করে দেন। কি-ধরনের কাজ যে নিবেদিতা করেছিলেন, গোখলের উদ্বোধন-ভাষণে চোখ বুলোলেই তা বোঝা যায়।

দিনের বেশীর ভাগ যায় মহাসভার অধিবেশনে। তারপর নিবেদিতার বৈঠক চলে অনেক রাত অবধি। আগন্তুকদের বসানো হয় যে-ঘরে, সে-ঘরের মেঝেয় পাতলা একটা মাদুরের পরে সাদা চাদর পাতা। ঘরের এককোণে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে নিবেদিতা স্বাগত জানান অভ্যাগতদের। তাঁকে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে মণ্ডলী করে বসেন সবাই। আসছে কালের কর্মসূচী কি? এই প্রশ্ন করে আলোচনার সূত্রপাত করেন নিবেদিতা। যেদিন গোখলে আসেন, বাড়ির বাইরে রাস্তায় সেদিন ভিড় জমে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর গাড়ির পিছনে ধীরে ধীরে লোক চলতে থাকে"।

কাশী-কংগ্রেসের পরই সারা ভারতবর্ষে সর্বজনপ্রিয়া হয়ে উঠলেন নিবেদিতা।

কাশী-কংগ্রেস শেষ হল। পরিণামে বাংলার রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করল চরমপন্থীদলের প্রাধান্য।

১৯০৫-এর ২৯ শে ডিসেম্বর। সস্ত্রীক যুবরাজ আসছেন কলকাতায়। কাশী-কংগ্রেস থেকে সদ্য-প্রত্যাগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ধুলোপায়ে ছুটলেন গঙ্গার দিকে, যুবরাজ-দম্পতীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। কিন্তু চরমপন্থীরা সেখানে অনুপস্থিত।

সেইদিন বিকেলেই গোলদীঘিতে ছাত্রদের সভা। ষ্টীমার ঘাট থেকে ফিরে ভূপেন্দ্রনাথ ছুটে এলেন ছাত্র-সভায় যোগ দিতে। ছাত্ররা সেদিন ভূপেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানাল না। তার বদলে মুখের সামনে উত্তেজিত ধিক্কার ধ্বনি। নরমপন্থীদের রাজভক্তির প্রতি ছাত্রদের বিদ্রোহ-বিদ্রূপ।

ক্রমে চরমপন্থীদের নেতা দাঁড়াল তিনজন। বাংলার পাল অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র। পাঞ্জাবের লাল অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়। মহারাষ্ট্রের বাল, অর্থাৎ বাল গঙ্গাধর তিলক।

সুরেন্দ্রনাথের শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ-তেজস্বিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল অবসন্নতার দিকে, অস্তাচলের পথে। বিনয় সরকারের বিচারে "সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীতা ছিল, স্বদেশ-নিষ্ঠাও ছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বিলাতী বয়কটের স্বপক্ষে তাঁর প্রচারিত উদ্দীপনার কিস্মৎ ছিল ঢের। কিন্তু ১৯০৫-০৮ সনের যুগে তাঁকে বিপ্লবপন্থী বলা সম্ভবপর ছিল না। ষোলআনা রাষ্ট্রিক স্বরাজ, ষোল-আনা সাংস্কৃতিক স্বরাজ, ষোলআনা শিক্ষা-স্বরাজ ইত্যাদি চরম স্বাধীনতার বাণী সুরেনবাবু প্রচার করতে পারেন নি। কাজেই তাঁকে নরম বা মডারেট দলের নেতা বলা হতে লাগল, পসার জমল বিপিন পালের। এই জন্য আমি বিপিন পালকে বঙ্গ-বিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা বলে সম্বর্ধনা করে থাকি। অরবিন্দকে এই আসনে বসানো চলবে না। তবে নানা কারণে অরবিন্দের নাম ডাক ছিল। এই জন্য কোনো সময়ে বঙ্গ-বিপ্লবকে (১৯০৫-০৮) বিপিন-অরবিন্দের যৌথ সৃষ্টি বলতেও অরাজী হই নি।"

অন্যত্র "আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৫ সনের আগস্ট হ'তে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতিকে তাতিয়ে তোলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনলে যুবক বাংলার জন্ম হত না। বিদ্যায়, দার্শনিকতায়, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে, বিপ্লব-যোগে, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল। তার সঙ্গে গলার আওয়াজ জোরালো ছিল বলে বিপিন পালের কীর্তি। একমাত্র গলাবাজী করে কেহ দেশমাতাকে জাগাতে পারে নি।"

অরবিন্দের অভিধায় বিপিনচন্দ্র সে যুগের "প্রধানতম রাজদ্রোহী" (arch-seditionist.)

সে যুগের গোয়েন্দা-বিভাগের নথিপত্রেও বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে অরবিন্দের উক্তির সমর্থন। তাদের মতে বিপিনচন্দ্রই "The chief of the itinerant demagogues," "who did more to inflame the minds of the masses against the government then any one else, অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ানোর দলের পালের গোদা হলেন বিপিন পাল। জনসাধারণের নিভন্ত বুকে সরকার-বিদ্বেষের জ্বলন্ত আগুন ছড়িয়ে দিতে তাঁর মতো মদতদারের আর জুড়ি নেই।

১৯০৫-এর শেষ দিক থেকে হাত বদল ঘটতে লাগল নেতৃত্বের। সেই সঙ্গে নীতিরও। রাজভক্তি বজায় রেখে রাজ-অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় কৃপাপ্রার্থীর করজোড়-ভঙ্গী আন্দোলনের দিন শেষ হতে চলল এবার। শুরু হতে চলল সরাসরি রাজদ্রোহের। আর 'বয়কটই' হল সেই বিদ্রোহের সবচেয়ে বলবান হাতিয়ার।

১৯০৬—০৭-এ এসে বয়কটের তাৎপর্য দাঁড়াল চারদফায়। ১, বিদেশী পণ্য বর্জন। ২, বিদেশী বিচারালয় বর্জন। ৩, বিদেশী স্কুল-কলেজ বর্জন। ৪, বিদেশী শাসন বর্জন।

১৯০৭-এর ৭ই আগস্ট তারিখে বয়কট আন্দোলনের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে অরবিন্দ বললেন,

"১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট বয়কট ঘোষণার দ্বারা এ কথাটাই বলা হয় যে, ভারতবাসী একটা পৃথক জাতি এবং ভারতবাসী তাদের এই পৃথকত্ব ও স্বাধীনতার আদর্শ বজায় রাখার সংকল্পই গ্রহণ করে। ...আমরা পুনঃপুনঃ বলেছি বয়কট দ্বারা আমরা ইংরেজকে বা অপর কাউকে ঘৃণা করছি না; আমরা শুধু আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক জাতীয়তা ঘোষণা করছি।"

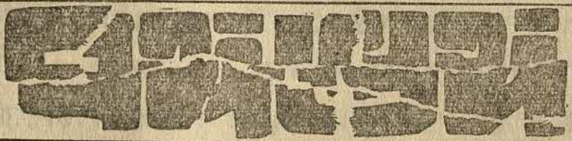
বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের কাগজ 'বন্দেমাতরম্' লিখলে, "ভারতে ইংরেজ শাসনাধীনে আমাদের আর্থিক দুর্দশা বৈদেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আমাদেরকে নিদারুণভাবে অসন্তুষ্ট

করে তুলেছে। তাই এক সঙ্ঘবদ্ধ ও নির্মম ব্রিটিশ পণ্যবর্জন নীতি গ্রহণ করে আমরা চাই ভবিষ্যতের মতো বৈদশিক সম্পদ শোষণকে অসম্ভব করে তুলতে। দ্বিতীয়ত যে অবস্থায় এদেশে শিক্ষাপ্রদান করা হয়, এর ইচ্ছাকৃত দৈন্য ও দারিদ্র্য-এর বিজাতীয় প্রকৃতি, মাতৃভূমির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের অনাদর, সরকারী স্বার্থের প্রতি আনুগত্য সঞ্চারের প্রচেষ্টা এতেও আমরা অসন্তুষ্ট। তাই সরকারী স্কুলে বা সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে আমরা আমাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠাতে অস্বীকার করি। তৃতীয়ত ইংরেজদের বিচার পদ্ধতিতে, এর সর্বনেশে আর্থিক অপচয়ে, এর পাশবিক কঠোরতায়, এর পক্ষপাতিত্ব দোষে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহারেও আমরা অসন্তুষ্ট। তাই আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদেশী বিচারালয়গুলি বর্জন করতে চাই। চতুর্থত আমরা বিদেশী শাসনযন্ত্র পরিচালনায়, এর যথেচ্ছচারিতায়, এর নির্মম নিষ্পেষণের কাজে পুলিসী শক্তির অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট ; তাই এ ক্ষেত্রেও আমরা সঙ্ঘবদ্ধ বর্জননীতি অবলম্বন করে যথেচ্ছচার শাসনযন্ত্রকে অকেজো করে দিতে চাই।”

বিনয় সরকারের ভাষায় “গোটা বাঙালী জাত ১৯০৫ সনে মাতাল হয়ে পড়েছিল সেই বিবেকানন্দ-বাঞ্ছিত ‘একরোখা-ক্ষেপামী’তে।”

বয়কট শুধু মাতাল করে নি। বয়কট যুগিয়েছিল মৃত-সঞ্জীবনীও।

॥ "রাঙা রাখীর দিন" ॥



প্রস্তাবক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাতির দুর্ভাগ্যের দিনকে স্মরণীয় করে তুলতে হবে বিশেষ উৎসবে। শোকের দিন হাহুতাশে কালো হবে কেন? প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পূর্ণ মিলনে হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত। ১৬ই অক্টোবর যেন ইতিহাসের পাতায় শুধু ব্যথা-ঝরার দিন হিসেবে চিহ্নিত না হয়। সেইদিন নতুন করে রচনা করতে হবে বিভক্ত দুই প্রদেশের মধ্যে মিলনের নতুন ঐক্য-গাথা, গাঁথতে হবে সখ্যতার নতুন মালা।

অক্টোবরের গোড়ার দিকে তাঁর প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায়, পত্রাকারে।

আশ্বিনের তিরিশে বাংলাদেশ বিভক্ত হবে সরকারীভাবে। কিন্তু সেটা যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় আমরা তা প্রমাণ করতে ভুলবো না। ঐ দিনটিকে আমরা উদ্‌যাপিত করবো রাখী-বন্ধনের ভিতর দিয়ে। যাতে ফুটে উঠবে বাঙালী জাতির অবিচ্ছিন্ন একতার বাণী। সে রাখীর রঙ হবে হলুদ। তার মন্ত্র হবে—'ভাই-ভাই এক ঠাঁই'। ঠিক যেমন আমরা পুণ্য বিজয়া তিথিতে যাই যে যার আপনজনের বাড়ী, বিনিময় করি আলিঙ্গন প্রণাম আশীর্বাদ, এখন থেকে প্রতি বছরের এই তিরিশে আশ্বিনও তেমনিভাবে পালন করতে হবে, বাংলাদেশের যেখানে যত মানুষ, সকলের হাতে রাখী বেঁধে। সে বাঁধা থেকে বাদ পড়বে না কেউ। বাঁধা পড়বে পূর্ব ও

পশ্চিম, বাঁধা পড়বে ধনী-দরিদ্র, বাঁধা পড়বে খ্রীশ্চান, হিন্দু মুসলমান সবাই, যারাই জন্ম নিয়েছে এদেশের মাটিতে। ধনীর হাতে রাখী পরাবে গরীব, গরীবের হাতে ধনী। প্রভুর হাতে রাখী পরাবে ভৃত্য, ভৃত্যের হাতে প্রভু। ঘুচে যাবে সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যের ভেদ-বিভেদ। এ-বছর তিরিশে আশ্বিন পড়ছে তৃতীয়ায়। আমরা এই দিনটিকে এখন থেকে নতুন নামকরণ করবো 'রাখী-তৃতীয়া'। ঐদিন সবাইকে অভ্যাস করতে হবে সংযম। আহার করতে হবে কেবল ফল-মূল ও দুধ। এই উৎসব বা ব্রত-পালন জগৎকে জানিয়ে দেবে, একতাবদ্ধ একটা জাতির নিবিড় ঐক্যকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, কোন শাসকের খড়্গেই নেই এত ধার।

তাঁর চিঠির এই মর্মকথা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া তুলল সারা দেশের মর্মে। পূর্ণ সমর্থন পেল কবির প্রস্তাব।

আর একটা প্রস্তাব উঠেছিল এর আগে, টাউন হলে ২২শে সেপ্টেম্বরের জনসভায়। স্থির হয়েছিল একটা সৌধ-নির্মাণের। যার নাম হবে ফেডারেশন-হল। যা হবে দ্বিখণ্ডিত দুই বাংলার অবিচ্ছেদ্য মিলনের প্রতীক, অন্তরঙ্গ মিলনকেন্দ্র। তার জন্যে জমিও সংগৃহীত হয়েছিল ২৯৪, আপার সার্কুলার রোড। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে ঐ ৩০শে আশ্বিনেই, বিকেল চারটেয়।

আরও ছিল একটা প্রস্তাব। আগের দুটি মিলন-সূচক প্রস্তাব। এটি ক্ষোভসূচক। এ-প্রস্তাবের রচয়িতা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। "তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অর্ধাঙ্গভাগিনী স্ত্রীজাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে রাখিয়া পুরুষজাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির জন্য অপূর্ব ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন।" রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ব্রতকথার ভূমিকায় লিখলেন—"বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে

জেমো-কান্দি গ্রামের অর্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের উঠোনে সমবেত হইয়াছিল; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।

ব্রতকথা

১৩১২ সাল। আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দিন। সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙালী দুভাগ হবে, দুভাগ দেশে বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ-কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, বিদেশী রাজা আমাদের সুখ-দুঃখ বোঝেন না। তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে চাইলেন, আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মতো হব।

ব্রতের অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন। দেশসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষ্যে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরিতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা শেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বামহস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপর

পাটালী প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষত বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন, এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।”

অবশেষে একদিন ৩০শে আশ্বিনের পূর্বাকাশে ঘটল রক্তাভ সূর্যোদয়। ভোর থেকেই শুরু হল প্রাণের উৎসাহে ভরপুর উৎসব। কলকাতার মানুষ ভোরে উঠে ছুটল গঙ্গাস্নানে। মফস্বলের মানুষ নদী বা পুকুরে। সকলেই নগ্নপদ। তারপর শুরু হল হাতে হাতে রাখী বাঁধা। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞার মন্ত্রপাঠ। কোন শাসনেই বাঙালীকে বিভক্ত করা যাবে না।

সকাল থেকেই দোকান পাট বন্ধ। সব বাড়ীতেই অরন্ধন। সকলেই উপবাসের জন্যে প্রস্তুত। যাঁরা অপারগ, তাঁরাই কেবল ফলমূল খেয়ে থাকবে।

ঘরে ঘরে শুরু হল ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ পাঠ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সে এক অনবদ্য রচনা। সহজ, সরল অনাড়ম্বর ভাষা। কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে দেশের মাটির গন্ধ, দেশের আকাশের আলো, দেশের মানুষের সুদৃঢ় চেতনা। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বেলে মা-বাবা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা সবাই মিলে একসঙ্গে বসেছে গোল হয়ে। নতুন যুগের যজ্ঞ যেন। পড়ছে একজন। শুনছে সবাই। শুনতে শুনতে নিমিষে যেন রক্তের মধ্যে গিয়ে স্পন্দন জাগছে স্বদেশীয়ানার অভিনব মন্ত্রধ্বনি।

“বন্দেমাতরম্। বাংলা নামে দেশ। তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন: প্রবেশ করে মা শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে শত মুখে অধিষ্ঠান করলেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের

ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।”

তারপরেই এল দুর্যোগ। বাঙলাকে গ্রাস করল বিদেশী সওদাগর, দিল্লীর বাদশার মন যুগিয়ে, মন গলিয়ে, সাত-সমুদ্র পার হয়ে এসে।

“বাঙলার ধন দেখে ধান দেখে তাদের লোভ হল। লক্ষ্মী তখন আলমগীরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাংলার দেওয়ান করে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করে তারাই হল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হয়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হল, কিন্তু রাজ্যে বাস করল না, বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারের আপন দেশে চলল। সদাগেরর জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত্ত। তারা চোর ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার নিজের দেশ থেকে খেলনা এনে, পুতুল এনে প্রজার মন ভোলাতে লাগল। …ইংরেজ রাজার এক ছোকরা নায়েব ছিল। সে আপন দেশে ছিল কেরানী; হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগীর বাদশার তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগীরের নাতি ঠাওরাত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যানঘ্যান করছে, যাক্ এদের দু’দল করে দিচ্ছি, একদিকে থাক মোছলমান একদিকে থাক হিন্দু। —এই বলে তিনি বাঙালীকে দু’দল করে দিলেন।”

এরপর এল মহাদুর্দিন। ষড়যন্ত্রের কথা শুনে কেঁপে উঠল সারা বাংলা, লক্ষ্মীর পায়ে আছড়ে পড়ল সারা দেশ। প্রতিজ্ঞা করলে—আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হব না। আমরা এক।

আমরা এক আকাশের নীচে, এক ধানের ক্ষেতে, এক নদীর জলে, এক গাছের ছায়ায় বুকে বুক মিলিয়ে বাস করবো চিরদিন।

"তিরিশে আশ্বিন। কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হল। বাঙলার হাটে মাঠে ঘাটে জুড়ে বসলেন। —বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বলল না। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হলুদ সুতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।"

এইখানেই ব্রতের শেষ নয়। এরপর আছে শপথ বাণী। ব্রতকথার সঙ্গে মিলিয়ে সারা দেশ এক কণ্ঠে পাঠ করল সেই শপথ।

"মা লক্ষ্মী কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্নভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাবো। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

মেয়েরা মনের দিক থেকে, পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল তখন সত্যিই। সরলা দেবীর কাগজ 'ভারতী'। তাতে পাতায় পাতায় নতুন যুগের মর্মর, নতুন জাগরণের মর্মবাণী। সেই 'ভারতী'তে বঙ্গবিভাগের মাসে অর্থাৎ আশ্বিনে ছাপা হয়ে বেরুল এক 'অভয়বাণী'। লেখিকা ছদ্মবেশে 'কোন ব্রতধারিণী'। সে লেখায় যেন রামেন্দ্রসুন্দরের আবেদনের সর্বাত্মক সমর্থন। দ্বিধাহীনা সংগ্রামী নারীর উক্তি।

"হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নির্ভর হও, আমরা তোমাদিগের উৎসাহে বাধা দিব না ; তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। যিনি তোমাদিগের জননী, তিনি আমাদিগেরও জননী ; মাতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমরা যে সংকল্প ধারণ করিয়াছ তাহা আমরাও ধারণ করিলাম। তাঁহার সেবার জন্য তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমরাও গ্রহণ করিলাম। বঙ্গরমণী কবে কোন কঠোর ব্রত পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে ?··· তবে তোমরা কি জন্য মনে করিতেছ এ ব্রত পালনে আমরা অসমর্থ হইব ? বিলাত চুড়ি ফেলিয়া দিয়া আমরা যদি দেশের শাঁখা রুলি পরি, বিলাতী সাবান, বিলাতী সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা দেশী সাবান ও চিরপ্রচলিত আতর গোলাপ ব্যবহার করি, যদি ফিতায় চুল না বাঁধিয়া আগের মতো চুলের দড়ি ও জরী দিয়া চুল বাঁধি, যদি জ্যাকেটে বিলাতী লেশ না দিয়া দেশী চিকন লাগাইয়া পরি, সূক্ষ্ম বিলাতী মসলিন ও পায়নাপল প্রভৃতির বদলে দেশের চেলী বারাণসীতেই সুসজ্জিত হই, আর বিলাতী সুলভ শাড়ীর বদলে, সামান্য বেশী দরের (দেশী) শাড়ীই ব্যবহার করি, তাহা কি ত্যাগস্বীকার ? না কষ্টনাম বাক্য ? অবশ্য গরীব লোকের পক্ষে সুলভ বিলাতী বস্ত্রের বদলে সামান্য চড়াদরের দেশী বস্ত্র কেনাও কষ্টকর। কিন্তু আজ ধনী মধ্যবিত্তের এক উদ্দেশ্য ; এক ব্রত। ···আশ্বিনে মা আসিতেছেন, এসময়ে নতুন বস্ত্র পরিধান আমাদের চিরন্তন প্রথা, কিন্তু তোমরা যদি দেশী বস্ত্র যোগাইতে না পার তাহা হইলে এসময়েও আমরা নতুন বস্ত্র পরিব না। আমাদের বংশানুক্রমে রক্ষিত পুরাতন চেলী বারাণসী পরিয়া, এমন কি অভাব পক্ষে আমরা পুরাতন ধৌত বস্ত্র পরিয়াই দেবীকে প্রণাম করিব, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিব, তথাপি এ সময়েও আমরা বিলাতী বস্ত্র পরিব না।···"

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'রাখীবন্ধন'কে অভ্যর্থনা জানিয়ে কবিতা বেরুল ঐ ভারতীতেই। লেখিকা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিলাপ-বিলুপ্ত কণ্ঠস্বর। নতুন মহাভারতের নতুন দ্রৌপদীর সাড়া জেগে উঠলো কবিতার ছন্দোবন্ধে।

॥ বঙ্গনারীর রাখীবন্ধন ॥

অনুপমা আর্যবামা করহ স্মরণ!
কর মনে দ্রৌপদ্রীর বেণীবাঁধাপণ!
কঠিন পণের গুণে
সাবিত্রী শমন জিনে
কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন,
ব্রতশীলা আর্যবালা আছিল যেমন!
... ...
সুপবিত্র স্নেহসূত্র রাখীর বন্ধন
ভোল হিন্দু মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্র মূলে বিরাট জীবন
কর মনে দ্রোপদীর বেণীবাঁধা পণ!

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সেদিনের উৎসবের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর বিবরণে প্রাণের আবেগে আলোড়িত ৩০শে আশ্বিনের সেই সকালবেলার সমারোহ ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে।

"রবিকাকা একদিন বললেন, রাখী-বন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র-অনুষ্ঠান সব যোগাড় করতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায় ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনবাবুও ছিলেন না, কিছু একটা হলেই মন্ত্র বাতলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথকঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ী; কালো মোটাসোটা তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো চেহারা। তাঁকে গিয়ে ধরলুম রাখী-বন্ধন উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাতলে দিতে হবে। তিনি খুব খুশী ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি

পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখী-বন্ধন পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাবে। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব—রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়ায় নয়। কি বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভাল লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছুই শুনবেন না। কি আর করি—হেঁটে যেতেই হবে, চাকরকে বললুম, সে সব কাপড়জামা নিয়ে চলল সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে; মনিব চাকর একসঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন এক শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান

এই গানটি সে সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকেই লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্যে আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী। সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম, অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলে মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকরা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান,

মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিস-গুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল, চীৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই-না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছানো, আমি সট্ করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।… আমরা সব বসে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী, কী হল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম, হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে—ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্ বাঁচা গেল।"

মতিলাল রায়ের 'স্বদেশী-যুগের-স্মৃতি'-তেও একই ঘটনার ঘনঘটা। সেই কলকাতা। সেই উত্তাল জনসমুদ্র। সেই স্বপ্নভাঙা নির্ঝরের প্লাবন।

"১৬ই অক্টোবর, কলিকাতার রাজপথে উষা-সংকীর্তন বাহির হইল। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীর ভিড় দেখিয়া ইহা যে যুগের হাওয়া তাহাতে কারও মনে সংশয় রহিল না। বাংলায় এমন নগর, গ্রাম, জনপদ ছিল না যেখানে "রাখী-বন্ধনের উৎসবে"র কোলাহল উঠে নাই, এমন তরুণ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে সেদিন দেশের কাজে উদাসীন ছিল—পল্লীপথ মুখরিত করিয়া দেশের জয়

দিতে দিতে যখন খোল করতাল সহযোগে আমাদের শোভাযাত্রা চলিতেছে, সেদিন এক কিশোর বালককে দ্রুত পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখি—তাহার চক্ষের কি দীপ্তি, অধরে প্রফুল্ল হাসি! এক মুঠা গাঁদা ফুল অতি উৎসাহের সহিত আমাদের মাথার উপর ছুঁড়িয়া সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'বন্দে মাতরম্'। এই বালক কানাইলালই স্বদেশ-যজ্ঞের মহাবলি-রূপে পরে জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত কুলললনাদের বাতায়ন পথে সোৎসুক দৃষ্টি, তাঁহাদের সস্নেহ নীরব সম্বর্ধনা অন্তঃপুর পর্যন্ত জাগরণের স্বপ্নে দেশের প্রাণ যে মাতিয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের উলুধ্বনির সাথে শঙ্খনিনাদে ঘোষণা করিয়াছিল। আর একটি পবিত্র চিত্র স্মৃতির মধ্যে বড় জাগরূক হইয়া আছে—কোন এক সম্ভ্রান্ত গৃহের চিন্তাশীল প্রবীণ, যাঁহাকে সর্বদাই আমরা স্থির, গম্ভীর মূর্তিতে সকল ব্যাপারে উদাসীন দেখিতাম, সাহস করিয়া কথা কহিতে ভরসা হইত না, তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে "রাখী উৎসবের শোভাযাত্রা যাওয়া মাত্র, পল্লীপথে সংকীর্তনের সম্মুখে ভক্তের মতো তাঁহাকে এক অঞ্জলি প্রস্ফুটিত শেফালিকা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আমাদের গতি স্তম্ভিত হইল। দেশের বন্দনা দুইবার পুনরাবৃত্তি করিয়া গাওয়া হইল। তারপর বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুষ্পাঞ্জলি আমাদের মাথার উপর আশীর্বাদের মতো ছড়াইয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার ভাগ্য যাহার হয় নাই, সে বুঝিবে না—দেশের প্রাণ সেদিন কত গভীরে, কোন্ গোপন সুরে গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল।"

এই 'রাখী-বন্ধন' উৎসবের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন মৌলবী লিয়াকত হোসেন। স্যার বামফীল্ড ফুলারের মিষ্টি ছলনায় সেদিন কিছু মুসলমান নিশ্চয়ই ভুলেছিল। ফুলারের মিছরীর ছুরিকে তাঁরা ভুল করেছিলেন চিনতে। ফুলার কথিত সুয়োরানীর

বংশধর হয়ে তাঁরা রাজসুখে শুয়ে-ঘুমিয়ে দিন কাটাবার লোভেই সম্ভবত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে সেদিনের দেশব্যাপী আন্দোলনের অংশীদার হতে এগিয়ে আসে নি। কিন্তু মৌলবী লিয়াকত হোসেন এই রাজভক্ত দলের মুসলমান নন। তিনি খাঁটি বাঙালী। "এই আত্মত্যাগী দারিদ্র্যব্রতী স্বদেশসেবক প্রতি বছর ৩০শে আশ্বিন ছাত্র ও যুবকদের লইয়া মহাসমারোহে রাখী-বন্ধন উৎসব করিতেন ও "বন্দে মাতরম্" গান গাহিতেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হবার পরও বহু বৎসর তিনি এই জাতীয় উৎসব রক্ষা করিয়াছিলেন।"

সকাল কাটল উত্তাল সমারোহে। এল বিকেল। এবার ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন। পঞ্চাশ হাজার মানুষ এসে সমবেত হয়েছে সার্কুলার রোডের মাঠে, এখন যেখানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি আনন্দমোহন বসু। তিনি তখন অসুস্থ, চলৎশক্তিহীন, অথর্ব। তবু তাঁকেই চাই দেশের। আর তাঁরও চাই দেশকে। মৃত্যুশয্যা ছেড়ে তিনি উঠে এলেন জাগ্রত দেশবাসীর জীয়ন্ত স্বপ্নকে মূর্তিদানের উৎসবে যোগ দিতে। কিন্তু পায়ে হেঁটে নয়, স্ট্রেচারে চেপে। সঙ্গে চিকিৎসকের দল।

ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের পর সম্মিলিত কণ্ঠে পাঠ করা হল শপথ বাণী।

গবর্নমেন্ট যেমন দেশব্যাপী মানুষের প্রতিবাদকে তুচ্ছ করে বঙ্গবিভাগ কার্যকরী করতে উদ্যত হয়েছেন, আমরাও তেমনি প্রতিজ্ঞা করছি, দেশের মানুষ হিসাবে, আমরা আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো এই বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে, এবং জাতীয় একতাকে সুদৃঢ় করার পক্ষে। ঈশ্বর আমাদের সহায়।

সভাশেষে এই শপথবাণীর বাংলা-অনুবাদ পাঠ করে শোনালেন রবীন্দ্রনাথ।

সভাপতির ভাষণে আনন্দমোহন বললেন, তিনি মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে এসে এখানে একটি জাতির নবজন্ম দেখতে পেয়েছেন।

"সেকালে কোন দেবানুগ্রহে-ধন্য ঋষি বলিয়াছিলেন, তিনি যে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণেরও যোগ্য নহি। কিন্তু আমি যে এই নূতন জাতীয় আবির্ভাব দেখিলাম, ইহাতে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি···সরকারী বিচ্ছেদ আজ আমাদিগকে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের একতা অনেক বেশী বলিষ্ঠ আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, উত্তর পূর্ব, পশ্চিম সকলেই আমরা এক অবিভাজ্য দেশের অধিবাসী, যার তলদেশে গর্জমান সমুদ্র। বন্ধুগণ, আর একবার অন্তর হইতে সকলে উচ্চারণ করুণ, বাংলা অবিভাজ্য, এই চিরপ্রিয় মাতৃভূমি আমাদের সকলের। ধর্মমত বিষয়ে আমাদের মধ্যে যতই প্রভেদ-বিভেদ থাকুক মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য পালনের যে ধর্ম, তাহাই ক্রমশ হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের, ভায়ের সহিত ভায়ের মিলনে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে।"

আনন্দমোহন নিজের কণ্ঠে এই ভাষণ পড়ে শোনাতে পারেন নি। তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। স্বদেশের জন্যে, স্বদেশের মানুষের উদ্দেশ্যে এই তাঁর শেষ সভা-ভাষণ। সুরেন্দ্রনাথ তাই তাঁর এই বক্তৃতাকে অভিহিত করেছিলেন শেষ-সঙ্গীত বা 'swan song' বলে।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের ইংরাজী ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করে শোনালেন।

সভা শেষ হল। এবার শোভাযাত্রা। পুরোভাগে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ নেতারা। প্রত্যেকেরই খালি পা। শোভাযাত্রা চলল বাগবাজারের দিকে। দু-মাইল হেঁটে পশুপতি বসুর বাড়ী। বাড়ীর সংলগ্ন বিশাল প্রাঙ্গণ। সেখানে আর এক জনসভা বসল। বক্তা রবীন্দ্রনাথ। সেদিন 'জাতীয় ভাণ্ডারের জন্যে অর্থদানের আহ্বান জানান হল সভাক্ষেত্র থেকে। থলির মধ্যে টাকা এসে

পড়তে লাগল ঝনঝনাৎ। কুড়িয়ে কুড়িয়ে কোঁচড় উঠল ছাপিয়ে। শেষ পর্যন্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াল ৭০ হাজার টাকা। সে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার দিন। শুধু কলকাতায় নয়। সারা দেশে। গ্রামে-গ্রামান্তরে, দেশের প্রান্তসীমায়।

দার্জিলিং। টাউন হলের চারপাশে একটু একটু ভিড় জমতে শুরু করল। তারপর উঠল হল ছাপিয়ে। সবাই মুখে মেখে এসেছে বিষণ্ণ ব্যথার ছাপ। সবাই বুকে ভরে এনেছে প্রতিবাদ।

সভার বক্তা দুজন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর নিবেদিতা।

নিবেদিতা ভাষণ দিতে উঠে বুকে চাপড় মারতে মারতে বললেন—"ধিক্ আমার জন্মভূমিকে! বাংলার বুকে এই যে ভেদের প্রাচীর তুলে সে দেশকে অপমান করেছে, ভারতবাসীর শৌর্য, আর আত্মত্যাগ যতদিন তাকে তা তুলে নিতে বাধ্য না করে, আমরা চালিয়ে যাবই এ-সংগ্রাম!"

সভা শেষ হলে সমবেত জনতা একযোগে উঁচিয়ে ধরল তাদের ডান হাত। হাতের অরণ্যে যেই মুহূর্তে ফুটে উঠল অজস্র হলুদ ফুলের শোভা। না ফুল নয়, রাখী। প্রত্যেকের মণিবন্ধে একে অন্যকে পরিয়েছে অক্ষয় ভ্রাতৃত্ব, অবিনাশী ঐক্যের রাখী।

"নিবেদিতা এর পরে ফি-বছর এই তিথিটি পালন করতেন। বন্ধুরা তাঁর বাড়ীতে একত্র হতেন, তিনি ফল আর পাঁচ মিশেলী স্যালাড খাওয়াতেন সবাইকে।"

পরের বছরও এই উৎসবের গতি অব্যাহত। সমান সমারোহ। সমপরিমাণ উৎসাহ, উত্তেজনা। যদিও এই এক বছরে নেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মতবিরোধ, শুরু হয়েছে দলাদলি। তবুও রাখী-বন্ধনে ফাঁকি নেই। স্বদেশী যুগের "স্মৃতি" অনুযায়ী—

সে বছরেও "কলিকাতার রাজপথে পথিকদের পাদুকা-মোচন করার ধুম পড়েছিল। সকলেই স্বেচ্ছাসেবকদিগের কাতর মিনতি পালন করিত তাহা নহে; দোলের উৎসবে ফাগুয়া লইয়া যেমন

হাতাহাতি হইয়া যায়, "রাখী-বন্ধনের উৎসবেও" তেমনি পাদুকা মোচন করার প্রস্তাব শুনিয়া অনেক চটিয়া যাইতেন—তর্কাতর্কির পর পুলিস ডাকাডাকিও বাদ পড়িত না।"

ভগ্ন দেশ। তারই প্রতিবাদে নগ্নপদের অভিযান। সুতরাং বিপদ তাঁদের নিয়ে যাঁরা পাদুকাহীন শ্রীপদযুগলের শোভহীনতাকে মনে করেন না শোভনীয়। অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের মধ্যেও এরকম বিচ্ছিন্ন বিরোধের কিছু ঘটনা ঘটবেই, ঘটতোও।

"এই জাতীয় উৎসব বাঙালী মাত্রেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। এই সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা দ্বারে দ্বারে মঙ্গলকলস কদলী-তরু, শাখা-পল্লবের মালা স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। বাংলার নয়নমণি কানাইলাল তখন আমাদের সঙ্গে সকল কর্মেই যোগ দিত সেও ইহার অন্যথা করে নাই। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ইহা ব্রাহ্ম ধর্মবিরোধী বলিয়াই হউক অথবা এইরূপ আড়ম্বর তাঁহার চক্ষে নিতান্ত অশোভন বলিয়া বোধ হওয়ায়, পাদুকা প্রহারে সব কিছু দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের এই দিনের ব্যথিত স্মৃতি স্পষ্ট হইয়াই আছে। কেন না কানাইলাল অভিভাবকদের একান্ত বাধ্য ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠদের সহিত কোন দিন সে বিরোধ করে নাই। স্বদেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া সে শেষে উন্মাদ হইয়াছিল··· এই ঘটনায় তাহার সেদিনের সেই বিষণ্নমূর্তি, ক্ষোভ-দুঃখ অভিমান-মিশ্রিত চক্ষের অজস্র অশ্রু আমাদেরও অন্তঃকরণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা যখন নিরুপায় হইয়া ইতিকর্তব্য বিমূঢ়, তখন তাহার মাতুল পরলোকগত নন্দকুমার দত্ত মহাশয় পথ হইতে ঘট ও পল্লবমালা কুড়াইয়া বাড়ীর স্বতন্ত্র দরজায় স্থাপন করিয়া আমাদের সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ইঁহার মুখে ভাষা ছিল না; কিন্তু অন্তরে অকৃত্রিম দেশানুরাগের পরিচয় বহুবার পাইয়াছি। তাঁর আশ্রয়েই কানাইলাল লালিত-পালিত, বর্ধিত, তাঁর স্নেহময় ক্রোড়েই কানাইলালের শিক্ষা ও নবজীবনের আরম্ভ। তাঁর অঙ্গনে

সে সময়ে প্রতিদিন অপরাহ্নে শত শত তরুণ গিয়া লাঠি খেলিত, ব্যায়াম চর্চা করিত, স্বদেশযজ্ঞের অগ্নি রক্ষা করিত। স্বদেশী যুগের স্মৃতির সহিত নন্দবাবুর জীবনও জড়িত ছিল; ফল্গুধারার পরিচয় দেশ রাখে নাই। কিন্তু এইখানেই যুগের সত্য ইতিহাস লুকাইয়া থাকে।"

নোয়াখালীর পত্রিকা 'সুহৃদ'। সম্পাদক যিনি তাঁর বাড়ি বরিশালে। রাখী-বন্ধনের দিনে তিনি মাংস রেঁধে ইয়ার-বন্ধুদের ডেকে আমোদ-আহারে মাতোয়ারা। তারপর একদিন এল বাড়িতে শ্যামাপূজা। প্রতিমা সজ্জিত। ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজছে। প্রসাদ ভোগ সব তৈরী। ধূপের গন্ধে, ধুনোর ধোঁয়ায় পূজামণ্ডপ আমোদিত। কিন্তু একি! বেলা বয়ে যায়, লগ্ন শেষ হতে চলল, পুরোহিতের পাত্তা নেই কেন? পুরোহিত আসবে না। আসবে না? তাহলে একে ছেড়ে ওকে ডাক। কেউই আসবে না। কেন? রাখী-বন্ধনের দিনের কথা এখন বুঝি আর মনে পড়ছে না। উপবাস অরন্ধন, নিরামিষ ভক্ষণের দিনে সেদিনের সেই উদ্ধত অসহযোগ, মাংসাহারে মহাভোজ। সেই প্রতিক্রিয়ার এই প্রতিশোধ।

প্রতিক্রিয়াশীলের চক্রান্ত, বিদ্বেষ, বিরোধ আছে বলেই প্রতিবাদ প্রতিরোধ বলবান হয়ে ওঠার উদ্যম খুঁজে পায়। রাখী-বন্ধনের দিনে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল ময়মনসিংহে। শোভাযাত্রীরা মুসলমান। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রজা তারা। কিন্তু সেদিন নবাবের নির্দেশ ছিল ভিন্ন। তাঁর প্রচারিত ইস্তাহার চেয়েছিল এই উৎসবের অকাল মৃত্যু। ইস্তাহারে লেখা ছিল—

"অদ্য মধ্যাহ্নে শহরে ভিন্ন ভিন্ন মহল্লার সর্দারগণ সদলবলে উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়িবে। বঙ্গভঙ্গ বিধি প্রবর্তন করার জন্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে। বাঙালী ভোজন হইবে। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইবে। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইবে।"

নবাবী, ফলল না। শোভাযাত্রা বেরুল। পুলিসসাহেব মিঃ বডিস এলেন হিন্দু নেতাদের সামনে নালিশ নিয়ে। হ্যাঁ, মশায় এই যে শোভাযাত্রা বেরুচ্ছে, এর ফলে যদি একটা দাঙ্গা বাধে কে সামলাবে? কে দায়ী হবে তার শর্তে সই দিন। হিন্দু নেতারা পুলিস সাহেবকে পাল্টা প্রশ্ন করলে। মুসলমানদের কাছে এমনি শর্তে সই চাওয়া হয়েছে? পুলিস সাহেবের উত্তর—"I would stand guarantee for the Mussulmans." নেতারা হয়তো সেদিন ভ্রূকুটি করে হেসেছিলেন--মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ দেখে।

চার বছর পরের কথা। ১৩১৬ সাল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও কর্মের আরও বৃহত্তর জগতে ব্যাপ্ত। 'গোরা' উপন্যাস শেষ হবার মুখে। গীতাঞ্জলির শুরু। নানা জায়গায় জীবন কাটে। আজ কলকাতায়। কাল সিমলায়। পরশু শিলাইদহে। চতুর্দিকে নানা মানুষের আনাগোনা। নানা সভা-সমিতির ডাক।

১০৯৬-এ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন জাপানে, আমেরিকায়। কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে, ফিরে এসেছেন। তাকে নিয়ে চললেন শিলাইদহে। সেখানেই হবে তার কর্মক্ষেত্র। গ্রাম না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। গ্রামকে বাঁচাতে পারে কৃষি-উন্নয়ন। শিলাইদহে শুরু হল তারই আয়োজন। সেখানেও নানা বিঘ্ন, নানা জটিলতা। কিন্তুএসবের মধ্যেও তিনি ভোলেন নি রাখী-বন্ধনের দিনটিকে। লিখেছেন নতুন গান, 'প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত' পাঠিয়েদিয়েছে অজিত চক্রবর্তীর কাছে। সেই সঙ্গে একটি পত্র, "ছুটি পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তাহলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড়ো দিক থেকে সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোন সংকীর্ণ বিরোধের ভাব ও তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না, আমার রাখীবন্ধনের মধ্যে কোন সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না।

…আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব—এইটে আমাদের একটা দায়—বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।"

১৯১১ সালে ছেঁড়া কাপড়ে তালি পড়ল। কাটা ঘায়ে স্টিচের সুতো। ভাঙা বাঙলায় লাগল জোড়া। জোড়াতালির আনন্দে দেশ জুড়ে করতালি। নেতাদের মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি। ইংরেজ শাসককে নতশির করিয়ে তবে তো ছেড়েছে! আবার অনেক নেতার মন বললে, তবে বলিহারী ইংরেজ জাতকে। যাই বল, জাতটার মহিমা আছে। ন্যায়-নীতি মানে। তা না হলে নিজের হাতে গড়া আইন নিজেরা ভাঙে? ভাঙা বাঙলাকে আবার জুড়ে দেয় প্রাণে প্রাণে?

ইংরেজ-মহিমায় বিগলিত কিছু কিছু নেতার মনে এই সময়ে আরও একটা প্রশ্ন দেখা দিল। বাংলা যখন গোটাই হয়ে গেল, তাহলে কেন আর 'রাখী বন্ধন উৎসব' বছর বছর পালন করা? প্রয়োজনটা কি?

অন্যমতের নেতাদের সংগে তাই নিয়ে শুরু হল তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ। তাঁরা বললেন 'রাখী বন্ধন' উৎসবটা একটা নিছক সাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচী নয়। নয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। এটা জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার একটা চিরস্থায়ী সাধনা।

'সঞ্জীবনী' 'রাখী বন্ধন'-এর বিপক্ষে।

সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, লিয়াকত হোসেন প্রভৃতি নেতারা পক্ষে। নেতাদের মধ্যে নানা মুনি-নানা মত। তাই দেখে কোন কোন পাঁজী থেকে 'রাখী বন্ধনে'র উল্লেখ উধাও হল।

নেতায় নেতায়, নরম দলে, গরম দলে, মতবিরোধ ক্রমশ বেশ জমজমাট জোরালো হতে শুরু করল। এই সময়ে রাখী বন্ধনের

অব্যাহত রাখার সমর্থনে যে সব লেখা-জোখা, কবিতা গান ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি খুবই উল্লেখ যোগ্য।

'নব্যভারতে' দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ· '৩০শে আশ্বিন'। "আমরা জানি, শুধু পার্টিশন রাখী বন্ধনের কারণ নয়। বয়কটও তাহার অভিব্যক্তি নয়। শুধু পার্টিশন তাহার কারণ হইলে নব-পার্টিশনে তাহা গেল কেন? কোন পার্টিশন ভাল—এ স্থান সে বিচারের জন্যে নয়। পার্টিশন তখনও ছিল, এখনও আছে, আরো মূর্তিমান হইয়া আসিয়াছে। বাঙলা ভাষাভাষী তখনও বিভক্ত, এখনও বিভক্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী পাইয়াছি, কিন্তু দিয়াছি কি? আসাম, উৎকল, বেহার, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর।...... শুধু পার্টিশনই, যদি রাখী-বন্ধনের কারণ হইত তবে তাহা এমন করিয়া যাইত না।"

'নব্যভারতে' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'অরন্ধন ও রাখীবন্ধন', "...এরা বলে আমরাই ঐ শিশুর বাপ, ওরা বলে, যেই মা-বাপ হউক, ওটি আমাদের কলমের চারা। যতক্ষণ জিনিসটা ছিল, ততক্ষণ উভয় দলের যে কলহ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র জ্বালা দেশের লোক এখনো সহ্য করিতেছে, আর মাঝখান হইতে কেমন সহজে এ জাতীয়-জীবনের চিত্রপট হইতে ঐ মূল্যবান বস্তুটি—ঐ সাতরাজার ধন মাণিক চুরি হইয়া গেল, কেহই দেখিল না......

...তোমরা স্বদেশীর আসর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও বাঙালীর ঘরে এখনও এমন নিষ্ঠাবান লোক অনেক আছেন, যাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন বিদেশী ব্যবহার করেন না। সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে তোমরা পতিত।"

'প্রবাসী'র পাতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'রাখী-বিসর্জন' গান। সত্য-ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে কবির রুদ্ধ অভিমান। গানটি লেখা বাউল সুরে।

রাখী! তোরে রাঙিয়েছিলাম
প্রাণের রাঙা রঙ দিয়ে!
(ওরে) বানিয়েছিলাম অখণ্ড ডোর
(গহন) আঁধার-রাতি বঞ্চিয়ে!
ভাঙা আমার চরকাটিরে
জুড়ে তুলেছিলাম ফিরে,
বন্ধ করে আঁখির ধারা
(ও সেই) অভয় শরণ নাম নিয়ে।
রাঙা ব্যথা! ভয়ে ভয়ে
বেঁধেছিলাম তায় তায়!
(তাই) উঠ্‌ল সুরে—জুড়ল দু'মুখ
(এ মোর) প্রাণের পুঁজি সঞ্চিয়ে।
ফুরিয়েছে কাজ এখন তোমার—
বিসর্জনের নেই দেরী আর,
(তবু) আমন্ত্রণের বরণডালাই
(সাজাই) মনের ভুলে—মন দিয়ে!

এত আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণেও রাখী রইল না। রাখা গেল না। রাখীর চেয়ে আরও রাঙা কিছু চাই, এই তখনকার জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি। রাখী রক্ত হতে পারল না। তবু ইতিহাসের এক নতুন ভোরবেলায় মানুষে মানুষে যে মিলনের উৎসব জেগে উঠেছিল, তারই স্মৃতির মধ্যে রাখী রেখে গেল তার অমরতা।

॥ মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ॥



স্বদেশী আন্দোলন বয়কট-আন্দোলনেরই উল্টো পিঠ। বয়কট হল ব্রিটিশ-বর্জন। স্বদেশী হল জাতীয়-সৃজন। বয়কট ভাঙবে, স্বদেশী গড়বে। বয়কটের চাপ বিদেশীর ঘাড়ে। স্বদেশীর চাপ নিজেদের ঘরে।

বয়কট বলছে—বর্জন করো বিদেশী দ্রব্য। বিশেষ করে ছুঁয়ো না ওদের ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়। সারা ভারতবর্ষে বাংলাতেই ওদের সেরা বাজার। হাতছাড়া হবার দশা দেখা দিলে ওদেরও হবে ধাতছাড়া হবার দশা। স্বদেশী বলছে 'মায়ের দেওয়া কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'। সে কাপড় নিজের তাঁতে বোনো। গড়ো কল কারখানা। ঘোচাও পর-নির্ভরতার নিষ্ক্রিয়তা। ভুলতে হবে বিলাস। তবেই বিকাশ হবে জাতির নিজের শক্তি, শক্ত হবে বুকের পাটা, পিঠের মেরুদণ্ড, হাতের কব্জি। তবেই ভাঙবে হাতের শিকল, পায়ে বেড়ী।

বয়কট আর স্বদেশী এই দুই আন্দোলন যেন একই করাতের দুদিকের ধার। একটায় কাটছে বিজাতীয় শোষণের ভার আর একটায় কাটছে জাতীয় স্থাণুত্বের ঘোর।

'স্বদেশী' মন্ত্রের প্রথম উচ্চারণ, প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় রবীন্দ্র-নাথের কণ্ঠে। চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ডাকা হয়েছিল সভা। ১৯০৪-এর জুলাইয়ে। সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। সে সভায় এত প্রবল জনসমাগম হয় যে, জনতা দরজা ভেঙে

ফেলার চেষ্টা করে। ঘোড়সওয়ার পুলিস এসেও হিমসিম খায় সেই ভিড়ের চাপ সামলাতে। সেদিনের সেই আগ্রহী জনতার মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী উল্লাসকর। পুলিস সার্জেন্টের সঙ্গে তাঁর মারামারি বাধে। সেদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ পঠিত প্রবন্ধের নাম ছিল 'স্বদেশী সমাজ'। ক্রমে এই স্বদেশী শব্দই রূপ নিতে লাগল এক বৈপ্লাবিক অর্থময়তায়। লক্ষ কণ্ঠের উচ্চারণে, লক্ষ হৃদয়ের চেতনার উন্মেষে, যা ছিল ইস্পাতের পাত, তাই-ই একদিন হয়ে উঠল ক্ষুরধার অস্ত্র।

বিনয় সরকারি ভাষায় "যুবক বাংলা রবির মুখে স্বদেশী সমাজ (১৯০৪) শুনে নয়া দুনিয়ার সন্ধান পেয়েছিল। গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম সূত্রপাত এই বক্তৃতায়।"

সখারাম গণেশ দেউস্কর একজন প্রবাসী মারাঠী। বাংলায় থেকে বাঙালী বনে গেছেন। বাংলা ভাষাতেই তিনি এক বই লিখলেন। নাম 'দেশের কথা'। বক্তব্য ইংরেজের বাণিজ্য কি ভাবে প্রতি-নিয়ত শোষণ করছে দেশকে, ধ্বংস করছে দেশের বাণিজ্য, শঠতার অস্ত্রে জয় করছে রাজ্য। সব বক্তব্যই ইতিহাসের, তথ্যের, তালিকার নজীর দিয়ে দেখানো, বোঝানো। "বাংলাদেশের যুবমনকে জাগ্রত ও বিদ্রোহান্বিত করিবার জন্য যে সব কারণ দায়ী তাহার অন্যতম হইতেছে 'দেশের কথা'।"

রাজদ্রোহ নেই। বরং উল্টোটাই। ভারতীয়দেরই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো তার দোষত্রুটি। তারা বিজ্ঞানে বিমুখ। যন্ত্র-পাতির আবিষ্কারে অনিচ্ছুক। উৎকোচে উৎসাহী। আলস্যে আবিল। দেশদ্রোহীতায় দেদার উৎসাহী। তাই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা পরাভূত। শিল্প শিলীভূত।

তবু রাজরোষ। মুদ্রণ বন্ধ। প্রচার বাতিল। কারণ বোধ হয় বইটির অসামান্য জনপ্রিয়তা। সেকালের তরুণদের কাছে ঐ নিষিদ্ধ বইটা ছিল একেবারে অবশ্য পাঠ্য।

তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ-দর্শনের জন্যে লিখলেন ঐ বইয়ের সমালোচনা। তাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ দেশের কথা নাম দিয়েই লিখলেন এক সাময়িক প্রসঙ্গ। সেই লেখাতেই প্যাট্রিয়টিজমের বাংলা প্রতিশব্দ স্বাদেশিকতার প্রথম সূত্রপাত।

'স্বদেশী সমাজে' রবীন্দ্রনাথ দেশনেতাদের উদ্দেশ্য করে জানালেন যে ভারতের মর্মস্থল তার গ্রাম। জানালেন তিনি বিলেতী ধাঁচের সভাসমিতির বিরোধী। তার বদলে অনেক বেশী উপযোগী বড় আকারের মেলা "সেখানে যাত্রাগান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তের হইতে একত্র হইবে। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষি দ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। সেখানে ম্যাজিক-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং আমাদের যাহা কিছু সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে, ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী-চিন্তার মূলে প্রভাব পড়েছিল হিন্দু-মেলার। তার সূচনা বঙ্গ-ভঙ্গের বহু আগে, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে। স্বাধীনতার দাবি ছিল না অবশ্য তার মধ্যে, ছিল স্বাবলম্বীতার দায়। ছিল না সুগঠিত সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক কার্যক্রম, ছিল অকৃত্রিম জাতীয়তাবোধের আন্তরিক উপলব্ধি।

হিন্দু মেলাতেই স্বদেশীয়ানার প্রথম জাগরণ বাংলাদেশে।

১৮৬৭ সালের ঘটনা। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন এই মেলার ভাবদাতা জনক। আর নবগোপাল মিত্র প্রাণদাতা সংগঠক। ১৮৬৬ রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব নামে ইংরেজীতে লেখা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র

মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'-র অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। তিনি আমার নিকট স্পষ্ট ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় 'জাতীয় সভা' সংস্থাপন করেন।...প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটি লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম।...১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দুমেলা খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রদর্শন জন্য নানাপ্রকার জিনিস পাঠাইতেন। আমার স্মরণ হয়, বস্ত্র বয়নের এক নূতন যন্ত্র একবার মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার যন্ত্র তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন।"

তাঁর নিজের স্মৃতিমন্থন করে অবনীন্দ্রনাথ সে-যুগের ঐ হিন্দু-মেলার একটি উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

"একটা ন্যাশনাল স্পিরিট কী করে তখন জেগেছিল জানি নে, কিন্তু চারদিকেই ন্যাশনাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এটা হচ্ছে আমার জ্যাঠামশায়দের আমল, বাবামশায় তখন ছোটো। নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল, তিনিই সর্বপ্রথম ন্যাশনাল কথাটার প্রচলন করেন। তিনিই চাঁদা তুলে 'হিন্দুমেলা' শুরু করেন।

তখনও ন্যাশনাল কথাটার চল হয় নি। হিন্দুমেলা হবে, মেজো-জ্যাঠামশায় গান তৈরী করলেন—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

এই হল তখনকার জাতীয় সংগীত। আর-একটা গান গাওয়া হত সে গানটি তৈরি করেছিলেন বড়জ্যাঠামশায়—

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত, তোমারি—
রাত্রিদিবা ঝরে লোচনবারি।

এই গানটি বোধ হয় রবিকাকাই গেয়েছিলেন হিন্দুমেলাতে। এই হল আমাদের আমলের সকাল হবার পূর্বেকার সুর; যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। আমরাও ছেলেবেলায় এই সব গান খুব গাইতুম।

ফি-বছরে বসন্তকালে মেলা হয়। যাবতীয় দেশী জিনিস তাতে থাকত। শেষ যেবার আমরা দেখতে গিয়েছিলুম এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে—বাগানময় মাটির মূর্তি সাজিয়ে রাখত; এক একটি ছোট্ট চাঁদোয়া টাঙিয়ে বড়ো বড়ো মাটির পুতুল তৈরি করে কোনটাতে দশরথের মৃত্যু, কৌশল্যা বসে কাঁদছেন, এই রকম পৌরাণিক নানা গল্প মাটির পুতুল দিয়ে গড়ে বাগানময় সাজানো হত।

কী সুন্দর তাদের সাজাত, মনে হত যেন জীবন্ত। পুকুরেও নানা ব্যাপার। কোন পুকুরে শ্রীমন্ত সওদাগরের নৌকো, সওদাগর চলেছেন বাণিজ্যে ময়ূরপঙ্খী নৌকো করে, মাঝিমাল্লা নিয়ে। একটা পুকুরে ছিল—সে যে কী করে সম্ভব হল ভেবেও পাইনে—জল থেকে কমলে কামিনী উঠছে, একটা হাতী গিলছে আবার ওগরাচ্ছে। সে ভারী মজার ব্যাপার। পুতুল-হাতীর ওঠানামা দেখে সকলে অবাক। তা ছাড়া কুস্তী হত, রায়বেশে নাচ হত, বাঁশবাজি খেলা, আরো কত কী। তাদের আবার প্রাইজ দেওয়া হত।

এই তো গেল বাইরের ব্যাপার। ঘরের ভিতরেও নানা দেশের নানা জিনিসের এক্‌জিবিশন—ছবি, খেলনা, শোলার কাজ, শাড়ি, গয়না। মোট কথা, দেশের যা-কিছু জিনিস সবই সেখানে দেখানো হত। সন্ধ্যেবেলা নানারকম বৈঠক, কথকতা নাচগান আমোদ-আহ্লাদ সবই চলত।

হিন্দুমেলা, সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার তখনকার দিনে। তার অনেক পরে হিন্দুমেলারই আভাস দিয়ে মোহনমেলা, কংগ্রেস মেলা, এ মেলা, সে-মেলা হয়, কিন্তু অতবড়ো নয়। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যই ছিল ভারতপ্রীতি ও আজকাল তোমাদের যে কথা হয়েছে কৃষ্টি—সেই কৃষ্টির উপর তার প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু বাঙালীর যা বরাবর হয়, শেষটায় মারামারি করে কৃষ্টি কেষ্ট পায়, হিন্দুমেলারও তাই হল।

নবযুগের গোড়া পত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চারদিকে ভারত, ভারত,—ভারতী কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হল ওই তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।"

নবগোপাল মিত্রকে তাঁর সময়ে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল—'Father of Physical Education'. হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলায় মাতার আগে বাংলার যুবসমাজে ব্যায়াম-চর্চার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্যোগ। বাঙালীর ছেলে বলে, বীর্যে মহীয়ান হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। বাঙালীর বিদ্যা আছে। বুদ্ধিরও অভাব নেই। নেই তাহলে কি? শক্তি। সৈনিক হবার সাহস।

নবগোপাল মিত্র চেয়েছিলেন বাঙালীর ছেলেও সৈন্যদলে ভর্তি হোক্। তাদের সে-সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। সেনাদলে ভর্তি না করা যায় যদি, তাহলে অন্তত তাদের নিয়ে একটা 'স্বেচ্ছাসেবক বা ভলান্টিয়ার বাহিনী' তৈরি করা হোক্। নবগোপাল এই নিয়ে একটা আন্দোলন শুরু করে দিলেন।

টাউন হলে সভা। ১৮৭৪-এর ১লা জুন। বিষয়, বাঙালীদের সরকারী সৈন্য বিভাগে প্রবেশ। পরের দিন অমৃতবাজারের সংবাদ—

"গত সোমবার টাউন হলে আমাদের দেশহিতৈষী নবগোপাল মিত্র একটি অপূর্ব বক্তৃতা করিয়াছিলেন।···ইনি সেই মহাপুরুষ যিনি দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পণ করিয়াছেন। ···নবগোপালবাবু তাঁহার বক্তৃতায় নানারূপ উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের দেশীয়রা যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন, যদি গভর্নমেণ্ট ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন তাহা হইলে ইহারা সমরেও বিখ্যাত হইতে পারেন।···"

নবগোপাল মিত্র যাকে বলে জাত-সংগঠক। আর যাই গড়েন, তাইই 'জাতীয়'।

"তাঁহার মুখে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়'! তাঁহার সকল কার্যে 'জাতীয়, জাতীয় জাতীয়'! তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম 'জাতীয়'! বিদ্যালয়ের নাম 'জাতীয়'! ব্যায়ামশালার নাম 'জাতীয়,! মেলার নাম 'জাতীয়'। তিনি জাগ্রত অবস্থায় 'জাতীয়' লইয়া বিব্রত! তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়'! তিনি জাগ্রত জাতীয়!"

হিন্দুমেলার অসামান্য সাফল্যের পর তিনি গড়েছিলেন— 'জাতীয় সভা! এই সভাই পরিচালনা করতো বাৎসরিক মেলা। প্রতি মাসে এই সভায় বসতো বক্তৃতার আসর। বিষয়—বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ব সবই।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে খোলা হল—জাতীয় বিদ্যালয়। শেখানো হবে ছবি আঁকা, গান-বাজনা, ইঞ্জিনীয়ারিং, সার্ভেয়িং, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, এমন কি বন্দুক চালানো। তখনও অস্ত্র-আইন পাস হয় নি। কাজেই বন্দুক চালানো বেআইনী ব্যাপার নয়।

এরপর জাতীয় থিয়েটার। সেটা ১৮৭২ সালের শেষ ভাগ।

উপদেশ তাঁর। উপকরণ সংগ্রহে যাঁরা ছিলেন নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁদের অন্যতম।

সবই যখন হল সার্কাসটা বাকী থাকে কেন? বাঙালীর সার্কাস তৈরি হল। সেও জাতীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—"কতকগুলা 'মড়া-খেগো' ঘোড়া লইয়া, নবগোপালবাবুই সর্বপ্রথম বাঙালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে বোসের সার্কাসের (Bose's Circus) কৃতিত্ব এবং নানা প্রশংসা বাণী শুনা যায়, উহা তাহারই পরিণতি এবং নবগোপালবাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙালী সার্কাসের চরম ক্রমোন্নতিই বলিতে হইবে।

"তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এদেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্মবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।"

হিন্দুমেলার পরেই নবগোপাল গড়েছিলেন যে জাতীয় সভা তার সভ্যদের আচার-আচরণ ছিল পুরোমাত্রায় স্বদেশী। 'গুড নাইট' বলবে না কেউ। তার বাদলে 'সু-রজনী'। নববর্ষের আলিঙ্গন-অভিনন্দন আপ্যায়ন হবে না পয়লা জানুয়ারীতে। হবে পয়লা বৈশাখে। কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনায় চলবে না ইংরেজীর ভেজাল। বলতে হবে নিখাদ বাংলা। ভুল হলেই ভুলের মাশুল চাপবে ঘাড়ে। প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের জন্যে জরিমানা জারী হল এক পয়সা।

হিন্দুমেলায় দুবার কবিতা পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার চোদ্দ বছর বয়সে। আরেকবার ষোলো বছরে। শেষবারের কবিতাটা ছিল যেমন দীর্ঘ, তেমনি জ্বালাময়ী; লর্ড লিটনের দিল্লী দরবারকে ধিক্কার জানিয়ে।

"ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাবনা
আমরা গাব না হরষ গান

এস গো আমরা যে কজন আছি
আমরা ধরিব আর এক তান।"

তখনো লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে প্রেস অ্যাক্ট বহাল রয়েছে। তাই সে কবিতা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি।

এই হিন্দু মেলাতেই বালক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখনকার দিনের নবীন ও শক্তিমান কবি নবীনচন্দ্র সেনের পরিচয় হয়।

হিন্দুমেলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি—"ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগানগীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

'জাতীয় সংগীত' নামক বিশেষ ধরনের রচনার আরম্ভ এই হিন্দুমেলার সময় থেকেই।

এরপর 'স্বদেশী মেলা'-র স্মরণীয় আর এক অধ্যায় দেখা দিল ১৯০১ সালে। কলকাতায় হলো কংগ্রেসের অধিবেশন। এই অধিবেশন উপলক্ষেও একটি শিল্পপ্রদর্শনীর প্রস্তাব করেন স্বদেশী শিল্পের অন্যতম আদি পৃষ্ঠপোষক, গুণগ্রাহী ও প্রচারক ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। তখনো কংগ্রেসী নেতাদের মনে জাতীয় প্রদর্শনীর বিশেষ মূল্য বা উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন ধারণা বা চিন্তার ছায়াপাত ঘটে নি। এর সার্থকতা কোথায় সে বিষয়েও ছিল না তাঁদের মনোযোগ। যোগেশ চৌধুরীই প্রথম তাঁর দলবল নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের দরবারে হাজির হলেন। তাঁদের আর্জি কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে একটি শিল্পপ্রদর্শনী। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান নি। তাঁকে যোগেশ চৌধুরী বোঝালেন—"যতদিন আমরা আমাদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন

করিতে না পারিব, ততদিন আমরা স্বদেশে স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী হইতে পারিব না।"

যোগেশচন্দ্র তাঁর নিজের জবানীতে লিখেছেন—"আমি রাষ্ট্র-গুরুকে আরো বোঝাই যে, কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু শিল্প ও শ্রম-জীবিরা যতদিন এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক না হবে, ততদিন আমরা স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী হতে পারব না। কংগ্রেসের সহিত আমি এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী সংযুক্ত করিব বলি। রাষ্ট্রগুরুর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি অন্য নেতাদের আপত্তি লঙ্ঘন করে আমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।"

যা ভাবা হয়েছিল, তার কিছুটা সফল হল। কলকাতা কংগ্রেসের শিল্পপ্রদর্শনী দেশের মানুষের মনের ঘুমনো স্বদেশভাবকে খানিকটা জাগিয়ে দিল। কলকাতা বা বাংলাদেশ ছাড়িয়ে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো দূর দূরান্তে। কলকাতা প্রদর্শনীর অনুসরণে আমেদাবাদ কংগ্রেসেও ঐরকম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। উদ্বোধন করলেন বরোদার মহারাজা।

তখনো স্বদেশী আন্দোলনের জয়ভেরী বেজে ওঠে নি। তার বহু আগেই কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান স্টোর্স' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই যোগেশ চৌধুরীই। সেখানে থাকতো স্বদেশের তৈরি সব জিনিসই। যোগেশ চৌধুরীর সমকালে কুঞ্জবিহারী সেনও ছিলেন একজন স্বদেশী প্রচারক। কে. বি. সেন অ্যাণ্ড কোম্পানী ছিল সেকালের স্বদেশী-বস্ত্র-বিক্রেতা। এসব চেষ্টা ছিল বিচ্ছিন্ন ও একক। এর পিছনে কোন সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ছিল না, ছিল না কোন সুসংবদ্ধ কার্যসূচী। তার সূচনা হল ১৯০২-এ।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটির' নেতৃত্বে খোলা হল 'স্বদেশী স্টোর্স।' সতীশচন্দ্রের মজ্জায় মজ্জায় স্বদেশীয়ানা।

প্রবল তাঁর উৎসাহ, প্রচণ্ড তাঁর সাহস, প্রকাণ্ড তাঁর পরিকল্পনা। শুধু একটা দোকান খুলেই চুপচাপ বসে থাকার লোক তিনি নন। স্বদেশী-প্রচারের আরো বহুবিধ উপায় তিনি কাজে লাগালেন। যেমন, একটা হল স্বদেশী দোকান। এর পর চেষ্টা চলল একদল শিক্ষিত প্রতিভাবান যুবককে স্বদেশীভাবে উজ্জীবিত করা যায় কি করে। শিল্প বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা আর শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন আরও একটা চেষ্টা। এ ছাড়া 'ডন সোসাইটির' মুখপত্র 'ডন ম্যাগাজিনে' অর্থশাস্ত্র বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। তখন এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন আশাতীত, তেমনি আশাপ্রদ।

পরে স্বদেশী স্টোর্স ছাড়াও আরও দুটি স্বদেশী দোকান খোলা হয়। একটা হল কেদারনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। প্রোপাইটার, বি, কে, সেন এণ্ড কোং। আর একটা আব্দুল হালিম গাজনাভির 'ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স'।

কিন্তু 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত অথবা সোসাইটির উদ্যোগে পরিচালিত 'স্বদেশী স্টোর্স'ই ছিল গুরুত্বে প্রধান। কারণ স্বদেশী জিনিষ বিক্রি করার সঙ্গে ছিল গঠনমূলক কর্মসূচী। বিনয় সরকারের সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে খুবই জীবন্ত।

"ছোঁড়াদেরকে 'কেজো লোকে' পরিণত করাই ছিল সতীশ বাবুর মতলব। এই দোকানের মারফত আমরা পাইকারী হিসাবে জিনিসপত্র কিনতে শিখতাম। মালগুলো কোথায় পাওয়া যায় এই খবর রাখতে হতো, বাজার দরের উঠা নামা বুঝতে হতো, পাইকারী আর খুচরা দরের প্রভেদ সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান জন্মাত। এই গেল মাল যোগানোর দিক। তারপর দোকানে মাল মজুত রাখার ধান্দা। কোন জিনিসের কত পরিমাণ দোকানে মজুত রাখা উচিত তার অভিজ্ঞতা লাভ ছিল মস্ত কথা। বেচবার দাম ঠিক করাও সোজা ছিল না। বেচে টাকা পয়সা জমা করা বেশ

কিছু কঠিন মালুম হতো। সবচেয়ে কঠিন ছিল বোধ হয় হিসেব রাখা। সতীশবাবু এইসব কাজের ভেতর দিয়ে চেলাদের ডান-পিটে রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এরই নাম 'হাতে-কলমে' কাজ শেখা······ডন সোসাইটিতে সব সভ্যই সব কাজ পুরোমাত্রায় করত না। দোকানদারিতে শুধু আমিই ফেল করিনি। হারান চাকলদার, রাধাকুমুদ, রবি ঘোষ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি অনেকেই আমার মতন ম্যাড়াকান্ত প্রমাণিত হয়েছিল।"

পরবর্তীকালে বিহারের জননায়ক আরও পরে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছাত্রজীবনে যুক্ত ছিলেন এই সোসাইটির সঙ্গে। তখন থাকেন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। রাধাকুমুদ, বিনয় সরকার প্রমুখদের সমসাময়িক। বিনয় সরকারের চেয়ে এক ক্লাস নীচে পড়েন তখন। বিহারী ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালী ছাত্রদের মাখামাখি ছিল বেশ। কেউ কেউ হিন্দী বলাতেও অভ্যস্ত ছিলেন। বিনয় সরকারের নিজের স্মৃতি—"রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গেও খুব ভাব ছিল। আজও আমি তাকে 'ভাইয়া রাজেন্দর' বলে ডাকি। সেও আমাকে 'ভাই বিনইয়া' বলে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে বহু বাঙালী ছাত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই সতীশবাবুর সঙ্গে তার দেখা। আর যাঁহা দেখা, তাঁহা ডন সোসাইটিতে ভর্তি হওয়া। বোধ হয় রাধাকুমুদের নেতৃত্বেই রাজেন্দ্রপ্রসাদও আমারই মতন ডন সোসাইটিতে নাম লেখাতে যায়। যতদূর মনে পড়ছে একদিনে বা একসঙ্গে নয়। হয়তো আমার পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ জুটেছিল।"

ডন সোসাইটির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সাধুবাদ জানিয়ে সতীশচন্দ্রকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ একসময়ে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—"As the only institution of its kind we naturally expect much from it···The Dawn Society is an unique

institution and is doing a service to the community for which it cannot be too grateful to you."

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও এই সময়ে আর এক উদ্যোগ। পত্রিকা প্রকাশ। নাম 'ভাণ্ডার'। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। কিছুটা জোর করেই এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাঁধে। তিনি তখন চাইছিলেন কাজের আবর্তময় ঘূর্ণি থেকে দূরে সরে যেতে। নিজের নিভৃত জগতের অন্তঃপুরে থাকবেন একা। সমাজের আলোড়নে অনেক তো হল গা-ভাসানো। এবার ফিরে তাকাতে হবে মনের গহনে। সেখানে আরেক আলোড়ন, কথার, ছন্দের কল্পনার। অনেক দিন থেকে তারা বন্দী হয়ে আছে আত্মপ্রকাশহীন নীরবতার কারাগারে। চায় মুক্তি। কিন্তু তবুও তাঁকে শেষ পর্যন্ত সম্মতির মাথা নাড়তে হল, কেদারনাথের নাছোড়বান্দা অনুরোধের উগ্র উত্তেজিত ঝঞ্ঝাট-বাধানো ঝাপটানিতে। "কেন যে কি মনে করিয়া ভাণ্ডার সম্পাদন করিতে রাজী হইয়ছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাকেই বলে গ্রহ।"

তখনও বঙ্গদেশটা দু-ভাগ হয়ে যায় নি। চলেছে ছুরিতে শান। সারা দেশে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, অশ্রদ্ধা। গ্রহের ফেরে 'ভাণ্ডার'এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপলেও, দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিই আগ্রহী করে তুলল তাঁর বুকের সঞ্চিত বেদনাকে হাতের কলমের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে। ভাণ্ডারে বেরুল তাঁর একাধিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ। একাধিক স্বদেশী সংগীত। 'বহুরাজকতা' প্রবন্ধে উদ্‌ঘাটিত করলেন ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ। "ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পর একটি কোম্পানি বসিয়াছিল,...এখন ইংরেজ জাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজ পরিবার নহে, সমস্ত ইংরেজ-জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে...মোট কথা, একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া

অন্য দেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। ···একটা দেশ যতই রসালো হউক না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে; দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।"

১৯০৫-এর ডিসেম্বর যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত-ভ্রমণে এলেন। শাসক মহলে চলল সাড়ম্বর আয়োজন। দেশটা যে উপদ্রুত, দেশবাসী যে অত্যাচারিত, দেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি যে ভূলুণ্ঠিত এটা যাতে যুবরাজের চোখে না পড়ে তার জন্য খাড়া করা হল মহাসমারোহপূর্ণ উৎসবের ছিদ্রহীন দেয়াল। এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে সজাগ করে দিয়ে ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন এক প্রবন্ধ। রাজভক্তি।

"দেবতা হউন, আর মানবই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত চাবুক জেল জরিমানা প্যুনিটিভ পুলিস ও গোরা গুর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই।"

পত্রিকা হিসাবে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য, তার উদ্যোক্তার ভাষায়—"আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত 'ভাণ্ডার'এ ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে। দেশে মাঝে মাঝে যে-সকল কথা উঠিয়া পড়ে, যে সম্বন্ধে নানা বিচক্ষণ লোকের সংক্ষিপ্ত মত সংগ্রহ করিয়া 'ভাণ্ডার'এ একত্র রক্ষা করা হইবে।"

ভাণ্ডার-এর আলোচ্য বিষয় ছিল রাজনৈতিক পটভূমিতে সমগ্র সমাজের যাবতীয় সমস্যার বিচার ও বিশ্লেষণ। তার মধ্যে যেমন ছিল প্রাইমারী শিক্ষা, জলকষ্ট, গণসংযোগ, তেমনি ছিল স্বদেশী শিক্ষা ও শিল্প, চারুকলা, সাহিত্য ও সমাজের আরও নানা সৃষ্টিশীল দিক; যা কিছু সেদিন ইংরেজ শাসনের চাপে অবরুদ্ধ, উপেক্ষিত।

এর পরেই বান ডেকে এল স্বদেশী আন্দোলন।

অথচ স্বদেশী বলে গর্ব করার শিল্পসামগ্রী কিছুই নেই। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আসে সুতো আর কাপড়। একদিন যার মসলিন পৃথিবীর কাছে ছিল পরম লোভনীয়, যে-দেশের তাঁতির নৈপুণ্য এবং তাঁত বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ছিল বিশ্ববন্দিত, সেই দেশ সেদিন বস্ত্রের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী। ইংলণ্ড থেকে যন্ত্রজাত বস্ত্র আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার উঠল বাংলার তাঁতির ঘরে ঘরে। মনোমোহন বসু সেই বেদনার ছবি এঁকেছিলেন তাঁর কবিতায়।

"দেশে তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।
আমাদের দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে,
খেতে শুতে বসতে প্রদীপ জ্বালাতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

ছুঁচ, ছুরি, কাঁচি, সেলাইয়ের কল আসে লীডস্ বা শেফিল্ড থেকে। চিনি আসে জার্মানী বা জাভা থেকে। লিভারপুল থেকে আসে নুন। অষ্ট্রিয়া থেকে কাগজ, পেন্সিল। বেলজিয়াম থেকে কাঁচ, কাঁচের বাসন। সুতরাং প্রথম দিকে স্বদেশীয়ানার যে জোয়ার উঠল তার মধ্যে যতটা ছিল ভাব, ভক্তি ছিল না ততটা। এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা ছিল কৃত্রিম, লোক-দেখানো দেশ-প্রেম। তাই আন্দোলনকারীদের দিক থেকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল প্রচণ্ড চাপ, বাধ্যবাধকতার প্রাবল্য।

এই প্রসঙ্গে সেকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের, বিবরণ খুবই উপভোগ্য।

"তখন আমেদাবাদে কাপড়ের কল খোলা হয়েছে মাত্র। তার কাপড় ছিল চটের মতো। এক ধোপেই রঙ উঠে যেত। তাও আবার সব জায়গায় পাওয়া যেত না। বাংলাদেশের ছাত্র-যুবকেরা সেই কাপড় মাথায় করে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমার মনে আছে তখন আমাদের নওগাঁ শহরে (রাজশাহী জেলা) একটা

এক-দরজাওয়লা ছোট্ট দোকানে স্বদেশী কাপড় বিক্রি হ্ত। তার পাশেই বড় বড়দোকানে বিলেতী কাপড় যেমন সস্তা, তেমন সুন্দর। রেলী ব্রাদার্স (Ralli Brothers) ও মাড়োয়ারী আমদানী-কারকেরা বাজার বোঝাই করে রাখত। নিত্য নতুন পাড়, সুতাও মিহি ও মসৃণ। সেই প্রলোভন সম্বরণ করে আমরা তখনকার দিনে দ্বিগুণ দামে আমেদাবাদের চট কিনতাম। পরিস্কার ধবধবে বিলেতী নুন বাদ দিয়ে কালো কালো মাটিভরা করকচ নুন ব্যবহার করতাম। ডসন কোম্পানির সুন্দর জুতো বাদ দিয়ে দেশী মুচির নাগরা জুতো ধরলাম। প্রথম দিনেই ফোস্কায় পা ভরে গেল। আমাদের পিতা বন্ধুদের পরামর্শে জুতাতে রেড়ীর তেল লাগাতে লাগলেন। নওগাঁর রাস্তার এক হাঁটু ধুলো ও রেড়ীর তেলে এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি হ'ল। পরে পিপঁড়ের ঝাঁক এসে কয়েকদিনেই জুতার অস্তিত্ব লোপ করে দিল। কাজেই হয় খড়ম নয় খালি পা একমাত্র সম্বল হ'ল।"

স্বেচ্ছায় যারা স্বদেশী কিনবে না তাদের জন্য গড়া হল স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী। স্কুল, পালিয়ে ছাত্ররা এগিয়ে এল কাজে। কাপড়-চোপড় মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফিরি শুরু করে দিলে তারা। শুধু কাপড়-চোপড় নয়। তার সঙ্গে আছে অন্যান্য স্বদেশী জিনিস। শাঁখা-চুড়ি, যশোহরের চিরুনী-কাঁকন, বর্ধমানের কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি, বরিশালের উজিরপুরের নিব-কলম, ত্রিপুরার কালি, কচ্ছের দেশলাই।

দোকানে দোকানে হানা। প্রথমে করজোড়ে অনুরোধ, বিক্রেতাকে। বিদেশী জিনিস যাতে বিক্রি না করে। তারপর ক্রেতাকে, যাতে না কেনে। কিনলে ফিরিয়ে দিতে। জিনিস ফিরিয়ে দিতে চাইলে যদি বিক্রেতা দাম ফেরত দিতে না চায়? না চায়, দাম মিটিয়ে দেবে স্বেচ্ছাসেবকেরা।

দেশের নেতারা আসেন গ্রামে-গঞ্জে জনসভায়। তাদের

জানাতে হবে সম্মান-সম্বর্ধনা। তার প্রধান অঙ্গ বহ্ন্যুৎসব, bonfire. পুড়তো বিলেতী কাপড়, বিলেতী নুন, চিনি ; মজুতদার আড়তদারের গুদাম থেকে ছিনিয়ে এনে।

বিদেশী নুন বয়কটের দাবিতে নওগাঁর একদিনের জনসভার ছবি সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের লেখায় ভারী চমৎকার।

"একবার আমরা শুনলাম যে সুরেন্দ্রনাথ নওগাঁ আসছেন। আমাদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার হল। সুরেনবাবুকে আনবার জন্যে নওগাঁ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তিনমাইল দূর সান্তাহার স্টেশনে সমবেত হলেন। আমরা ছোটরা ছোট ছোট পতাকা হাতে করে রাস্তার দুধারে সার বেঁধে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্' গাইতে গাইতে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা একটা গাড়ি টেনে নিয়ে গেল। সুরেনবাবু তাতে বসলে, তারাই গাড়ি টেনে নিয়ে আসবে। খবরের কাগজে দেখেছিলাম সুরেনবাবুর দাড়ি আছে ও পরনে আচকান চাপকান। স্টেশনের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর আমরা দূর থেকে দেখলাম একজন দাড়িওলা আচকান চাপকান পরিহিত ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নামলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে ঘেরাও করে তাঁর গলায় মালা পরালেন। অবশেষে তিনি গাড়িতে এসে বসলেন। গাড়ি টানা আরম্ভ হল। আমরাও প্রাণপণে 'হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক' আরম্ভ করলাম। নওগাঁ এসে শুনলাম তিনি আমাদের নেতা সুরেনবাবু নন। বর্ধমানের আবুল হোসেন সাহেব।

বিকেলবেলা তিনি বক্তৃতা করতে করতে পাশের একজন ভদ্র লোককে দু-গ্লাস জল আনতে বললেন। গ্লাস এনে তিনি তাঁর লম্বা পকেট থেকে দুটি পুরিয়া বের করে দু-গ্লাসের জলে মিশালেন। তারপর তিনি সকলকে আহ্বান করে বললেন—'ভাই সব, এবার এসে দেখুন। এক-গ্লাসে নুন আর এক-গ্লাসে চিনি। তার

মধ্যে দেখতে পাবেন গরু ও শুয়োরের রক্ত কণা ভাসবে।' দেখবার দরকার হল না। আমরা তারপর থেকে বিলেতী চিনি ও নুন পরিত্যাগ করলাম। তখন আমরা ভাবের বন্যায় ভেসেছি। যা দেখি, যা শুনি তাতেই সেই বন্যায় তরঙ্গ তোলে। সমস্ত দেশটা যেন অভিভূত, স্বপ্নাচ্ছন্ন।"

আন্দোলন এগোয় যত, বাধাও তত এগিয়ে আসে সামনে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সঙ্গে জোট বাঁধল একদল মোল্লা। তারা শহরের পথেঘাটে প্রচার করতে লাগল মুসলমানদের এই আন্দোলনে যোগদান করা ধর্মবিরুদ্ধ, গোনা অর্থাৎ পাপ। কারণ এ-আন্দোলন হিন্দুদের। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের কোথাও তো মিল নেই। তোমরা পশ্চিম মুখ হয়ে নামাজ পড়। ওরা সন্ধ্যাপূজা করে পূব-মুখো হয়ে। তোমাদের ভাত কলাপাতার যে পিঠে হিন্দুরা তা উল্টে নিয়ে পাত করে। তাহলে ভাবটা কিসের।

উত্তর দিলে একজন মুসলমানই। ক্ষেতে যে ধান হয়, তা বেচি কাকে? হিন্দুকেই। গরু যে দুধ দেয়, তা কেনে কে? হিন্দুই। হিন্দুই বারমাসের প্রতিবেশী। চালায় চালায় ঘর। এক পাড়া, এক নদী-খাল-বিল, এক সুখ-দুঃখ। ভাবটা নেই কোথায়?

নবাব বললেন—ওসব বুঝি না। আমার হুকুম, হাট বসবে বরিশালে, বিলেতী নুন-চিনি-কাপড়ের। বাধা দিতে এলেই মাথা ভাঙবো।

বরিশালের মাথা নবাব নন। অশ্বিনীকুমার। শুধু মাথা নয়, মাথার মুকুট। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন—

"তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলীহেলনে পরিচালিত হইত। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠে, তেমনি বরিশালের লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছাদ্বারা।"

অশ্বিনীকুমার আঙুল নাড়লেন। অমনি আরেকটা নতুন হাট বসে গেল নদীর ওপারে। নবাবের হাটে মাছি ভোঁ ভোঁ।

নবাব হটে গেলেন। এলেন ম্যাজিস্ট্রেট বুলার সাহেব। বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করলেন—বানাও বাজার। দেখি লোকে বিলেতী কিনে কিনা।

বসল বাজার। সারি সারি দোকানঘর। এমন কি তার সঙ্গে নহবতখানাও। সানাই বাজবে? নাকি হ্যামেলিনের বাঁশী? সুরের টানে সবাই ছুটে আসবে ঘর ছেড়ে?

কিন্তু হায়, একি কাণ্ড। দোকানের চালে কেবল কাকের ডাক। দোকানের ভিতরে কাকস্য পরিবেদনা। তামাশা দেখতেও তো দু-চারজন আসতে পারতো?

ঠিক আছে। আনো গুর্খা সৈন্য। ছড়িয়ে দাও শহরে। গলা টিপে মারো সমস্ত জনসভাকে। স্বদেশী নিয়ে উত্তেজক বক্তৃতা চলবে না। চললে গুর্খা সৈন্য গুঁড়ো করে দেবে মাথা।

অত্যাচার যতখানি নৃশংস হতে পারে, বরিশালে চলল তারই মহড়া। কিন্তু বর্বর, বীভৎসতা দিয়েও বুলার সাহেব তাঁর বাসনা চরিতার্থ করতে পারলে না।

অশ্বিনীকুমার গড়েছেন—স্বদেশবান্ধব সমিতি। স্বদেশী প্রচারের সভা। তিনজন প্রচারকের দুজন মুসলমান, একজন হিন্দু। উদ্দেশ্য চারটি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বদেশী আর সালিসী, এই চারটে বিষয়ে সাবলম্বিতা। সেই সাবলম্বিতার ডাকে বরিশালের মানুষ কিভাবে সাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ সে বছর বরিশালে বিলেতী কাপড়ের বিক্রি কমে গেল ৩ কোটি টাকার। ৫২টা মদের দোকান উঠতে উঠতে ঠেকল এসে মাত্র দুটোয়।

এক বছরে 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'র শাখা গড়ে উঠল প্রায় দেড় শ'র মত। কলকাতার 'বেঙ্গলী' পত্রিকা লিখলে—

"বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি এক বছরে আশ্চর্য কাণ্ড

করেছে। এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকাকে সকলেই আমরা সৌভাগ্য মনে করবো। ঐ সমিতি প্রত্যেক বাঙালীকে করেছে জাতীয় গৌরবের অংশীদার।"

গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় যাতে স্বদেশীর বার্তা গিয়ে পৌঁছতে পারে সেজন্যে চাই যেমন সংগঠন, তেমনি সংবাদপত্র। অশ্বিনী-কুমারের সাহচর্যে প্রিয়নাথ গুহের সম্পাদনায় বেরুল 'বিকাশ'। বেরুল 'বরিশাল-হিতৈষী'।

পরিণাম দাঁড়াল এই যে শহরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হাজার চেষ্টাতেও একটা বিলেতী জিনিস কিনতে পান না। দোকানে জিনিস আছে। কিন্তু বেচতে নারাজ। বেচতে পারে যদি আদেশ-পত্র বা অনুমতি দেন 'বাবু'। বাবু অর্থে অশ্বিনীকুমার। সারা বরিশালের মানুষ 'বাবু' নামেই চিনতো তাঁকে।

১৯০৭ সালে শুরু হল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, কুমিল্লায়, ময়মনসিংহে; হিন্দু ও মুসলমানে। কিন্তু বরিশালে হল না। নবাবের অনুমোদন ছিল, সাহায্য ছিল, চক্রান্তের জালও হয়েছিল বোনা, তবু হল না। তার কারণ 'বাবু'। বাবু হিন্দু। তবু বাবুই বাঁচায় রোগে-শোকে, দুঃখে-দারিদ্র্যে। দুর্ভিক্ষের দিনে বাবুই হাতে তুলে দিয়ে যায় প্রাণধারণের অন্ন। তাঁর আদেশে মরতে পারি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে মারতে পারবো না।

তাঁর সম্পর্কে বিপিন পালের বিশ্লেষণ—

"দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান দুঃস্থ-ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে অশ্বিনীকুমারের সেবা পাইয়া আসিয়াছে। বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিতার মোহিনী শক্তি বলেও নহে, জ্ঞান-গরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে, ও কার্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা

একমাত্র অশ্বিনীকুমারের এই লোকনায়কত্বের কতকটা আভাস পাই।"

অশ্বিনীকুমার কাজের মানুষ। শুধু গলা ফাটানোর দলের লোক নন। কি করে স্বদেশী আন্দোলনকে দ্রুত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাই ছিল তাঁর নিরন্তর চিন্তার বিষয়। অসুর নিধনের কাজে সুরের কথাটাও তিনি ভুলে যান নি।

জারিওয়ালা মুসলমানদের গলায় তুলে দিলেন স্বদেশী গান। মুকুন্দদাসকে মাতালেন স্বদেশী যাত্রায়। মুকুন্দদাসের ছিল বজ্রকণ্ঠ। বেজে উঠল দেশ জুড়ে।

আমরা নেহাৎ গরীব
আমরা নেহাৎ ছোট
তবু আছি ত্রিশ কোটি—জেগে ওঠো।
জুড়ে দে ঘরে তাঁত
সাজা দোকান।
বিদেশে না যায় ভাই
গোলার ধান।
মোটা খাবো ভাইরে পরবো মোটা
আমরা মাখবো না ল্যাভেণ্ডার চাইনে অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে
উপোসি রবো কি ঘরে শুয়ে
শোন্ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব
খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোটো,
তবু আছি ত্রিশ কোটি—জেগে ওঠো।

হেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্যবিশারদ। তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন স্বদেশী কথকতায়। হেমচন্দ্রের ছিল ললিতকণ্ঠ, অভিনয়ের ক্ষমতা। রাতারাতি স্বদেশী কথকতা মানুষের মন জুড়ে বসল।

বরিশালের মানুষ সেদিন কতটা বিলেতী-বিদ্বেষী হয়েছিল সেটা একটা মজার ঘটনাতেই স্পষ্ট।

একদিন গ্রামের এক সাধারণ মানুষ একজন মান্যগণ্য বক্তাকে এসে বললে—বাবু, আমার বাড়িতে একটা বিলেতী আমড়ার গাছ আছে, সেটাকে কাটিয়া ফেলিব।

বক্তা হতবাক্। তিনি বোঝালেন, না কাটতে হবে না। নামে বিলেতী হলেও গাছটা জন্মেছে আমাদের দেশের মাটিতে। ওটা দেশী।

এ-সবই অশ্বিনীকুমারের নির্ভীক নিষ্ঠাময় নেতৃত্বের অবদান। সারা বরিশালের 'বাবু'। বরিশালই আজীবনের কর্মক্ষেত্র। কতবার ডাক এসেছে কলকাতা থেকে। এক পা নড়বার নাম নেই। রসিকতা করে বলতেন—কলকাতায় একটা আছে 'সৌর' দল; আর একটা 'বৈপিন' দল, আবার আমি গিয়ে কি সেখানে একটা 'আশ্বিন' দল গঠন করব?

বরিশালে অশ্বিনীকুমার। কলকাতায় সতীশ মুখোপাধ্যায়। "সতীশবাবু যোগাতেন বস্ত্রশিল্পের তথ্য ও অঙ্ক। বুঝানো হতো বিগত বিশ বছরে বোম্বাই-গুজরাটে কাপড়ের কল কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিলাতী বয়কট চালালে সেই অবস্থার আরও উন্নতি হতে পারবে। বাঙালীরাও নতুন নতুন কল কায়েম করে শিল্পনিষ্ঠ হতে শিখবে। ডন সোসাইটির ঘরে-বাইরের আলোচনায় দেশলায়ের কারখানা, সাবানের ব্যবসা, পেন্সিল ফ্যাক্টরী, ইত্যাদি অনেক কিছু ঠাঁই পেত। বয়কট ও স্বদেশী বিষয়ক সতীশবাবুর লেখা প্রবন্ধ বিনা নামে অমৃতবাজার পত্রিকায় আর বেঙ্গলী কাগজে বেরুত। ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে তিনি পেটোয়াদের দিয়ে লেখাতেন।......তা ছাড়া স্বদেশী জিনিসের মেলা বা প্রদর্শনী ও ডন সোসাইটির তদ্‌বিরে খোলা হয়েছিল। কাপড়ের কলের তাঁত সেই আমি প্রথম দেখলাম। কলের তাঁতে কাজ শেখাবার জন্যে

সতীশবাবু বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল থেকে ওস্তাদ ও মিস্ত্রীদের ডেকে এনেছিলেন। সার্বজনিক বক্তৃতায় আয়োজনও উল্লেখযোগ্য। এক সভায়, বোধহয় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ হাজির ছিলেন (১৯০৫)। তাতে ডন সোসাইটির সভ্যেরাও প্রকাশ্যে গলাবাজির সুযোগ পায়। এই অধমও কয়েক মিনিট বকেছিল।"

শুধু বকা নয়, নিজের সম্পর্কে অধম যাঁর বিনয়-বচন, সেই বিনয় সরকার নানারকম স্বদেশী পারিভাষিকও তৈরি করেছিলেন। তারই একটা হল 'ধোঁয়া ওড়ানো'। সভা-সমিতিতে 'ধোঁয়া ওড়ানো' বলাটা তাঁর বাতিক হয়ে গিছল।

"যেখানে-সেখানে চাই ষ্টিমের ইঞ্জিন, তেলের ইঞ্জিন, ইত্যাদি এই ছিল আমার বুখ্‌নি।......মনে পড়েছে মালদহের কলিগ্রামে ন্যাশনাল ইস্কুল কায়েম করবার সময় এই ধরনের বুখ্‌নি ছেড়েছিলাম (১৯০৭) ইস্কুলটার সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল বিভাগ খোলবার উপলক্ষ্যে। বলেছিলাম, কয়েকমাস পরে এসে এই বিভাগে 'ধোঁয়া ওড়াবো'। লোকেরা বুঝেছিল যে, আমি একটা তেলের ইঞ্জিন বসিয়ে টেক্‌নিক্যাল বিভাগের উন্নতি করাবো। এই ধোঁয়া ওড়ানোর বিত্থায় ছিল নগেন রক্ষিত ওস্তাদ। ছোক্‌রা প্রায় আমার বয়েসি, বোধ হয় এক-আধ বছর ছোট বা বড়। কিন্তু লোহালক্কড়, ষ্টীম এঞ্জিন, লেদ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি বুঝে। সে ছিল টেক্‌নিক্যাল বিভাগের লোক। অতএব পেশায় আমার বিলকুল উল্টো। এই জন্যেই তার সঙ্গে আমার বনিবনাও হতো ভাল। তাকে আমি যন্ত্রবীর বলতাম।"

শচীন্দ্রনাথ বসু ডন সোসাইটির ছেলে নয়। সিটি কলেজের ছাত্র। কিন্তু ডন সোসাইটির ছেলেরা তাঁকে মনে করতো নিজেদের লোক। স্বদেশী প্রচারের পাণ্ডা। অফুরন্ত উৎসাহ। স্বদেশ-চিন্তা ছাড়া মুখে আর কোন কথা, মনে আর কোন কামনা নেই। সেই শচীন্দ্রনাথ এক সভায় প্রস্তাব করলেন—

"নতুন নতুন কল কায়েম করে বাজারে ফেলা বাঙালীর পক্ষে বড় শিগ্‌গীর সম্ভব হবে না। স্বদেশী থানের কাপড় তৈরি করা সোজা। বাজারে পাওয়াও যায় যখন তখন। যুবক বাংলা ধুতি ছেড়ে থানের পায়জামা পরতে শুরু করুক। জুতা না থাকে, কুছ-পরোয়া নাই। খালি পায়েই পায়জামা-পরা বাঙালী চলাফেরা করুক।"

সভায় সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন বিনয় সরকারও। তিনি জানাচ্ছেন—"বাস্তবিকপক্ষে শচীন একদিন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একদল পায়জামা-পরা জুতাহীন বাঙালী ছোকরার শোভাযাত্রা বের করেছিল। আমি কলেজ স্ট্রীটে হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিলাম।"

স্বদেশী যুগে মোটা কাপড়ের সমস্যার সঙ্গে আরও একটা মোটা আকারের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেটা জাতীয় পোশাক নিয়ে। স্বদেশী যুগের আগেও কোন কোন সময়ে কারো কারো মাথায় জেগেছিল। স্বদেশী যুগে উঠল এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। বিদেশী পোশাক বর্জনীয়। কিন্তু তার বদলে জাতীয় পরিচ্ছদটা হবে কি-জাতীয়?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন যৌবনে। শুধু দেহে নয়, মনে। দেশ নিয়ে তাঁর নিত্য-নতুন চিন্তা। নব নব পরিকল্পনা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে পাগলামি। কিন্তু ভেতরটা খাঁটি। দেশকে গড়ার ভেজালহীন উদ্যোগে, দেশকে বাঁচানোর-জাগানোর ব্রতে সদা-বিব্রত তিনি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনার ক্ষ্যাপামীর প্রকাশ ঘটেছিল নানাদিকে, নানাভাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একবার তিনি সাত হাজার টাকা দিয়ে কিনে বসলেন একটা জাহাজের খোল। এঞ্জিন নেই, কামরা নেই, সেগুলো সব তৈরি করতে হবে। তৈরি হল। তারপর বিলেতী কোম্পানির সঙ্গে শুরু হল বাণিজ্য-যুদ্ধ।

দুই পক্ষে প্রবল প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতার তাড়নায় একদিকে যেমন বাড়তে লাগল জাহাজের সংখ্যা, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতির পরিমাণ। তবু উত্তেজনা উদ্যম-উৎসাহের অন্ত নেই। তুলে দেওয়া হল যাত্রীদের ভাড়া। তাতেও লোকে বিদেশী স্টীমারে চাপছে দেখে স্থির করা হল যাত্রীদের বিনামূল্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হবে। বরিশালের স্বেচ্ছাসেবক দল স্বদেশী কীর্তন গেয়ে যাত্রী সংগ্রহ শুরু করে দিলে। পরিণামে যাত্রীদের লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল মোটা অঙ্কের লোকসানের সঙ্গে তাল দিয়েই। বেশীদিন গেল না। একদিন খবর এল খুলনা-বরিশালের নদীপথে যাতায়াতকারী স্বদেশী জাহাজ হাওড়ার ব্রীজে ধাক্কা খেয়ে জলে ডুবে মরেছে।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা, "দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশলাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশলাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটি মাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনলেন সে খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে ঋণে এবং সর্বনাশে।"

এহেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে একদিন ভারতবর্ষের সার্বজনীন পরিচ্ছদ কী হবে এই ভাবনা নিয়ে দিনের কাজ, রাতের ঘুম কামাই করবেন সেটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়।

ধুতি কাজের সামিল হবার পক্ষে বড্ড বেশী বেসামাল রকমের বাহুল্য। সুতরাং বাতিল। পায়জামা বিজাতীয়। সুতরাং বর্জনীয়। তাহলে? তাহলে এমন একটা কিছু দরকার যাতে দুইয়ের মধ্যে

একটা আপস ঘটে। আপসের আপ্রাণ প্রয়াসের পরিণামে সর্বভারতীয় পরিচ্ছদ যে চেহারায় পরিণত হল, তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় ও সকৌতুক মন্তব্য খুবই স্মরণীয়।

"তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশেল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

স্বদেশী আন্দোলন যখন সবে দানা বেঁধেছে সেই সময় ঠাকুর-বাড়িতে আরেকবার শুরু হল পোশাক-পরিচ্ছদে স্বদেশীয়ানা প্রচলনের। সেদিন এ-ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী রবীন্দ্রনাথ। একদিনের মজার কাহিনীর কথকথা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। "ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে একটা পার্টি হবে, আমাদেরও নেমন্তন্ন। কী সাজে যাওয়া যায়। রবিকাকা বললেন, সব ধুতি চাদরে চলো। পরলুম ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে দিলুম শুঁড়তোলা পাঞ্জাবী চটি। এখন খালি পায়ে কী করে যাই। চেয়ে দেখি রবিকাকার পায়ে মোজা। আমরাও চটপট মোজা পরে নিলুম। যাক, মোজা পরে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তখনকার দিনে মোজা ছাড়া চলা

সে একটা ভয়ানক অসভ্যতা। আমি, দাদা, সমরদা ও রবিকাকা সেজেগুজে রওনা হলাম, সবাই আমরা মনে মনে ভাবছি ইঙ্গবঙ্গের কেল্লায় কী রকম অভ্যর্থনা হবে ভেবে একটু একটু হৃৎকম্পও হচ্ছে, কিছু দূর গেছি দেখি রবিকাকা হঠাৎ এক এক টানে দুপায়ে মোজা খুলে গাড়ির পাদানীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের বললেন, আর মোজা কেন ও খুলে ফেলো; আগাগোড়া দেশী সাজে যেতে হবে। আমরাও তাই করলুম, সেই গাড়িতে বসেই যার যার পা থেকে মোজা খুলে ফেলে দিলুম। পার্টি বেশ জমে উঠেছে, এমন সময়ে আমরা চার মূর্তি গিয়ে উপস্থিত। আমাদের সাজসজ্জা দেখে সবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, কেউ আর কথা কয় না। অনেকে ছিলেন আমাদের বিশেষ বন্ধু—আমাদের পরিবারের বন্ধু। কিন্তু সবাই গম্ভীর মুখে ঘাড় সোজা করে রইলেন, আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন না আর। রবিকাকা চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না।···পরে শুনেছি ওঁরা নাকি খুব চটে গিয়েছিলেন, বলেছেন, এ কী রকম ব্যবহার, এ কী অসভ্যতা, লেডিজদের সামনে দেশী সাজে আসা তার উপর খালি পায়ে, মোজা পর্যন্ত না, ইত্যাদি সব। সেই যে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল, তা আর ঘুচল না। কিছু কাল বাদে দেখি বাইরেও সবাই সেই সাজ ধরতে আরম্ভ করেছে। এমন কি বিলেত-ফের্তারা ক্রমে ক্রমে ধুতি পরতে শুরু করলে। আমাদের কালে বিলেত-ফের্তাদের নিয়ম ছিল ধুতি বর্জন করা। আমাদের তো আর কিছু ছিল না, ছিল কেবল মোজা, তাও সেই মোজা বর্জন করলুম আর ধরিনি কখনো। দেখো দিকিনি, এখনো বোধ হয় রবিকাকা মোজা পরেন না। ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল কংগ্রেস থেকে। রবিকাকাই বললেন, কংগ্রেসকে ন্যাশনালাইজ করতে হবে। কলকাতায় যেবার কংগ্রেস হয়, দেশবিদেশের নেতারা এসেছিলেন অনেকেই। কর্তাদের শখ হল এইখানেই সেই অতিথি অভ্যাগতদের একটা পার্টি দিতে হবে। ঠিক হল সবাই ন্যাশনাল

ড্রেসে আসবে। আমি বলি সে কী করে হবে। রবিকাকা বললেন, না, তা হতেই হবে। তিনি নিমন্ত্রণপত্রে ছাপিয়ে দেওয়ালেন : all must come in national dress. তাতে একটা বিষম হৈ চৈ পড়ে গেল ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চাঁইদের মধ্যে।

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, বাড়ির গিন্নী থেকে চাকর-বাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হত। ছোটো ছোটো গামছা ধুতি তৈরি করে মা আমাদের দিলেন। সেই ছোটো ধুতি হাঁটুর উপরে উঠে যাচ্ছে, তাই পরে আমাদের উৎসাহ কত।”

শিক্ষিত বাঙালীর সংকোচ এমনি করেই ঘুচতে লাগল। মাথায় তুলে নিল মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়।

স্বদেশী আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সমস্যা একাধিক। বাধা অগণিত। প্রথমত কাপড় কই? কাপড় তৈরির সুতো কই। স্বদেশীস্মৃতিতে মতিলাল লিখছেন—

“স্বদেশীবস্ত্র সরবরাহ একদিনের কথা নহে, বাংলায় তখন কাপড়ের কল ছিল না ; কাজেই বোম্বাই কলওয়ালারা বাঁচিয়া গেল দেশী মিলের ছাপ দিয়া বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বিলাতী বস্ত্র চালাইতে লাগিল। নেতারা পরীক্ষা করিয়া যে দোকানে স্বদেশী মিলের কাপড় পাওয়া যায়, তাহার নির্দেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু চাহিদার সংখ্যা সেদিন যে অসংখ্য! স্বদেশীর নামে বিলেতী বস্ত্রও সমানভাবে বিক্রিত হইতে লাগিল। মাড়োয়ারীর কাপড়ের গুদামেও ধুম পড়িয়া গেল ; গাঁট হইতে কাপড় ফাঁড়িয়া, মার্কা উঠান ও নূতন ছাপ দিয়া বাজারে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা অবাধেই

চলিল। এই সময়ে দেশনেতা শ্রীযুক্ত যোগেচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন করার অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য। ইহার চেষ্টায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে এক স্বদেশীশিল্পের প্রদর্শনী হইয়াছিল। বয়কট আন্দোলন হওয়ামাত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে স্বদেশজাত বস্ত্রশিল্পের প্রসারতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতার স্থানে স্থানে "ভারত ভাণ্ডার" নামক দোকান যোগেশ-বাবুর তত্ত্বাবধানে খোলা হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশী বস্ত্র বলিতে বোম্বাই মিলের কাপড় আর হাওড়া, ধনিয়াখালি, হরিপাল, কৈকালা প্রভৃতি স্থানের জোলা তাঁতিদের তাঁতের বস্ত্র ভিন্ন তখন তাঁত চরকার কথাই ছিল না; সুতরাং বিলাতী সূতায় দেশী মিল ও তাঁতের কাপড়ই আমরা স্বদেশী বলিয়া খরিদ করিতাম।......

এই সময়ে মিঃ হ্যাভেল ও চ্যাটার্টন ঠক্‌ঠকি তাঁত চালাতে পারিলে বস্ত্রোৎপাদন সহজ হইতে পারে, এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। নির্দেশ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা সেদিন এমনই উদ্যত ছিল, পরিণাম চিন্তা অনাবশ্যক হইল, ঠক্‌ঠকি তাঁত ঘরে ঘরে বসিল। সূতার ব্যবস্থা না করিয়া স্বদেশীবস্ত্র কি ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, সে কথা তখন ভাবিবার প্রয়োজন হয় নাই; জাতির পীড়িত প্রাণশক্তি নূতন স্বাস্থ্য ও উদ্যম লাভের সুযোগটুকুতে মুক্তি চাহিয়াছিল, তাই ঘরে ঘরে ঠক্‌ঠকি তাঁতের ব্যবস্থা হইল। দেশের শ্রমজীবীরা ভদ্র স্বদেশী কর্মীদের জীবনের উপর ভর করিয়া দুই পয়সা উপার্জন করিয়া লইল। তাঁত চলে নাই, উত্তেজনার সাড়া তুলিয়াছিল মাত্র।"

সুতরাং স্বদেশীর সমস্যা সেই এক জায়গায় আবদ্ধ। কাপড়ের চাহিদা যতো, চালান তার তুলনায় ঢের কম। তার উপর আবার কিছু কিছু দোকানদার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না।

চড়া দাম হাঁকিয়ে স্বদেশী কাপড় বেচে মুনাফা বানাতে লাগল। প্রতিকার কি? এ্যান্টি সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা বললে, আমরা আছি। আমরা কেনা দামে ঘরে ঘরে ফিরি করে বেড়াবো স্বদেশী কাপড়। প্রত্যেক কাপড়ে নির্দিষ্ট দাম থাকবে লেখা আর থাকবে সোসাইটির ছাপ। আমরা ছড়িয়ে যাব শহরে, গ্রামে, হাটে, বাজারে।

সেখানেও বাধা। গ্রামের হাটের মালিক হল জমিদার। আর অধিকাংশ জমিদারের টিকি বাঁধা সরকারের কাছে। সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা টঁ্যা-ফোঁটি করতে রাজী নয়। অবশ্য সব জমিদারই রাজভক্ত নয়। রাজদ্রোহীও আজে একাধিক। তবে যেখানে বাধা-বারণ, নিষেধের নির্দেশ, সবার আগে স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই-খানেই যাবে ঘরে ঘরে। যার যা প্রয়োজন তার তালিকা নেবে লিখে। নিজেরাই সে-সব কিনে পৌঁছে দেবে যথাযথ জায়গায়।

গ্রামের সাধারণ স্তরের মানুষ সত্যিই একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলে এই অভাবনীয় কাণ্ড। মাইলের পর মাইল হেঁটে স্কুলের ছেলেরা কাঁধে ঘাড়ে মোট বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে বাড়ির দরজায়। সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলল এই দৃশ্য। দীক্ষা দিল স্বদেশী সহনশীলতার।

বাঁকুড়ার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা ঘোষণা করলে, যে ব্যবহার করবে বিলেতী চিনি, ১০০ টাকা জরিমানা তার।

বীরভূমের এক জনসভা। আরম্ভেই যজ্ঞাগ্নি জ্বলে উঠল বিলেতী সিগারেট পুড়িয়ে, তারপর সভায় স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা শপথ নিলে যে-সব বাড়িতে বিলেতী নুন আর চিনি ব্যবহার করা হবে, সে-সব বাড়ির ক্রিয়াকলাপে তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন না।

দিনাজপুরের ডাক্তার, উকিল, মোক্তাররা এক জনসভায় স্থানীয় মাড়োয়ারীদের জানিয়ে দিলে তারা যদি বিদেশী জিনিস কেনা-বেচা করে, তাহলে তাদের 'কেস' তাঁরা কেউ গ্রহণ করবেন না।

জলপাইগুড়িতে বহ্নিউৎসব। পুড়ছে বিলেতী সিগারেট, ক্রিকেট ব্যাট, ফুটবল, বিলেতী কাপড়। সেই সঙ্গে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা। এসবের সঙ্গে চলেছে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং। যে সব দোকানে বিলেতী জিনিস বেচা-কেনা, সেখানেই দরজার সামনে দল বেঁধে অবস্থান। অবশ্য সব সময়েই চেহারাটা শান্তিপূর্ণ থাকতো না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে প্রাণ-শক্তি উঠেছে জেগে দুর্বার বেগে, তা সব সময়েই অনাদর অপমান অত্যাচারের কাছে বিনীত হয়ে থাকতে পারে না। প্রতিপক্ষের উস্‌কানি পেলে তা যদি কখনো কখনো দুর্বিনীত দুঃসাহসী হয়ে ওঠে, সেটা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য তার জন্যে পুলিস সদা প্রস্তুত। পিঠে পড়তো রেগুলেশন লাঠির মার। সরকারী পরিভাষায়, A mild lathi-charge. লাঠির মারেও যখন দেখা যেত স্বেচ্ছাসেবক ও সত্যাগ্রহীর দল তাদের সংকল্পে স্থির, অবিচলিত, অনড়, তখন কোমরে পড়তো দড়ির ফাঁস। অতঃপর থানায় চালান। সব সময়ে স্বেচ্ছাসেবকদেরই যে শুধু ধরে নিয়ে যাওয়া হতো তা নয়, ধৃত আসামীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হত সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শক ও নির্বিরোধী পথচারীরাও। ওরপর শুরু হত বিচারের প্রহসন। তাদের বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ, তারা শান্তিপ্রিয় নাগরিক জীবনে বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী। মামলায় যারা শান্তিপ্রিয় নাগরিকরূপে স্বাক্ষ্য দিতে আসতেন, তাঁদের অধিকাংশই কর্তৃপক্ষের সাজানো, ভয় দেখিয়ে, অথবা ভবিষ্যতে ভয়ের কারণ ঘটতে পারে এমনি ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে। কিছু লোককে ডাকলেই পাওয়া যেতো যারা সাহেব জাতের মোসাহেব। এই সব সজ্জিত শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা এসে স্বাক্ষ্যদান করে বলতেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার, এইসব অপরাধীদের আমরা দেখেছি অনাসৃষ্টির ঘোঁট পাকাতে'। ব্যস্। কারো কারাবাস, কারো জরিমানা।

বিচারকদের মধ্যে সকলেই বিদেশী নন। খাঁটি দেশীয়র সংখ্যা

ছিল একাধিক। তাঁরা জানতেন কি সুকৌশল ছলনা দিয়ে গড়া এই মিথ্যা-বিচারের অভিনয়। কিন্তু তাঁদের যে রয়েছে প্রাণ-ধারণের দায়। বিচারে যদি শাস্তি না পায় কেউ, তাহলে যে প্রমাণিত হবে শাসক হিসেবে তাঁদের অযোগ্যতা, অপদার্থতা। তখন কেড়ে নেওয়া হবে পদোন্নতির মই। No convictionএর পরিণাম একটাই, No promotion. সেজন্যে কখনো কখনো কৃত্রিম ভাবে জনতা পুলিস সংঘর্ষ তৈরি করতে হয়েছে জেলা শাসকদের। বিশেষ করে সেই সব জেলায় যেখানে ক্রমাগত অধঃপতনের পথে গড়িয়ে চলেছে বিলেতী দ্রব্যের বিক্রির হার।

নিরীহ দেশবাসীর মনে অহরহ সরকারী শাসনযন্ত্রের ভয়াবহ অস্তিত্বের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে একটা ত্রাসের আবহাওয়া জাগিয়ে রাখাই সে আমলে ছিল আমলাদের প্রধান কাজ।

সরকারী নির্যাতন বেড়ে চলেছে যত, বেড়ে চলেছে ততই দেশবাসীর ধনুক ভাঙা পণ। বয়কটকে দেবো না ব্যর্থ হতে। সার্থক করতে হবেই স্বদেশী মন্ত্রকে।

বিপিনচন্দ্র এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, যাঁরা বিলেতী বিলাসী, তাদের সমাজে করা হবে একঘরে।

এ এক ভয়াবহ শাস্তি। এখানে সরকারের মাথা গলাবার কোন উপায় নেই প্রতিবিধানের জন্যে।

মতিলালের স্বদেশী স্মৃতি অনুযায়ী "বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করা ক্রমে আতঙ্কের বিষয় হইল। পথে ঘাটে বিলাতী কাপড় কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে শতকরা ৯০ জন লোক তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যেই অধিক উৎসাহ দেখা যাইত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিতে এক প্রকার সকলেই বাধ্য হইয়া পড়িত। ট্রামে, রেলগাড়িতে, ষ্টীমারে পরস্পর পরস্পরের পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি রাখিত; বিদেশী বস্ত্রের পরিচ্ছদ কাহারও অঙ্গে দেখিতে পাইলে, তাহার আর লাঞ্ছনার

সীমা থাকিত না। দেশমাতৃকার আদেশ লঙ্ঘনকারী দেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইত।

প্রসঙ্গচ্ছলে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। হাওড়া হইতে রেলগাড়ি ছাড়িবামাত্র, একটি কামরায় কোন ভদ্রলোককে white-way laid law কোম্পানির দোকান হইতে একটি ইস্ত্রি করা জামা খরিদ করিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। সহযাত্রীরা বার বার কটাক্ষপাত করিয়া, প্রথম তাকে জিজ্ঞাসা করিল—কেন সে বিলাতী জামা খরিদ করিয়াছে। দেশের বাণী অবজ্ঞা করার এই অপরাধের কঠিন শাস্তির ফলও তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ভদ্রলোক অনেক তর্ক করিল। গাড়ির সমস্ত লোক একপক্ষে, অন্য পক্ষে সে একা, তাহার অপমানের সীমা রহিল না। হাওড়া হইতে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত সে লোকের নিকট হইতে অবশেষে লাঞ্ছনা সহিয়া পরিশেষে ধৈর্যহীন হইল, নিজের জামাটি ক্রোধে, দুঃখে টুকরো টুকরো করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে এই জয় সেদিন বড় গর্বের ছিল, ভদ্রলোক যখন শপথ করিল, আর কখনও সে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না, "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। দুইদিন পরে এই ঘটনার কথাও সংবাদপত্রের স্তম্ভে বাহির হইল।"

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ী মহলে দেখা দিতে শুরু করল সকরুণ বিলাপ। তাদের বুঝি বিলোপ হবার দশা।

নেভিনসন লিখেছেন, একদিন মধ্যরাত্রে কয়েকজন ব্যবসায়ী গোপনে তাঁর কাছে উপস্থিত। মাঞ্চেস্টার কাপড়ের বিরাট ব্যবসা তাদের। হাজার হাজার টাকার কারবার। এখন নাপিত বলছে চুল দাড়ি কামাবে না। গোয়ালা বলছে দুধ দেবো না। আত্মীয়রা বলছে মেয়ের বিয়েতে আসবে না। পাড়া প্রতিবেশীরা বন্ধ করেছে কথা বলা অথচ তারা ঐ সব মহামূল্য সংগ্রহ স্বদেশীর আগুনে

পুড়িয়ে ফেলতে অপারগ। তার জন্যে যদি মারা পড়তে হয় সেও ভাল। এখন তাদের রক্ষার জন্যে সরকার কিছু করতে পারে কিনা এইটেই অনুরোধ।

মাড়োয়ারী চেম্বার্স অব কমার্সের টেলিগ্রাম ছুটছে বিলেতে, ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার্স অব কমার্সের কাছে। তাতে সানুনয় নিবেদন, যত শীঘ্র সম্ভব বাংলা বিভাগ বন্ধের ব্যবস্থা না করলে ব্যবসাপত্র সব ডকে উঠবে। সামনে দুর্গাপুজো। কিন্তু বিলেতী কাপড় একখানাও বিক্রি হবে কিনা সন্দেহ।

এদিকে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে বাংলাদেশের ইউরোপীয়ান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও।

"বয়কট-এর পরিণাম ভয়াবহ। জুতোর বিক্রি নেই। টুপি, গেঞ্জি অন্যান্য হোসিয়ারী জিনিসের সেই অবস্থা। দোকানে খোদ্দেরের ভিড় নেই বহুকাল। এখন ইংলিশ আর কন্টিনেন্টাল এই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সমস্ত জিনিস। জাপানীরা বেশ ভালই ব্যবসা করছে কম দামে জিনিস বেচে। একটা ফার্ম বিলেতী লেবেল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে নতুন লেবেল 'মেড ইন জার্মানী' লাগিয়ে বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে।"

স্বদেশী আন্দোলনের একদিকে যেমন এই বিলাপ, অন্যদিকে তেমনি আর এক বিকাশ। স্বদেশীর আহ্বানে পশ্চিম ভারতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বস্ত্রবয়নের কল। বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে 'বঙ্গলক্ষ্মী' আর 'মোহিনী' মিল। বোম্বাই আমেদাবাদে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাঁতের সংখ্যা। ১৯০৫-এ এক বছরে বার হাজার তাঁত বেড়েছে, তবু স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা মেটে না।

সুতরাং স্বদেশী সেদিন শুধু উচ্ছ্বাস নয়, শুধু অগ্ন্যুৎপাত নয়, বিপুল বিশাল সৃষ্টির উদ্যম।

দেশে দেশী বস্ত্রের চলন বাড়তে লাগল একটু একটু করে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা লাভের গুড় ছাড়তে রাজী নয়। স্বদেশী

আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে দেশী কাপড়েরও হাঁকাতে লাগল চড়া দাম। এখন কি হবে? নেতারা ঠিক করলেন, স্বদেশী স্বেচ্ছা-সেবকরা নিজেরাই কেনা বেচা করবে দেশী জিনিস, বাড়ি বাড়ি গিয়ে। কানাকড়িও লাভ না রেখে।

সিদ্ধান্তটা নেওয়া হল সোমবার, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মিটিং-এ। পরের দিন মঙ্গলবার ভোর হতে না হতেই এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির পাণ্ডা রমাকান্ত রায় তাঁর অনুচরদের ডেকে বললেন—চলো।

কোথায়?

আজ হাওড়ার হাট। ৬০ টাকা পুঁজি। নিজেরা গিয়ে কাপড় কিনে আনবো। দেখা যাক পরীক্ষা করে।

যেমন কথা তেমনি কাজ।

রমাকান্তের কাপড় কেনার অভিজ্ঞতা নেই। কেনার আগে অন্যদের দর-দস্তুর করার ধরন-ধারণ সব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এবার শিখেছি। ঠিক কিনতে পারবো।

কেনা হল। কিন্তু এখন এত কাপড় বইবে কে? কুলি ডাকো। কুলি ডাকো। রমাকান্ত বললেন—

কুলি কি হবে। অনর্থক মুটে ভাড়া দিয়ে কাপড়ের দাম বাড়াবে কেন? এসো, নিজেরাই বয়ে নিয়ে যাই।

প্রথম বোঝা রমাকান্তই তুলে নিলেন মাথায়। অগত্যা অনুচরদেরও অনুকরণ ছাড়া গতি নেই।

কলকাতায় পৌঁছে নিজেই মোট মাথায় নিয়ে রামাকান্ত বাড়ী বাড়ী কাপড় ফিরি শুরু করে দিলেন। পিছনে গানের দল। গাইছে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'।

অবাক কাণ্ড! তিন ঘণ্টায় সব কাপড় শেষ। এতটা সাফল্য কেউই আশা করেনি। বহু খদ্দের ফিরে গেছে বিফল মনোরথে। তা হলে? আরও কাপড় চাই। চাই তো বটে, কিন্তু পাই

কোথায়? হাট তো উঠে গেছে কখন। অনেক ভেবে রমাকান্তই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি বাতলালেন।

দেখ, হাওড়ার হাটে যারা দূর থেকে কাপড় নিয়ে আসে, তারা বড়বাজারে দু'একদিন অপেক্ষা করে। চলো, তাদের খুঁজে বের করি। বের করা হল। আবার শুরু হল বেচা-কেনা।

সতীর্থ শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিতর্পণে' রমাকান্তের এই মুটেগিরীর প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"যেদিন এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটীর কাপড়ের মোট মাথায় বহিয়া আনিবার কথাবার্তা হইতেছিল, সেদিন তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখে এক নবদীপ্তি দেখিয়াছিলাম। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মৃতিপট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না; কারণ সে কথা শিক্ষিত লোকের মুখে সেই প্রথম শুনিয়াছিলাম। আমি সেই কথাগুলি লিখিতেছি। রমাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন—'আমি যখনই শিয়ালদহ স্টেশনে যাইতাম তখনই যাত্রীদিগের প্রতি কুলিদিগের অসম্ভব অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতাম, এবং তাহার মধ্যে প্রায়ই দেখিতাম যে বাবুরা ছোট একটি ব্যাগ বা ছোট একটি পুঁটলী যাহা একজন ভদ্রলোক অনায়াসে হাতে কারিয়া লইয়া যাইতে পারেন তাহাই কুলির মাথায় দিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং দুআনার জায়গায় চারি আনা আক্কেল সেলামী দিয়াও বিস্তর কটুবাক্য শুনিয়াও বাবুগিরি বজায় রাখিতেন। সেই দিন হইতে আমার মনে হইত, কেমন করিয়া মিথ্যা সম্মান লাভের এই ভ্রান্ত ধারণা লোকের মন হইতে দূর করিয়া দিব। শেষে জাপানে গেলাম। সেখানে দেখিলাম সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোক শারিরীক পরিশ্রম করাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন না; কিন্তু আমাদের দেশের লোকের মধ্যে এমনি ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায় যে, যে লোক দশ টাকা মাহিনার চাকুরীর জন্য যাহার তাহার পাদুকা স্পর্শ করিতে প্রস্তুত, সেই বাজার হইতে ডাঁটা গাছটি হাতে করিয়া

বাড়ী ফিরিতে পারে না, কারণ সে যে ভদ্রলোক—এ কাজ করিলে যে তাহার সম্মান নষ্ট হইবে।……এক এক সময় মনে হইত শিয়ালদহ স্টেশনে যাইয়া কোট প্যাণ্টালুন পরিয়া ভদ্রবেশেই কুলির কাজ করিব, দেখি যদি তাহাতে বাবুদের ভ্রম কাটিয়া যায়। আজ আমার সেই আশা ফলবতী হইয়াছে, ভদ্রবেশে কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার পথে পথে ফেরী করিয়া বেড়াইব এবং দেশের লোকের নিকট এক নূতন আদর্শ দেখাইব। সেই দিনই সোসাইটীর সভ্যেরা কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া প্রথম মহানগরীর বিস্ময়মুগ্ধ জনমণ্ডলীর নিকট মুটের কাজ করিতে বাহির হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদাধিকারী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্র সন্তানেরা যেদিন কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া লইলেন, সে দিন বুঝিলাম যে আমরা শুধু কাপড়ের মোটই কাঁধে লইলাম না, আমাদের দেশের মোটও মাথায় করিয়া লইলাম।"





স্বদেশীয়ানার ঝড় উঠেছিল ১৯০৫-এ। আবীর রঙের আকাশের নীচে আবীর রাঙা রক্তের স্পন্দন বেজে উঠেছিল ঝনঝনিয়ে। পেশীতে পেশীতে পড়েছিল টান। চোখে বিদ্যুতের মতো লকলকে চাউনি। বুকে বজ্রের বিশাল ঝঙ্কার।

কিন্তু এই ঝড় সহসা আকাশ ছেয়ে একদিনে জেগে ওঠে নি। সর্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে গোপনে গোপনে চলেছিল এর প্রস্তুতি পর্ব। আকাশের বুকে মেঘ, মেঘের বুকে বজ্র, বজ্রের বুকে জ্বলে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিচ্ছিল ধীরে ধীরে। আগ্নেয়গিরি একদিনে বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু তার বুকের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে জমে আগ্নেয় বিক্ষোভ, পাথর ফাটিয়ে অগ্নি স্রোতের উজান বইয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে বলে।

১৯০৫-এর ঝড় বহুমুখী। তারই একটা হল জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন। আরেকটা গুপ্ত সমিতি গড়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। ১৯০১। রবীন্দ্রনাথ "ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়" স্থাপন করলেন শান্তিনিকেতনে। প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের আদর্শে। বিদ্যা যেখানে বোঝা নয়। চিন্তার সঙ্গে কল্পনার, কথার সঙ্গে কাজের, জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন ঘটবে সেখানে। ইংরেজী শাসনের আওতায় যে শিক্ষার ধারা বইছে সারা দেশে, সেটা প্রধানত বিজাতীয়। দেশের অন্তরে ব্যাপক

জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার পথে সেটা প্রচণ্ড অন্তরায়। তাতে বড় চাকুরী জোটে কপালে। ললাটে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের জয়তিলক জোটে না। তা ছাড়া সেখানে বিদ্যার সঙ্গে নেই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা। ভাষাটা বিদেশী। সুতরাং মুখস্থই বিদ্যায়ত্তের প্রধান অবলম্বন। এতে কি হয়? রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—কি হয় না তারই।

"আমরা বাল্য হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পিঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না।"

মনুষ্যত্বের সেই সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই চাই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি। তারই নিদারুণ অভাববোধকে পূরণ করার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ খুললেন বিদ্যালয়। এ বিষয়ে তাঁর সহায় হলেন ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়। উপাধ্যায় তখনও বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হন নি। একদিকে বেদ-বেদান্ত অন্যদিকে রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন। বিদ্যালয় খোলা হল।

ব্রহ্মবান্ধবের ভূমিকাটা অনেকটা পরিচালকের মতো। আসল শিক্ষক রেবা চাঁদ। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দৈনিক পাঠ্যসূচী এবং কর্মসূচী ছিল বিচিত্র।

"প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ছেলেরা ঘর ঝাঁট দিত; প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিত—ব্রাহ্মণ ছেলেদের সাদা রেশম, কায়স্থ ও বৈদ্য ছেলেদের লাল রেশম এবং বৈশ্য ছেলেদের হল্‌দে রেশমের পোশাক। এক একটি রং এক একটি জাতের নিশানা। তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র তরু তলে বসিয়া সংস্কৃত প্রার্থনা করিত। প্রাতঃরাশের পর তাহাদের আধ-ঘন্টাকাল ভূমি কর্ষণ করিতে হইত। ইহার পর

৭টার সময় পাঠারম্ভ, ১০টায় পাঠ শেষ; এক-ঘন্টাকাল আমোদ প্রমোদ, ১১-৩০ মধ্যাহ্ন ভোজন, ১২-৩০ পুনরায় স্কুল, ৪-৩০ ছুটি। ইহার পর খেলাধূলা, ৬-৩০ পর্যন্ত সান্ধ্য উপাসনা, সংগীত শিক্ষাদির পর নৈশ ভোজন, ৯ টায় নিদ্রা— এই নিয়মে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সকল কার্য সমাধান করিতে হইত।"

ব্রহ্মবান্ধব বেশীদিন এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলেন না।

১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্মশানে প্রজ্বলিত চিতাগ্নির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব নতশিরে, ধ্যানমগ্ন। এই সময় কে যেন তাঁর কানে কানে অদৃশ্য দৈববাণী শোনালেন—"তুমি, তোমার যতটুকু শক্তি আছে, তাই দিয়া বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গী জয় ব্রত গ্রহণ কর।"

এক হাতে কম্বল। আর এক হাতে কমণ্ডলু। সন্ন্যাসীর সর্বরিক্ত বেশ। ১৯০২-এর ৫ই অক্টোবর ব্রহ্মবান্ধব পাড়ি দিলেন বিলেতে। হিন্দুধর্ম, হিন্দু দর্শনের জয়ধ্বজা উড়িয়ে, জয়ধ্বনি জাগিয়ে আসতে হবে সেখানে।

১৯০২-এ জন্ম নিল 'ডন সোসাইটি'। প্রতিষ্ঠাতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সেই চরম সংকটের দিনে সতীশচন্দ্র এগিয়ে এলেন পরিত্রাতা রূপে। 'ডন সোসাইটি' হল স্বদেশ সেবার পাঠশালা। তখন স্বদেশী আন্দোলন সুদূর স্বপ্ন। 'ডন সোসাইটি' এগিয়ে এল সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। সোসাইটি চাইল দেশাত্মবোধ, দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার, দেশের স্বাবলম্বন, দেশে পুঁথির শিক্ষার সঙ্গে হাতে কলমে কাজ।

সোসাইটির সদস্যরা পরেন মোটা স্বদেশী কাপড়। শুধু পরা নয়, অন্যকে পরানোর জন্যে ফেরি করে বেড়ান। সোসাইটির ঘরে তাঁত। বোনা হচ্ছে গামছা চাদর। চেষ্টা চলছে দেশলাই তৈরির, যা থেকে আগুন জ্বালানো যাবে সারা দেশে, পরাধীনতার

অন্ধকারে।১ প্রকাশিত হচ্ছে নিজেদের মুখপত্র 'ডন'। স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী মন তৈরিই তার প্রত্যেকটি লেখার পিছনের উদ্যম। পরের যুগে যাঁরা জাতীয় জীবনের নানান ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন বীর যোদ্ধা রূপে, ডন সোসাইটিতেই তাঁদের বেশীর ভাগের সৈনিক জীবনের শুরু।

বিনয় সরকারের স্বীকারোক্তি—"ডন সোসাইটি ও সতীশচন্দ্রের আবহাওয়ায় পড়েছিলুম বলে জীবন ধন্য হয়েছে।"

একদা-সহযোগী রবীন্দ্রনাথের রচনা—"সতীশবাবু যে সময়ে ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা-সম্পর্কীয় এই National Movement-এরও তখন সূত্রপাত হয় নাই। এমন দিনে সতীশবাবু ধ্রুবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাহিরের উৎসাহ উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্ম সমাজের উল্টোদিক কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের শিবনারায়ণ দাস লেন। তারই ভেতরে ছাত্রদের একট মেস। সেই মেসের দোতলায় 'ডন সোসাইটি। একতলায় 'ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব'। সামনে প্রশস্ত প্রসিদ্ধ 'পান্তির মাঠ'।

শুরুর দিন থেকেই 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নিবেদিতা। 'ডন' পত্রিকার ছিলেন লেখিকা। 'ডন সোসাইটি'তে বক্তা। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন, ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মহান সংস্কৃতি, যার তিনি আজীবন অনুরাগিণী।

'ডনে'র শিক্ষানীতির মূলে ছিল ভাগবদ্‌গীতা। গীতার উপরে ভাষণ দিতেন স্বামী সারদানন্দ।···নিবেদিতা শুনতে যেতেন। ছেলেরা তাঁকে ঘিরে জানতে চাইতো, কেমন লাগল।

'একদিন বললেন, আমি নিজে গীতা থেকে কি পেয়েছি, শুনবে? বিবেকজ্ঞান। একটি গুটিপোকা আর মানুষকে গীতা

সমপর্যায়ে ফেলে নি। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছে উভয়ের মধ্যে একই সম্ভাবনার বীজ রয়েছে, আর তাই একই আশা লালন করতে উভয়কেই প্রোৎসাহিত করেছে।

নিবেদিতা ছিলেন ডন সোসাইটির 'brain-trust'. "নিবেদিতার সাদা রঙ আর চেহারায় কিছুটা পরুষ-কঠিন ধাঁচ দেখে ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'ধবলগিরি'। তাঁর সাদা চামড়া তাদের কাছে যেন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম। নীল চোখ দুটিও তাই, কিন্তু তাতে নির্মমতার আভাসমাত্র ছিল না। দুটোই একরকম মেনে নিয়েছিল ছেলেরা। নিবেদিতা তো 'মেমসাব' নন, তিনি তো সবার বোন। সতীশ মুখজ্যেকে সবাই গুরুর মতো মান্য করতো, নিবেদিতা তো তাঁরই সগোত্র। নিবেদিতার কোনও সমালোচনা কেউ সইতে পারত না তারা।"

নিবেদিতা বলতেন—"এমন মানুষ চাই যারা রূঢ় বাস্তবের সামনে তাল ঠুকে দাঁড়াতে পারে, আত্মবিসর্জনের মাঝেই রুদ্রের দক্ষিণ মুখকে দেখতে পায়। তোমাদের আরাধ্য দেবী ভারতমাতা। মন্দিরের বেদিতে ফুলপাতা সাজিয়ে আর ধূপধুনা জ্বালিয়ে তাঁকে পাবে না, তিনি আছেন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে ও দারিদ্র্যের তাড়নায়। তোমার আত্মাহুতিতেই তাঁর আবির্ভাব।"

বলতেন—"আসল ভারতবর্ষকে যদি চিনতে চাও, আকবর ও অশোকের মতো স্বপ্ন দেখ। বই পড়ে দেশপ্রেম শেখা যায় না।"

'ডন সোসাইটি'তেই তাঁর একবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'পরিবার না দেশ'? তপস্বিনীর মুখে তেজস্বিনী ভাষা।

"আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় দাবি কার? পরিবারের না দেশের? শেষের কথা অর্থাৎ দেশের কথাতেই আমাদের উত্তর নিহিত, খুব বেশী না ভেবেও এ-উত্তরটা দেওয়া যায় অনায়াসে। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের পরিবার বা সংসারের কাছে ঋণী। তেমন আমাদের প্রত্যেকটি পরিবার ঋণী

দেশের কাছে। এটা ঠিক পৃথিবীতে আমাদের জন্ম দিয়েছে আমাদের পিতা-মাতা। তেমনি এটাও ঠিক তাঁদের প্রতিপালিত করেছে আমাদের এই দেশ। ...সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তিত জগতের সঙ্গে আমাদের সংগতি রেখে চলতে হবে। সমাজের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার নিছক ভাবাবেগের ব্যাপার নয়। এটাকে জীবনের স্থায়ী নির্দিষ্ট আচার-আচরণের মতো অঙ্গীকৃত করে নেওয়া প্রয়োজন। জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে প্রাণে প্রাণে, তীব্র বেগে। কারণ তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যে বিরুদ্ধ শক্তি প্রতি মুহূর্তে উদ্যত। জাতীয়তা-বোধকে বিকশিত করে তুলতে হলে আজ সকলের আগে ভারতবর্ষের প্রয়োজন একদল কর্মী যারা পরিবারের সীমানা ডিঙিয়ে এগিয়ে আসবে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতে। শুধু আধ্যাত্মিক নিষ্ক্রীয় নিরস্ত্র প্রতিরোধ নয়, কালের আহ্বান, মায়ের বেদীতলে উৎসর্গ করতে হবে জীবনের সমস্ত কিছু, যে মায়ের দান আমাদের পরিবার, আমাদের দেশ।"

জন্মের বিচারে বিদেশিনী। কিন্তু মর্মের বিচারে যেন ভারত-আত্মার প্রতিমা। যেন জন্ম-জন্মান্তর লালিত এই ভারতের আকাশ মাটি জলের অবিরল স্নেহে, গীতা, বেদ-বেদান্ত উপনিষদের অবারিত দাক্ষিণ্যে।

বাইরে সন্ন্যাসিনীর আবরণ। ভেতরে আচরণ, সংহারিণীর। বাইরে যোগী। ভিতরে বজ্রযোগিনী।

'ডন সোসাইটি'তে তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে কেউ কেউ না বলে পারত না—"ঋষিদের কথা তো শুনেছি, নিবেদিতা যেন তাঁদের একজন। কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে পশ্চিমের প্রাণ আর স্বাতন্ত্র্যের বীর্য নিয়ে ফিরে এনেছেন তাঁর আপন ঘরে।"

সত্যিই ভারতবর্ষ তাঁর আপন-ঘর।

"জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা

তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। ...বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা।" এই শ্রদ্ধা নিবেদন কবিগুরুর।

"ভারতবর্ষকে বিদেশী সত্যিই যাঁরা ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয় বড়।" এই শ্রদ্ধা-নিবেদন শিল্পগুরুর।

তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে এঁকেছেন নিবেদিতার ছবি। তাঁর তুলিতে আঁকা 'উমা'র মতো এ যেন আরেক তপস্বিনীকে গড়ে তোলা, কালির আঁচড়ে।

"কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।

আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজ-রাজড়া, সাহেব-মেম গিসগিস করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব। কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে, ফ্যাশানে, চারিদিক ঝলমল করছে। হাসি, গল্প, গানে বাজনায় মাত। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী রূপালীতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে; কি বলব যেন নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল! সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উডরফ, ব্লাণ্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

সুন্দরী, সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।

নিবেদিতা মারা যাবার পর একটি ফটো গণেন মহারাজকে দিয়ে যোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। লর্ড কারমাইকেল, তাঁর মতো আর্টিষ্টিক নজর বড় কারো ছিল না। —সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'এ কার ছবি?' বললুম, 'সিস্টার নিবেদিতার'। তিনি বললেন, 'এই সিস্টার নিবেদিতা? আমার একখানি এই রকম ছবি চাই।' বলেই আর বলা-কওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাবা করে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।"

সত্যিই বল ছিল তাঁর মধ্যে। আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের বল। তাই বেজে উঠতে পেরেছিল এই স্বগর্ব ঘোষণা—"My role is to awaken the nation.' এই জাতিকে জাগ্রত করাই আমার কাজ।"

মিঃ স্টেড নিবেদিতার বন্ধু। লণ্ডনবাসী। সেখানকার 'রিভিউ অব রিভিউজ' কাগজের সম্পাদক। তিনি নিবেদিতাকে পরামর্শ দিলেন ভারতবর্ষ থেকে একটা কাগজ বার করার জন্যে। নাম হবে 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ'। কথাটা মনে লেগেছিল, মনে সাধও জেগেছিল। প্রত্যুত্তরে তিনি চিঠিতে লিখলেন—"ন্যাশনালিটি কথাটার তাৎপর্য আর অর্থব্যাপ্তি কতখানি, সেইটা ভারতকে জানিয়ে দেওয়াই এখন আসল কাজ। জাতীয়তার বিরাট চেতনা ভারতকে আচ্ছন্ন করে

রাখুক অহর্নিশ। এই বোধে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাবে, একে অন্যকে দেখবে গভীর শ্রদ্ধার চোখে—"

সরকারী শিক্ষা-সংকোচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশ ক্ষুব্ধ। প্রতিবাদ ফুঁসে উঠে সারা দেশে। সেই সময় কার্জন এক বক্তৃতা দিলেন সরকারী ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়ে। যিনি সংহারক, তিনিই সমর্থক। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি হানলেন এক কুটিল কটাক্ষ, ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে। আগুনে ঘি পড়ল। ধিক্কার দিয়ে উঠল বাঙালী। বাঙালী নন, এমন একজন সেই সময়ে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের পত্রপত্রিকাকে যোগান দিতে লাগল ধিক্কারের পক্ষে যুক্তির উপদান, উপকরণ। তিনি নিবেদিতা। সেই সময়ে এক চিঠিতে লিখলেন—"ভারতের পরে অনেক অবিচার হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মনে জ্বালা ধরে এইতে যে, ভারতের ভারত হওয়ার অধিকার এরা কেড়ে নিয়েছে। নিজের জন্য নিজে ভাবতে পায় না এ-দেশ, কিছু জানবার অধিকারও তার নেই। আমার এই নালিশই সবার বড়ো। এ-দেশের অন্ন চাই, সুবিচার চাই, আরও কতকিছু চাই। এসব দাবির কথা ভাবতে গেলেও মন আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু ঐ এক বেদনায় আর সব দুঃখ ছোট হয়ে যায়।"

'ডন সোসাইটি'র ছাত্র বিনয় সরকার। পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ধারালো মানুষ। নিবেদিতাকে দেখেছেন কাছ থেকে। দুর্বিনীত সেই যুগে নিবেদিতার বিনীত ছাত্রদের একজন তিনি। নিবেদিতা "was a guru of the Dawn Society's youngstars"—এ তাঁরই কথা। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' নামের স্বরচিত বইয়ে রয়েছে নিবেদিতার প্রতি তাঁর নৈবেদ্য-নিবেদন।

"তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তা।...নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের গুণগ্রাহী। তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির খবর দিলেন। রমেশ দত্তকে পয়লা নম্বরের স্বদেশ-সেবক তিনি বিবেচনা করেন। অথচ

রমেশ দত্ত উঁচু দরের সরকারী চাকুরে। মনে হল নিবেদিতা লোকগুলোকে বাজিয়ে দেখতে জানেন। আর একটা কথা মনে পড়ছে। নিবেদিতা বললেন, যুবক বাংলা স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্যে তৈয়ার হচ্ছে মাত্র। এখনো দৌড় শুরু করে নি। মন্তব্যটা খুব পাকা মাথা থেকে বেরিয়েছে ভেবেছিলাম। সে কথাটার দাম লাখ টাকা।"

ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার বক্তৃতা বিষয় থাকতো প্রধানতঃ জাতীয়তা শিক্ষা বিষয়ে। তার সঙ্গে থাকত জাতীয়তাবোধ বিকাশের পক্ষে সহায়ক অন্যান্য বিষয়ও। যেমন Indian Nationality, Dynamic Religion, Aggressive Hinduism Nationalism ইত্যাদি। তাঁর মতে জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে উঠবে পূর্ণ জাতীয়তাবোধের ভিত্তি-ভূমির উপর। সেই শিক্ষার মধ্যে এসে মিশবে দেশ, দেশের মানুষ, দেশের শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, কারুকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষের ভিতর-বাহিরের যা কিছু উন্নতি-অগ্রগতি। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারেও তাঁর উদ্যোগ ছিল অসামান্য। অন্তর্জগতের স্নেহময় নম্র কোমলতা নারীত্বের চির সম্পদ। তা হারানোর নয়। তার হানি না ঘটিয়েই নারী-জাতিকে নেমে আসতে হবে কর্মজগতের ডাকে, ত্যাগের, সেবার, সাহসিকতার সহযাত্রিণীরূপে। তাদের প্রেরণা ভারতবর্ষের আদর্শ নারীরা। সতী, সীতা, সাবিত্রী অহল্যাবাঈ, রানীভবানী, ঝাঁসীর রানী। সারা ভারতের তরুণ সমাজের কাছেও তাঁর আহ্বান বেজেছে মন্দ্র রবে, স্বদেশী মন্ত্রের উদ্বোধনে।

কথার যেখানে শেষ, কবিতার শুরু। 'The cry of the mother to the Indian Youth' তার এক কবিতার নাম। তাতে বাঙালী, মারাঠী, রাজপুত, শিখ, মুসলমান, দ্রাবিড় ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যুবককে জমায়েত হবার আবেদন এক ঐক্যে, এক বিশ্বাসে, এক বিপ্লবে।

In your to day all the greatness of the past,
Awake then and arise!
Struggle ye and stop not
Till the goal is reached.

বিনয় সরকারের বিশ্লেষণ "আমার বিশ্বাস তাঁর প্রভাবের প্রধান কারণ স্বাদেশিকতা ও বিপ্লব-নিষ্ঠা। তিনি যুবক-ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।"

কাছে পিঠে বসে নিজের চোখে ঘনিষ্ঠভাবে নিবেদিতাকে দেখা। তাই বিনয় সরকারের উচ্ছ্বাসহীন ভাষায় ফুটে আছে সেই উত্তাপ-মাখানো দেখা-জানা-চেনা দিনের বিবরণী।

"ডন সোসাইটিতে নিবেদিতার ডাক জাতীয় শিক্ষার আদর্শ-মাফিক লেখাপড়ার লাইনে খুব বেশী পড়ত। আমাদের বিচারে তিনি ছিলেন সতীশ মণ্ডলের অন্তর্গত। ...পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমান্টিকতা, ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। ...ভারতীয় নর-নারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কী খাওয়ার মতন সোজা কাজ ছিল। ...কোনো স্বদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নর-নারীর জীবনকথা এত গভীরভাবে বুঝতে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। ...আমার বিশ্বাস তাঁর প্রভাবের প্রধান কারণ স্বাদেশিকতা ও বিপ্লব নিষ্ঠা। দ্বিতীয় কারণ তাঁর গবেষণা-শক্তি, সংস্কৃতি-বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আর ইংরেজী রচনার কৌশল। এই দুই কারণে বহু সংখ্যক যুবা নিবেদিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছে। ...জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর অতি আত্মীয় ছিলেন। যদুনাথ সরকার আর ব্রজেন শীলও নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন।"

ঐ ডন সোসাইটিরই এক বক্তৃতায় গীতার আলোচনা করতে গিয়ে নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন—When will arise then the

veritable fighter in the good cause again, with the Geeta in the one hand and the sword in the other ?" কবে আমাদের দেশে আবির্ভূত হবেন সেই উদ্ধার কর্তা যোদ্ধা, যাঁর একহাতে গীতা, অপর হাতে তলোয়ার ?

উত্তর পেতে নিবেদিতার খুব বেশী দেরি হল না।

১৪বছর বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরছেন অরবিন্দ। কেম্ব্রিজের উজ্জ্বল ছাত্র। বাবার গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর ছেলে হবে সুদক্ষ দেশ-শাসক, নামজাদা আই. সি. এস। কেম্ব্রিজে গ্রীক আর লাতিনে রেকর্ড মার্ক। হতে বাধা কি ? তবু তা হল না। বিধতার চক্রান্তে নয়, আশীর্বাদে।

কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের ছিল একটা বিতর্ক সভা। নাম Indian Majlis. নানা বিষয়ের আলোচনা হয় সেখানে। রাজনীতি তার মধ্যে অপাঙক্তেয় নয়। রাজনীতি চর্চা ভালো। কিন্তু সেটা যদি হয় বিশেষ করে ভারতের রাজনীতি, ভারতের শাসন-সংস্কার, শাসক ইংরেজজাতের গায়ে চিমটি কাটা সমালোচনা—বলা বাহুল্য ইংরেজ জাত সেটাকে দয়ালু বিদ্যাসাগরের নেমন্তন্ন বাড়িতে আরশোলা খেয়ে ফেলার মতো নিঃশব্দে হজম করবে না। অরবিন্দের সেটাই অপরাধ। তারই শাস্তিতে প্রমাণিত হল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীরূপে তাঁর অযোগ্যতা। অজুহাত তিনি ঘোড়ায় চড়তে অপরাগ। লেখাপড়ার পালা শেষ। লণ্ডনে কাটছে উদ্দেশ্যহীন জীবন। এই সময়ে পরিচয় ঘটে গেল বরোদার মহারাজার সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ চাকরির প্রস্তাব। মাসে দুশো টাকা মাইনে। রাজস্ব বিভাগের চাকরি। রাজী ? রাজী। অরবিন্দ দেশে ফিরলেন। বয়স তখন একুশ।

সেটা ১৮৯৩ সাল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়।

অরবিন্দ ফিরলেন দেশে, পশ্চিমের জ্ঞান নিয়ে। পশ্চিমের পথে পাড়ি দিলেন বিবেকানন্দ পূবের গরিমা নিয়ে, আমেরিকার

চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। আর এক নিরস্ত্র সন্ন্যাসী চললেন দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। তাঁর নাম গান্ধী। সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করবেন। হাতে মাত্র দুটি হাতিয়ার। সত্যাগ্রহ আর অসহযোগ।

শিক্ষার দিকেই ছিল অরবিন্দের অনন্য মনোযোগ। বরোদার মহারাজা তা জানতেন। রাজস্ব বিভাগে কিছুদিন কাটানোর পরই তাঁর পদোন্নতি ঘটল বরোদার শিক্ষা বিভাগে। হলেন বরোদা কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। আগে কিছুদিন ছিলেন ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। অধ্যাপক হওয়ার কিছু পরেই সহকারী অধ্যক্ষ। ছাত্রদের বড় প্রিয়। কিন্তু তখনো তিনি নিজের কাছে ছাত্র। অধ্যয়নই তাঁর ধ্যান।

চলেছে সংস্কৃত আর বাংলা শেখা। ডুব দিয়েছেন শাস্ত্র ও সাহিত্য দুয়েরই গভীরে। ইংরাজীতে চলেছে কালিদাসের সংস্কৃত বিক্রমোর্বশী-র অনুবাদ। তারই সঙ্গে গীতা বেদ-বেদান্ত উপনিষদের ব্যাখ্যা।

বিলেতে থাকতে থাকতেই ইংরেজীতে কবিতা লেখা শুরু। বরোদায় এসেও তা থেকে বিরত নন। নতুন পুরনো কবিতা মিলিয়ে বেরুল প্রথম কবিতার বই 'Song to Myrtella.' এই সঙ্গে শুরু হল রমায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে ইংরেজী কবিতা।

রমেশ দত্ত বরোদার মন্ত্রী হয়ে এলে, নিজের উৎসুক্য প্রকাশ করলেন অরবিন্দের কবিতা সম্পর্কে। বিলেত-বাসের দিনে নিজেও ঐকাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গণ্যমাণ্য গুণীজনের অকুণ্ঠিত গুণগান পেয়েছেন। কিন্তু অরবিন্দের অনুবাদ পড়ে তাঁর নিজের উদ্যমকে মনে হল পণ্ডশ্রম। "তোমার কবিতাগুলি আগে দেখলে আমি আমার লেখা কখনো ছাপতাম না।"

কিন্তু বরোদার জীবন-যাত্রায় অরবিন্দের পরিচয় শুধু কবি বা ধ্যানী নয়। সমাজ-সচেতনায় তিনি চক্ষুষ্মান। সূক্ষ্ম কবিতার

পাশে তাই চলেছে ক্ষুরধার প্রবন্ধ রচনা। ছাপা হচ্ছে পুনার Anglo-Maratha পত্রিকা 'ইন্দুপ্রকাশে'। অবশ্য বেনামে, যেহেতু রাজ কর্মচারী। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধের নাম 'New lamps for old'. একই শিরোনামে সাতটি প্রবন্ধ যেন সাতটি শক্তিশেল।

আক্রমণের লক্ষ্য কংগ্রেস, কংগ্রেসের দূর্বল নীতি ও নেতৃত্ব। আবেদন-নিবেদন জাতীয় ভিক্ষাবৃত্তির নীতির প্রতি তাঁর নিন্দার ভাষা ক্ষমাহীন তীক্ষ্ণ। কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে বড় অভিযোগ কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান নয় যেহেতু তার জনসংযোগ নেই। ১৯০২-এর আমেদাবাদ কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেইখানেই পরিচয় তিলকের সঙ্গে। আলাপ আলোচনার শেষে অরবিন্দ বুঝলেন তিলক তাঁর সমর্থক। সেই সঙ্গে অনুভব করলেন দেশের নতুন যুগের নেতার জয়তিলক পড়বে এই তিলকেরই কপালে।

অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন জনগণই দেশের ভবিষ্যৎ। সমুদ্রের তলদেশে গভীর জলরাশি, তাই উপরে বিপুল আলোড়ন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বৃহৎ জনতার আহ্বান কই, আসন কই? আলোড়ন উঠবে কি করে?

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর আদর্শ লেখক। আনন্দমঠের অনুকরণে তিনি 'ভবানী মন্দির' নামে একটা আশ্রমও গড়তে চেষ্টা করেছিলেন একসময়। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালীকে দিয়েছে দেশকে মায়ের রূপে পূজা করার দীক্ষা।

ভাঙতে হবে সেই মায়ের পায়ের লোহার বেড়ী। কি করে তা সম্ভব। সম্ভব তিন উপায়ে। আগে আবেদন-নিবেদনের হীনবৃত্তি ছাড়তে হবে। হতে হবে আত্মনির্ভর। তারপর সরকারের সঙ্গে অসহযোগ। তারপর ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ভবিষ্যতের সশস্ত্র বিদ্রোহ কি ভাবে সম্ভব?

তার জন্যে এখন থেকে গড়তে হবে গুপ্ত সমিতি। সরকারী শ্যেন দৃষ্টিতে ধুলো দেবার জন্যে প্রকাশ্যে সে-সব সমিতিতে চলবে নির্দোষ কাজের মহড়া। যেমন শরীরচর্চা, ব্যায়াম, সমাজসেবা, সাহিত্যালোচনার সভা সমিতি সংগঠন। ব্যায়ামের তালিকায় থাকবে লাঠিখেলা, কুস্তি। সাহিত্য পাঠের তালিকায় থাকবে, সে পাঠ্য-তালিকা বাছাই করা ছাত্রদের জন্যে কেবল, ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি-শিবাজী-প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীর বিপ্লবীদের জীবন চরিত্র।

অরবিন্দের চেতনায় গুপ্ত সমিতির চিন্তা কোন হঠাৎ জাগা বিস্ময় নয়। আজ যার অঙ্কুর উঁকি দিয়েছে, তার বীজ বপন হয়েছিল ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায়ে। পড়ার পালা শেষ, লণ্ডনে তখন প্রায় উদ্দেশ্যহীন জীবন। ভারতীয় ছাত্রেরা মিলে গড়েছিল এক গুপ্ত সমিতি। নাম The Lotus and Dagger Society. অরবিন্দ এবং তার ভায়েরা সভ্য হয়েছিলেন। এক অধিবেশনেই সে সোসাইটির পরমায়ু ফুরোল। কিন্তু সেদিন যে ব্রত-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়েছিল সভ্যদের, তার অনুরণন রক্তের মধ্যে থেমে গেল না অরবিন্দের। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল সেই ব্রতের মূলকথা। তারপর দশ বছর কেটে গেছে। বীজ হয়তো শুকিয়ে যেতো সজীব পাতা ছড়ানোর আগেই।

শুকোল না। বীজের গোড়ায় পড়ল জলের ছিটে। ঠাকুর রাম সিং উদয়পুরের সর্দার। মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে গুপ্ত সমিতির জনক। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তৈরী করছেন সেনা বাহিনী। সরকারী সেনা বাহিনীর অভ্যন্তরেও চলেছে গোপন প্রচার, প্ররোচনা। অরবিন্দের কণ্ঠে একদিন উচ্চারিত হল সেই গুপ্ত সমিতির শপথ। শুধু তাই নয়, ঠাকুর সাহেব বিদেশে চলে গেলে তিনিই কিছুদিনের জন্যে পশ্চিম ভারতের গুপ্ত সমিতির নেতার আসনে বসলেন।

এই সময়ে মনের কোণে আনাগোনা শুরু হল আরেক সংকল্পের, আগুনের পাখির ডানার ঝাপটে তোলপাড় উঠল চেতনায়, চিন্তায়। বাংলাদেশেও গড়তে হবে গুপ্ত সমিতি।

অরবিন্দই বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতির স্রষ্টা। কিন্তু চরিত্রে গুপ্ত সমিতি না হলেও চেষ্টায় তারই মতো সংগঠন একটা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবী আর ব্যারিস্টার পি. মিত্র ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের মেজদা। বোম্বায়ের জেলা জজ। সরলা দেবী বেড়াতে গেছেন মামার কাছে। সেখানে গিয়ে চোখে পড়ল একটা ব্যায়াম সমিতি। দামোদর আর বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই মহারাষ্ট্রীয় যুবকের প্রচেষ্টা। কেন? গোরাদের উদ্ধত গর্বের দাঁত উপড়ে ফেলতে। তারা কি করে? পথে ঘাটে রেলে স্টীমারে মানুষকে বেপরোয়া অপমান, অত্যাচার। তারাই সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। গালে চড়, পিঠে ঘুষি চালাবার অধিকারটাও সুতরাং তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে। অকারণের কিল-চড়-ঘুঁষিকে পৌরুষের অপমান না ভেবে শাসক জাতির প্রতিনিধিদের অযাচিত প্রীতির পুষ্পবৃষ্টি মনে করে নিলেই তো গালের পিঠের ব্যথা মরে যেতে পারত কিন্তু গেল না।

সরলা দেবী কলকাতায় ফিরে তাঁর বালিগঞ্জের বাপের বাড়িতে খাড়া করলেন একটা ব্যায়াম সমিতি। ছেলেরা সেখানে শিখবে লাঠিখেলা, কুস্তি, ছোরা তলোয়ারের লড়াই। নিজের পত্রিকা ভারতীতে লিখলেন এক প্রবন্ধ। নাম বিলাতী ঘুঁষি বনাম দেশী কিল। মারের বদলে দিতে হবে পাল্টা মার। বাংলার ছেলেদের হাতের কব্জী, বুকের ছাতিতে জ্বলজ্বলিয়ে উঠবে যৌবন। সে যৌবনের আমৃত্যু প্রেমের খেলা চলবে দেশের সঙ্গে। দেশের বন্ধন, দেশের ক্রন্দন মুছিয়ে দিতে।

মহারাষ্ট্রের 'বীরাষ্টমী' ব্রতের আদর্শ নিয়ে কলকাতায় দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে অস্ত্রপূজার প্রচলন সরলা দেবীর আরেক প্রচেষ্টা।

বেশ ক'বছর এটা নিয়ে সাড়া পড়েছিল শহরে। তারপর শিবাজী উৎসব। এরও মূল প্রেরণা মহারাষ্ট্র থেকে। শিবাজী উৎসবের প্রথম উদ্‌গাতা তিলক। সখারাম গণেশ দেউস্কর এই উৎসবকে প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলার মাটিতে। এই উপলক্ষে লিখলেন একটা পুস্তিকা। শিবাজীর দীক্ষা। ভূমিকা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতায়। শিবাজী উৎসব।

মারাঠার সাথে আজি, হে বাঙালী, এককণ্ঠে বল জয়তু শিবাজী
মারাঠার সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে চল মহোৎসবে সাজি।

টাউন হলের উৎসবে পড়লেনও সে কবিতা।

সরলা দেবী শুধু শিবাজীতেই সন্তুষ্ট নন। খুঁজলেন বাংলার বীর কে আছে? বেরুল প্রতাপাদিত্য, প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য। ব্যাপক অর্থে তাঁরা কতটা জাতীয় নায়ক তাতে অনেকেরই সন্দেহ। তবু স্বদেশ প্রেমের নতুন জাগা জোয়ারে সে-সব সন্দেহ ভেসে গেল।

পুজোর ছুটি হলে আর বরোদায় নয়। প্রতিবছরই অরবিন্দ চলে আসতেন কলকাতায়। এবারেও এলেন। পি. মিত্র-র সঙ্গে পরিচয় কলকাতাতেই। পরস্পর আলোচনায় অরবিন্দ বুকে বল পেলেন। এবার বাংলাদেশে গড়তে হবে গুপ্ত সমিতি।

১৯০২। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা থেকে পাঠালেন কলকাতায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার গোড়ার কাজের ভার দিয়ে। ছ'মাস পরে পাঠালেন ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারকে।

যতীন্দ্রনাথ বর্ধমানের ছেলে। যোদ্ধা হবেন, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। প্রমাণ করবেন বাঙালী কাপুরুষ, ভীরুর জাত নয়। উত্তর প্রদেশে এসে নাম ভাঁড়িয়ে হলেন যতীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়। চাল-চলন, কথাবার্তা, হাবভাব সবই উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতো, নকল করে শেখা। যেহেতু সরকারী সেনাবাহিনীতে বাঙালীর প্রতি অবজ্ঞা। চেষ্টার অন্ত নেই, তবু

সৈনিকের চাকরি জুটল না। অবসন্ন ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হলেন অরবিন্দের কাছে। হাতে ইয়া লম্বা একটা লাঠি। আরেক হাতে লোটা। ইয়া দশাসই চেহারা।

অরবিন্দের চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথের চাকরী জুটে গেল বরোদার মহারাজার অশ্বারোহী সেনাদলে। দক্ষতার গুণে অল্পদিনেই পদোন্নতি। হয়ে গেলেন মহারাজার শরীররক্ষী দলের অন্যতম। সেই যতীন্দ্রের হাতেই অরবিন্দ একদিন তুলে দিলেন তাঁর স্বপ্ন-লোকের চাবি।

যাও, কলকাতায় গিয়ে লাগো মহোদ্যমে, গুপ্ত সমিতির আস্তানা গড়তে। আজকের আস্তানা কাল হবে দুর্গ। আজকের সভ্য কাল হবে সৈনিক। আজ যা সংকল্পের তুচ্ছ কথা, কাল তাই-ই হবে সংগ্রামের তূর্য-নিনাদ।

সেই সঙ্গে দিলেন একটা চিঠি সরলা দেবীর নামে। যতীন্দ্র সরলা দেবীর আওতায় এসে পড়লেন। তখন তাঁর Lathi Cult চলেছে কলকাতা কাঁপিয়ে।

১৯০২-এর সেপ্টেম্বর। নিবেদিতার জীবনে আহ্বান এল ভারত ভ্রমণের। সখের বেড়ানো নয়। ভারতবর্ষকে অন্তরে-বাইরে চিনে নেবার আগ্রহ। উত্তরে পথের শেষ লাহোর। পশ্চিমে হায়দ্রাবাদ। শুধু জানা নয়, তার সঙ্গে জাগানোর কাজও চলেছে। 'My role is to awaken the Nation.'

ঘরে ফেরার পথে নামলেন বরোদায়। রমেশ দত্তের মাধ্যমে পরিচয় হল মহারাজা গাইকোয়াড়ের সঙ্গে। স্টেশনে এসেছিলেন বহু গণ্যমান্য রাজকর্মচারী। অরবিন্দও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। বরোদায় আলাপ হল দুজনের। প্রথম আলাপেই প্রবল আকর্ষণ। অন্তরে দুজনেই বিপ্লবী আর বাইরে দুজনেই যোগী। দুজনের চোখের ভিতরেই এক লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

প্রথম আলাপের দিনেই নিবেদিতা বললেন—

'কলকাতা আপনাকে চায়। আপনার উপযুক্ত স্থান কলকাতা।'

অরবিন্দ বললেন—

'না, আমি থাকতে চাই অন্তরালে। আমার কাজ মানুষ তৈরি করা।'

নিবেদিতা এগিয়ে দিলেন নিজের করতল অরবিন্দের দিকে।

হাতে হাতে পড়ল মৈত্রীবন্ধনের মিল।

নিবেদিতা বললেন—

'আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলে জানবেন।'

আলাপের মধ্যেই নিবেদিতা জানলেন অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রচেষ্টা পর্বের ইতিহাস। নিবেদিতা কথা দিলেন, কলকাতায় ফিরেই যোগ দেবেন গুপ্ত সমিতির কাজে।

কলকাতায় ফিরে তাই করলেন নিবেদিতা। ইতিমধ্যে বারীন্দ্র-কুমার বরোদা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁচেছেন যতীন্দ্রনাথকে সহযোগিতা করার জন্যে। এসে দেখলেন তাঁর যতীনদা বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি। শুধু কিছু টাকা যোগাড় করেছেন কয়েকজন মাতব্বর গোছের লোকের কাছ থেকে। কিন্তু অর্থ তো বড় কথা নয়। বড় কথা আগুন। দেশের যুবসমাজের ভিজে পলতেয় ছুঁইয়ে দিতে হবে প্রাণের আগুন। জ্বলবে লক্ষ শিখা। লক্ষ্য এক। পরাধীনতার অন্ধকারকে পুড়িয়ে মারা।

বারীন্দ্র এবার নিজে নামলেন আগুনের খেলায়। "গনগনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার জন্যে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আমাকে দেশে পাঠানো হল।"

নিবেদিতা বারীন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন—'তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু তুমি তোমার দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ?'

বারীন্দ্রের উত্তর—আপনি যদি জোয়ান অব আর্ক হন, তবে আমরা নিশ্চয়ই অনুসরণ করব আপনাকে।

গুপ্ত সমিতিতে নিবেদিতা পরামর্শদাতা। সমিতির হাতে তুলে দিলেন নিজের লাইব্রেরীর প্রায় দেড়শো বই।

সব কটি বই-ই জাতীয়তাবোধ-জাগানিয়া। এবার স্থির হল সমিতির পরিচালনায় খুলতে হবে একটা স্কুল। সেখানে শেখানো হবে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, জীবনী। গড়তে হবে, পলিটিক্যাল মিশনারী। শিক্ষা শেষ করে তারা ছড়িয়ে পড়বে গ্রাম-গ্রামান্তে, সমাজের সর্বস্তরে। ছোট বড় মাঝারী নানা ধরনের গুপ্ত কেন্দ্রে ছেয়ে যাবে দেশ। বিপ্লবের দিনে সহসা বৃহন্নলার ছদ্মবেশ খুলে জেগে উঠবে বীর অর্জুন।

সে-রাজনৈতিক ক্লাসের প্রথম ছাত্র বারীন্দ্র। তারপর ক্রমে ক্রমে যোগ দিলেন দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন্দ্র দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, আরো অনেকে।

একদিন সখারাম দেউস্করকে বারীন্দ্র জানালেন তাঁর গুপ্ত সমিতির খবর। শুনে লাফিয়ে উঠলেন সখারাম ; আনন্দে, আবেগে। বল কি ? সত্যি বাংলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে স্বাধীনতার যজ্ঞে প্রাণাহুতি দেবার দল ? দাও, আমাকে আলাপ করিয়ে দাও, তোমাদের দলের সঙ্গে।

সখারামের সঙ্গে যতীন্দ্র প্রভৃতির আলাপ করিয়ে দিলেন বারীন্দ্র। সখারাম বললেন,ঠিক আছে। আমি নিলাম অর্থনীতি পড়ানোর ভার।

যতীন্দ্র একই সঙ্গে দুটো জায়গায় জড়িত ছিলেন। গুপ্ত সমিতি আর সরলা দেবীর ব্যায়াম সমিতি। সরলা দেবী যুবশক্তিকে জাগাতে চেয়েছিল বলে, বীর্যে। ' কিন্তু গুপ্ত সমিতির অপক্ষপাতী। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা বা ডাকাতির অসমর্থক। কিন্তু গুপ্তসমিতির আকর্ষণে তাঁর দলের ছেলেরা চলে যেতে লাগল দলে দলে। বিপন্ন বোধ করলেন সরলা দেবী।

জানুয়ারী ১৯০৩-এ নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হল বেলুড় মঠের সঙ্গে। মঠের সন্ন্যাসীরা বিপ্লবী নিবেদিতাকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করতে পারলেন না। নিবেদিতার পরিপূর্ণ মনোযোগ পড়ল পলিটিক্যাল মিশনারী গড়ার দিকে।

তবু গুপ্ত সমিতি ভেঙে গেল। প্রধান কারণ বারীন্দ্র-যতীন্দ্র বিরোধ, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। কলকাতায় ছুটে এলেন অরবিন্দ, দুই যুধ্যমান দলনেতার মধ্যে বোঝাপড়া করতে। বারীন্দ্র কোন সর্তেই যতীন্দ্রের কর্তৃত্ব মানতে রাজী নন। যতীন্দ্র চরিত্রহীন, যাকে ও বোন বলে সে তা নয়। অন্য মেয়ে। অন্য সম্পর্ক। চরিত্রহীনের পক্ষে নীতিহীন হতে কতটুকু দেরি!

"একতরফা বিচারে অরবিন্দ যতীন্দ্রকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। ফলে সার্কুলার রোডের গুপ্ত আড্ডা ভেঙে গেল।" আসল ব্যাপারটা ভিন্ন। যতীন্দ্র ছিলেন কড়া ধাতের চড়া মেজাজের মানুষ। বারীন্দ্র বা দেবব্রত বসুর কথায় কর্ণপাত নেই। সেইটেই ক্ষোভ। বারীন্দ্র নিজেই লিখেছেন—"যতীন্দ্রনাথ, আমাদের প্রথম বৈপ্লাবিক নেতা, আমি এবং দেবব্রত বসু আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া বাধিয়ে ছিলাম, তার কারণ সামান্য। আমরা যতীন্দ্রের গর্বিত, উদ্ধত মিলিটারী মেজাজ আদৌ বরদাস্ত করতে পারতুম না। সব ব্যাপারে কেবল তাঁরই মাতব্বরি। আমরা যেন কেউ কিচ্ছু নয়।"

গুপ্ত সমিতি ভেঙে গেল। অরবিন্দ ফিরে গেলেন বরোদায়। বুঝলেন—দেশের মাটি এখনও বিপ্লব রোপণের পক্ষে উর্বরা হয় নি। There was apathy and despair. বরোদায় ফিরে আবার ডুব দিলেন অধ্যয়নে, রাজনৈতিক ধ্যানে। বারীন্দ্র রাজনীতি আর ইতিহাস চর্চায় মাতলেন। যতীন্দ্র নিলেন সন্ন্যাস। নাম হল নিরালম্ব স্বামী।

১৯০৩। ইংলণ্ড জয় করে কলকাতায় ফিরলেন ব্রহ্মাবান্ধব। ফেরার আগে এক চিঠিতে দিয়েছিলেন এই জয়ধ্বনির সংবাদ।

"নিজের সুখ্যাতি করতে নেই ; বক্তৃতা তিনটি বেশ জমেছিল। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করছেন, বিত্থালয়ের পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে বেদান্ত দর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা, যদি সুপরামর্শ হয়, তা হলেই মঙ্গল, নইলে আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। একদিনের কর্ম নয়। একজনেরও কর্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদান্ত পড়লে য়ুরোপেরও মঙ্গল ও ভারতের মঙ্গল। এঁরাই তো গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও হাকিম হন।"

কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল ডন সোসাইটি থেকে। বক্তৃতা দিতে হবে। যারাই দেশের জন্যে কিছু ভাবছে, খুঁজছে, খুঁড়ছে, গাঁথছে, বলছে, চলছে—ডন সোসাইটি যেন বুক বাড়িয়েই আছে তাদের আলিঙ্গন দেবে বলে।

ব্রহ্মবান্ধব নতুন কিছু বললেন না। বিলেতে যা বলেছেন তাকেই নতুন করে বললেন, বিলেত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে। সেদিনের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন বিনয় সরকার। সতের বছর বয়স। চতুর্থ বার্ষিকশ্রেণীর ছাত্র। সেদিনের অভিজ্ঞতার কথায় তিনি লিখেছেন—'মাৎ হয়ে গিয়েছিলাম।···এই ধরনের কথা ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় নতুন নয়। কিন্তু বলবার ঢঙটা নতুন। কাজেই মনে হয়েছিল যেন একটা দার্শনিক তাজমহলের মালিক হয়ে গেলাম।'

আর ব্রহ্মবান্ধব মানুষটাও বিচিত্র। তাঁর বাইরে আকর্ষণটাও কম নয়। ভিতরের আগুন বাইরে থেকে দেখা যায়।

"গেরুয়া পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতা। কাছাখোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নাই ;—গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি এক নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। তখনও আমি বিবেকানন্দী দলের কোনো স্বামিজীকে দেখি নি। সতীশবাবু ফকির বটে, কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড়ে সাধুয়ানি ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবই আমার

অভিজ্ঞতার সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙালী সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাবভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ব্রহ্মবান্ধব সতীশবাবুরই পরবর্তী ধাপ। অনুকরণযোগ্যও বটে। তাঁর চোখের ও হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মতো মানুষ, এই রকম লোকই চাই।"

কলকাতায় পা দিয়েই ব্রহ্মবান্ধব মেতেছিলেন নিজের স্কুল 'সারস্বত আয়তন' নিয়ে। বিলেত যাবার আগেই তৈরি। তখন ছাত্র ছিল ৮। এখন হয়েছে ৩০। প্রাচীন আদর্শের ছাঁচে গড়া। কিশোরকাল থেকে ছাত্ররা যাতে শ্রদ্ধা করতে শেখে নিজের দেশের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণকে। নিজে অবিশ্বাসী, তবু নিজের স্কুলে ঠাকুরপুজো হতে বাধা দেন নি।

এই পরেই তাঁর জীবনের স্মরণীয় উদ্যোগ 'সন্ধ্যা' কাগজের প্রতিষ্ঠা। জাতির জীবনে যখন সন্ধ্যা এসেছে ঘনিয়ে, ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে/বিশ্বজগৎ নিশ্বাস বায়ু সম্বরি/ স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে, সেই সময় বেরুল ঐ বিরল-দৃষ্টান্ত কাগজ সন্ধ্যা। স্বাদে ভিন্ন। ভাষাতেও ভিন্ন। ধর্ম দর্শন জাতীয় বিষয়ে গুরু প্রবন্ধের ভাষা গুরুপাক্। কিন্তু যেখানে আলোচ্য বিষয় দেশ, দেশের রাজনীতি, দেশের আন্দোলন, সেখানে ভাষার গড়ন-গঠন বিচিত্র। জনসাধারণ যে লেখার লক্ষ্য, সেখানে ভাষাটাও জনসাধারণের। তাতে মিশেছে রূপকথা, গ্রাম্যভাষা, অপভাষা, হেঁয়ালী সব কিছু। সেটাই সন্ধ্যার সর্বজনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় উপকরণ। দোকানদার, জমাদার, সরকার গোমস্তা, মুটে, গাড়োয়ন সকলেই উদ্গ্রীব কখন 'সন্ধ্যা' আসবে। সন্ধ্যা কি বলল, কি লিখল না-জানা না-পড়া পর্যন্ত যেন মনের স্বস্তি নেই।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ভাষা নিয়ে উঠেছিল অভিযোগ। উপধ্যায়ের জবাব—"আমি ইচ্ছা করিয়াই সর্বসাধারণের মুখে এই

ভাষা তুলিয়া দিতেছি। ইংরেজকে ফিরিঙ্গী বলিয়া গাল দিতে শিখিলে লোকের ভয় ভাঙিয়া যাইবে।”

সন্ধ্যার কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নাম শুনলেই ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে। ১। এখন ঠেকে গেঠি প্রেমের দায়ে। ২। ছিদিসনের হুড়ুম দুড়ুম ; ফিরিঙ্গীর আক্কেল গুড়ুম। ৩। বোঁচকা সকল নিয়ে যাবেন বৃন্দাবনে। নাম এই। অথচ বিষয় কি, না সরকারের জঘন্য দমন-নীতি। সন্ধার ভাষায় ইংরেজ হয়েছিল, ফিরিঙ্গী। কিংসফোর্ড হয়েছিলেন ‘কিং ফর্দ্দ’। বিশ্ববিদ্যালয়, গোলামখানা।

‘সন্ধ্যা’র আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে তাঁর যে কৈফিয়ত সেটি ভাবের ঘটা আর ভাষায় ছটায় বার বার পড়ার মতো।

“দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এইত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কাল-রাত্রির কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সু-প্রভাত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বারশত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারিটি চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

“প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভবসাগরে জীব ডুবিয়া না মরে তাই তিনি গীতারূপ ভেলা প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা উহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তুফান কাটাইয়া কুল পায় ; আর যাহারা উহাকে অগ্রাহ্য করে, তাহারা হাবুডুবু খায়।

“দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। আশ্রমধর্ম ভাঙিয়া যাওয়ায় সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

“তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়। তিনি বৌদ্ধদিগের গর্ব খর্ব করিয়া হিন্দুধর্মের জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন।

“চতুর্থ সন্ধ্যায় ম্লেচ্ছাধিকার। এইবার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচার অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মরিয়া গিয়াছে।

"পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয় সুদশার পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও দুইশত বৎসর চলিয়া গেল, তবু কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

"অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটি লম্বা রশিতে বাঁধা আছি। যত দূরই যাই না কেন, যতই ঘুর পাক খাই না কেন, খোঁট ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদ-বেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই।

"কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা 'সন্ধ্যা' নামে যে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝানো। রাজা ম্লেচ্ছ। উপজীবিকার জন্য, মানসম্ভ্রমের জন্য, ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে, নহিলে উপায় নাই। এতে কি আর খাঁটি ধর্ম থাকে। সমস্যা শক্ত বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্যকলাপ ও দেশ বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবি ঢঙ নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে।···পূজা, পর্ব, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-নীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি সব কথাই বলা যাইবে, কিন্তু সমুদয়ের ভিতরে ঐ এক সুরের খেলা থাকিবে—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম। এল্‌তলা, বেলতলা, সেই বুড়ির পায়ের তলা।..."

সন্ধ্যার সমালোচনায় কাউকে ছাড়-ছোড় নেই। ছড়ির মতো ভাষা। যেমন পড়ছে সরকারের পিঠে, তেমনি দেশদ্রোহী বা ভণ্ড-দেশপ্রেমিকেরও ঘাড়ে। তোয়াক্কা নেই কাউকে। কারণ তাঁর নিজের ভাষায়—"দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকর-ধ্বজের উপরে চটি খাওয়াইতে হইবে। এ সময় কি ভেল্‌সায় চলে? দেশে চারিদিকে তমোভাব-অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না দিলে সানাইবে না।...যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাব্‌কাইলে তার সংজ্ঞা থাকিবে না।"

১৯০৫-এ ভাসিয়ে দেওয়ার, উড়িয়ে দেবার, ছিনিয়ে নেবার যে কালবৈশাখী ঘূর্ণী জেগে উঠেছিল, এঁরা সব সেই-জাগানিয়া যুগের যাজ্ঞিক। রবীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, নিবেদিতা, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব এঁরা কেউই রাজনৈতিক নেতা, কিংবা দেশনায়ক নন, নেপথ্যের সংগঠক। অগ্নিমন্ত্রের আহ্বান নিয়ে রাজনীতি মঞ্চে অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে। আংশিক সুযোগ-সুবিধের বদলে, পূর্ণ স্বরাজের যে দাবি উঠেছিল, এঁরা ছিলেন তারই বনিয়াদ গড়ার কারিগর।

ব্রহ্মবান্ধব সম্পর্কে বিনয় সরকার বলেছিলেন,

"ব্রহ্মবান্ধব একজন জবরদস্ত, স্বার্থত্যাগী, ও নির্ভীক কর্মবীর। লোকটা ডানপিটে, ত্যাঁদড়, ভবঘুরে। যতোগুলো গুণ আমার বিবেচনায় যুগ-প্রবর্তকের লক্ষণ সবগুলোই তাঁর ছিল। তাঁর সংস্পর্শে এসে যুবক বাঙলার অনেকেই স্বদেশ সেবার নানা কাজে মোতায়েন হতে পেরেছে। দেশের লোকে তাঁকে 'সন্ধ্যা' দৈনিকের সম্পাদক বলে জানে। বস্তুত ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তাসম্পদে বাঙালী জাত ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। ১৯০৫-এর পরবর্তী বঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের বিরাট ব্যক্তিত্ব জ্বলজ্বল করছে।"

শুধু ব্রহ্মবান্ধব নয়, তাঁরই মতো জবরদস্ত, স্বার্থত্যাগী নির্ভীক ও জ্বলজ্বলে ব্যক্তিত্বওয়ালা এই মানুষগুলো জাতির চিন্তাকে সেদিন উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল এমন এক বৃহত্তর জাতীয় বোধে, যা শুধু বিলেতী কাপড়ে জ্বালানো আগুনের শিখাতেই শেষ নয়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের মহিমায় প্রতিটি মানুষ যাতে আলোকিত সূর্যের জীবন পায় তারই বিরামহীন অন্বেষণে এঁরা ছিলেন ক্রমাগত উন্মুখ, ক্রমাগত অগ্রগামী, ক্রমাগত আলোড়িত ও অস্থির।

১৯০৫ রচনা করেছিল তারই পটভূমি। মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে দবদবিয়ে ফিরে আসা প্রাণের বেগে ধুলোয় লুটনো মাথাগুলো উঁচু হয়ে উঠল সেদিন কেশর-ফোলানো অরণ্যের মতো ঊর্ধ্বমুখী স্পর্ধায়, স্পন্দনে।



॥ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হল লাঠির ঘায়ে ॥



১৯০৬-এর ১৩ই এপ্রিল।

রাত্রি তখন নটা। আকাশে অন্ধকার না আলো কি ছিল জানা নেই। তবে নদীতে ছিল তরঙ্গ। ঢেউয়ের মতন। আকাঙ্ক্ষিত তীরভূমির দিকে ছিল তাদের ধাবমান বেগ। দূর মহাসমুদ্রের বাণী শুনেছে তারা অন্তরে। পৌঁছে দিতে হবে তীরভূমির মাটির কানে।

সেই সময়ে নারায়ণগঞ্জ আর খুলনার দুটি মেইল স্টীমার এসে পৌঁছল ঘাটে। তাতে সারা দেশের জনগণের প্রতিনিধি। কলকাতা থেকে বরিশালে আসার উপায় তখন রেলে চড়ে খুলনা, তারপর নদীপথ। খুলনা থেকে স্টীমারে চেপে কলকাতার প্রতিনিধিদের সেদিন যে বরিশাল-যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার একটা নিঁখুত নিপুন ছবি ছেপে বেরিয়েছিল কৃষ্ণকুমারের 'সঞ্জীবনী' পত্রে।

"খুলনা ছাড়িয়া আমাদের স্টীমার আলাইপুর আসিয়া পৌঁছিল। স্টেশনে দেখিলাম, বিস্তর যুবক রক্তবর্ণের পতাকা হস্তে লইয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে স্টীমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সকলের হস্তে পুষ্পমাল্য এবং মুখে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। স্টীমারে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইল; অমনি তীর হইতে এবং স্টীমার হইতে সহস্র ভক্তি গদগদ কণ্ঠে গীত হইল 'বন্দেমাতরম্'। স্টীমার আলাইপুর ছাড়িয়া চলিল। তীরের জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে

ক্ষীণ হইয়া আসিল। প্রাতঃসমীরণ সমস্ত বায়ুমণ্ডলে এমন এক মুগ্ধভাব ছড়াইয়া দিয়াছিল যে আমরা ভাবে তন্ময় হইয়া গেলাম। সে কি আনন্দ! কি তৃপ্তি! কত জায়গার কথা বলিব? এমন করিয়া যেখানেই ষ্টীমার থামে, সেখানেই লোক সমাগম, সেখানেই ঐ প্রাণোন্মাদক 'বন্দেমাতম' ধ্বনি; চারিদিকের উৎসাহ উত্তেজনা মৃতপ্রাণে নব বল সঞ্চার করিয়া দেয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা ছাড়াইয়া যেমন পূর্ববঙ্গে পড়িলাম, অমনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম।

স্টেশনে বহু পুলিশ লম্বা লম্বা লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের প্রতি আদেশ এই যে, কেহ যেন 'বন্দেমাতরম' বলিতে না পায়।

ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ডেলিগেটগণ উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তীর হইতে আর সে প্রতিধ্বনি আসিল না। আমরা একেবারে আবাক! আবার দিঙমণ্ডল কম্পিত করিয়া ধ্বনি উত্থিত হইল—'বল ভাই বন্দে-মাতরম্'। জলস্থল সে গম্ভীর শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। সোসাইটির একজন সভ্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'যদি বাঙালী হও, তবে আজ প্রাণ খুলিয়া 'বন্দেমাতরম' বল, জীবন ধন্য হউক।'

অমনি তীর হইতে সমুদ্র জলকল্লোলের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি নদীর তটপ্রান্ত আলোড়িত করিয়া উচ্চারিত হইল। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশের শাসন কোথায় ভাসিয়া গেল!

লাঠির জোরে 'বন্দেমাতরম' বলা নিষেধ করিবে এমন শক্তি কাহারও নাই। ইহা এবার যাঁহারা কনফারেন্সে গিয়াছেন, তাঁহারা মর্মে মর্মে বেশ বুঝিয়া আসিয়াছেন। একস্থানে আমরা দেখিলাম, নগ্ন কৃষক বালকেরা তাহাদের লাঠির অগ্রভাগে লাল গামছা বাঁধিয়া নিশান প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহাই হাতে করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে বলিতেছে 'বন্দেমাতরম'। কৃষকেরা লাঙল ছাড়িয়া দিয়া নদীতীরে আসিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে গাহিতেছে

'বন্দেমাতরম'। একস্থানে দেখিলাম সম্ভ্রান্ত পুরমহিলারা একত্র দণ্ডায়মান আছেন, এবং ষ্টীমার নিকটবর্তী হইবামাত্র তাঁহারাও প্রাণ খুলিয়া 'বন্দেমাতরম' বলিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এমনি করিয়া নদীর দুইধারে ইতর-ভদ্র সকলে তারস্বরে 'বন্দেমাতরম' গাহিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিলেন।"

শেষ পর্যন্ত সেই ষ্টীমার এসে নোঙর ফেলেছে বরিশালে, সাত ঘাটের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে।

ষ্টীমার ভর্তি প্রতিনিধিরা একে একে নামতে লাগলেন জল থেকে স্থলে। নামলেন আব্দুল রসুল, সঙ্গে স্ত্রী। নামলেন সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণকুমার মিত্র। নামলেন 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যবৃন্দ। নামলেন ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম জেলার জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

১৯০৫। গ্রীষ্মের ছুটিতে অরবিন্দ এসেছিলেন বরোদা থেকে কলকাতায়। তিনিও এসেছেন বরিশালের যজ্ঞে যোগ দিতে। তাঁর ভাষায় "বরিশাল স্বদেশীর পীঠস্থান"। আর এসেছেন ব্রহ্মবান্ধব।

নদীতে ষ্টীমারে যত, নদীর পাড়ে তার দ্বিগুণ জনতা। তাদের হাতে মালা। হৃদয়ে অভ্যর্থনা।

ষ্টীমারের প্রতিনিধিরা মহা উৎসাহে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—

বন্দেমাতরম্।

কেঁপে উঠল রাত্রির আকাশ, নদীর ঢেউ, জলস্থলের নিদ্রাতুর স্তব্ধতা। কিন্তু একি অবাক কাণ্ড! নদীর পাড়ে যারা, তারা কি মৃত? যদি মৃত নয়, তাহলে মূক কেন? বরিশালের মানুষ 'বন্দেমাতরম্' ডাকে সাড়া দেয় না একি কখনো হয়?

হয়। কখনো কখনো দুর্দৈব ঘটে। যাঁর ইঙ্গিতে নদীতীরের জনতা নীরব, সেই অশ্বিনীকুমারই এগিয়ে গেলেন প্রতিনিধিদের কাছে।

আমরা চুক্তিবদ্ধ।

কিসের চুক্তি? কার কাছে?

ম্যাজিস্ট্রেট ইমারসন সাহেবের কাছে। আগন্তুক প্রতিনিধিদের নদীর পাড় থেকে শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে আনার সময় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ। বাধ্য হয়ে, ক্ষোভে, দুঃখে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়েও মানতে হয়েছে ঐ সর্ত। নইলে অধিবেশনই বানচাল হয়ে যায়।

কাল থেকে শুরু অধিবেশনের, দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। ১৯০৫-এ ময়মনসিংহ অধিবেশনেই বাখরগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ প্রাদেশিক সমিতির পরবর্তী অধিবেশনের আহ্বান জানিয়েছিলেন বরিশালে। সেদিন থেকেই তোড়জোড়, অর্থ-সংগ্রহ, প্রচার, গ্রামে গ্রামে সভা। অধিবেশনকে সফল করতে হলে চাই প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক। প্রয়োজন ছাত্রসমাজের সহযোগিতা। সরকারী আইনে ছাত্রদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। অশ্বিনীকুমারের নির্ভীক কণ্ঠ ঘোষণা করলে—

"কোন ছাত্র যদি নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইতে চাহে, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিলে আমার কলেজের যদি কোন অনিষ্ট হয়, এমন কি কলেজ উঠিয়াও যায় আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না।"

শয়ে শয়ে ছুটে এল ছাত্রদল। সংগঠনের কোন ত্রুটি নেই। সভামণ্ডপ তৈরি। সভাপতি কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আবদুল রসুল।

সর্ত না মানলে এত বড় যজ্ঞ যে নিভে যাবে কোন আহুতি না নিয়েই।

প্রতিনিধিরা এসব যুক্তিকে আমল দিতে নারাজ।

আমরা রাজপথ দিয়ে যাব বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়েই।

পুলিস লাঠি চালাতে পারে। অধিবেশনের পক্ষে সেটা হবে অন্তরায়।

শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করে জানালেন—তাহলে বন্দেমাতরম্ বন্ধ থাক্।

বন্ধ? কার দেশ? কার আইন, যে মাথা নুইয়ে মানতে হবে? অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যরা আর কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রতিবাদ জানালেন। তাঁরা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্যই গ্রহণ করলেন না। উঠলেন গিয়ে রজনীকান্ত গুহের বাড়িতে। রজনীকান্তও বরিশালের জনপ্রিয় নেতা, এই অধিবেশনের সম্পাদক। সেদিন রাত্রে অনেকেই মুখে দিলেন না অন্ন, অন্যায়ের প্রতিবাদে। অনেকে অশ্রুপাত করলেন রুদ্ধ বেদনায়।

পরের দিন সভা। ঠিক হয়েছে প্রতিনিধিগণ সমবেত হবেন রাজবাহাদুরের হাবিলীতে। সেখান থেকে শুরু হবে সভাপতির অনুগমন সভামণ্ডপ পর্যন্ত, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিসহ।

অশ্বিনীকুমার জানিয়ে দিয়েছেন,যে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমাদের চুক্তি বা সর্ত শেষ। স্টীমার ঘাটে শোভাযাত্রা আর বন্দেমাতরম্ নিষিদ্ধ ছিল। আমরা তা পালন করেছি। অভ্যর্থনা সমিতির দায়িত্ব মিটে গেছে। এখন শুরু হচ্ছে প্রাদেশিক সমিতির কাজ। এখন যদি বরিশালের রাজপথে বন্দেমাতরমের ধ্বনি কেঁপে ওঠে, তার জন্যে আমাদের দায়ী হবার দায় নেই। বরং বাখরগঞ্জবাসী সকলেই যোগ দেবে সেই বজ্রনাদে।

বেলা দুটোয় এল পুলিস পক্ষের প্রস্তাব। শোভাযাত্রা চলবে। বন্দেমাতরম্ বারণ।

নেতারা জানালেন পুলিসী-বারণ আমরা মানতে রাজী নই।

বরিশালে পুলিসী-পীড়ন সেদিনই নতুন নয়।

১৯০৫-এর ৭ই ডিসেম্বর।

অশ্বিনীকুমার আর তাঁর সহকর্মীরা এক ইস্তাহার জারী করলেন

জনসাধারণের কাছে। স্বদেশী কেনো। স্বদেশী মানো। আর স্বদেশী গড়ো।

তা দেখে ক্ষেপে উঠলেন স্যার বামফিল্ড ফুলার। ফুলে উঠল শজারুর কাঁটা। এ রকম-ইস্তাহার ছড়াবার কোন অধিকার নেই তাদের। দেশবাসী কি করবে, কি করবে না তার ঘোষক হতে পারে একমাত্র রাজা, বা রাজপ্রতিনিধি। ডেকে পাঠালেন অশ্বিনীকুমারদের। এখুনি প্রত্যাহার করুন ঐ ঘোষণা-পত্র। নইলে প্রলয় নাচন। বলা বাহুল্য সেটা নাচবে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী।

অবস্থার বিপর্যয়ে নেতারা তা প্রত্যাহার করাই স্থির করলেন। চিঠি গেল ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে। সরকার বলেছেন আমাদের ইস্তাহারে নাকি এমন কিছু আছে যার ফলে দেশের শান্তিভঙ্গের সম্ভবনা দেখা দিতে পারে। আমরা ইস্তাহার প্রত্যাহার করলাম।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাক। তিনি চিঠি পেয়েই খবরের কাগজে এক নোটিশ ছাপিয়ে বসলেন।

বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তাঁদের ঘোষণা-পত্র। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে ঐ আবেদনপত্র ছিল রাজদ্রোহাত্মক, এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সহায়ক।

এই ভ্রমাত্মক এবং বিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অশ্বিনীকুমারেরা প্রতিবাদ জানালেন। অবিলম্বে যেন সংশোধন করা হয় ঐ নোটিশ যা সর্বৈব মিথ্যা, আরোপিত অপপ্রচার। প্রতিপক্ষ নিরুত্তর। অতঃপর আইনের শরণাপন্ন হয়ে আদালতের কাছে আবেদন। স্টেটস্‌ম্যানের ভাষায় initial mistake করেছিলেন মিঃ জ্যাক। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল মামলার খরচ-খরচাসহ ১২০ টাকা অর্থদণ্ড সহ চাকরি খুইয়ে।

যত বাধা, ততই অবাধ্যতা।

এক রাত্রে মিঃ জ্যাকের উত্তরাধিকারী মিঃ স্ট্রেট-ফিল্ড এসেছেন বানারীপাড়া ভ্রমণে। ভ্রমণে নয়, দমনে। জনতা বিদ্রোহী। আসার সঙ্গে সঙ্গেই আগুনে ঘি। প্রবল উত্তেজনা। ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন বানারীপাড়া ইউনিয়ন স্কুলের তিনটি ছাত্র ও একজন শিক্ষকের বিতাড়নের।

দক্ষযজ্ঞের তারাই শিব। আদেশের বিরুদ্ধে ছাত্রমহলে আলোড়ন। তারা ঐ আদেশ-প্রত্যাহারের জন্যে আবেদন জানালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। যে বাণ একবার ছোঁড়া হয়েছে তা কি আর তূণে ফিরে আসে? সাহেব কোন কথাই বলতে রাজী নন ছোঁড়াদের সঙ্গে। ছোঁড়ারাও কি ছেড়ে দেবে নাকি? শুরু হয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি।

পরিণাম?

ছোটলাট ফুলার তখন আগ্রায়। বড়লাট কার্জনের সহচর। তাদের হাতে এসে পৌঁছল একটা জরুরী টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামের জবাবে বরিশালের মাটি কাঁপিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে এল একদল গুর্খা সৈন্য। সঙ্গে স্বয়ং ফুলার। তারপর? সারা শহর জুড়ে অত্যাচারিতের ক্রন্দনরোল। স্টেটস্ম্যানের ভাষায়—"a lamentation which has continued ever since." একটা বাড়ির খুঁটিতে লেখা ছিল বন্দেমাতরম্। ভেঙে ফেলা হল সেই বাড়ি।

দশ-এগারো বছরে ছেলে। বাড়ির রান্নাঘরে বসে গাইছিল বন্দেমাতরম্। তাকে টেনে আনা হল বাইরে, কালেক্টারী-কোর্টের সামনে। তারপর হাত-পা বেঁধে নির্মম চাবুক।

গুর্খারা যে এ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে এত প্রাণপাত করছে তার পুরস্কার কি? বিনামূল্যে দোকানদারদের সরবরাহ করতে হবে সব কিছু।

ছু'জন ময়রার মাথা ফাটল। অপরাধ তাদের দোকানে ঝুলছিল স্বদেশী-নোটিশ। সেই নোটিশ অপসারণে অসম্মত হয়েছিল তারা।

গুর্খাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শহর ছেড়ে গ্রামে। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে-দোরে খিল। শহরের নেতৃস্থানীয় কিছু অধিবাসীর উপর হুকুম জারী হল—১৫ দিনের মধ্যে চলে যেতে হবে শহর ছেড়ে। সরকারী আপিস থেকে ছাঁটাই হতে লাগল কর্মচারী, যাদের মনে করা হল সন্দেহভাজন।

মিঃ নেভিনসন, লণ্ডনের ডেইলী নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক। ১৯০৭-৮-এ এসেছিলেন বাংলাদেশের ঝোড়ো হাওয়ার গতি-প্রকৃতির বিবরণ সংগ্রহে। নানা সূত্রে তথ্য যোগাড় করে বরিশালে ফুলার রাজত্ব সম্বন্ধে যা জেনেছিলেন তার মর্মকথা হল, ভারতবর্ষের অন্যকোন প্রদেশে গুর্খাদের এই উদ্দাম অত্যাচারের তাণ্ডব ঘটলে —বেধে যেত ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড।

সেই থেকে সমানে চলেছে শস্ত্রপাণি-শাসন। প্রাদেশিক সম্মেলনের বেলায় তা আরো কঠোর।

নেতারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বন্দেমাতরম্ বলবেনই। পুলিস স্থির-সংকল্প, বললেই চলবে লাঠির মারের মাতন।

শেষপর্যন্ত ভেবেচিন্তে পুলিস নেতাদের জানালে—রাজ-বাহাদুরের হাবিলী থেকে কলেজ পর্যন্ত নীরবে যান। সেখান থেকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে পারেন।

নেতাদের একটিই নেতিবাচক উত্তর—না।

"অতঃপর যখন অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির পনরজন সভ্য দুই ঘটিকার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া রাজবাহাদুরের হাবিলীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন পুলিস সাহেব কেম্প তাহাদের গতিরোধ করিয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা সোসাইটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত-ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত করিয়া রক্তপাত

করিল। কৃষ্ণবাবু ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি উহাদিগকে হাবিলীতে প্রবেশ করিতে দেন।”

বরিশালের রাজপথ দিয়ে চলেছে রাজকীয় শোভাযাত্রা। পুরোভাগের শকটে আছেন সভার পুরোহিত সস্ত্রীক আবদুল রসুল আর আবদুল হালিম গজনভি। পিছনের অনুগমনকারীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জননায়কেরা। তাঁদের পিছনে জন-কল্লোল।

“যখন সভাপতি মহাশয়ের শকট লোন আপিসের প্রায় সমীপবর্তী হইল এবং তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রায় একশত প্রতিনিধি নীরবে রাস্তার একপার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন তখন হাবিলী হইতে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাজপথে বাহির হইলেন। যেমন তাহারা বাহির হইলেন অমনি অশ্বারোহী সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হেইন্‌স সাহেব তাঁহাদের উপর দিয়া অশ্ব চালাইয়া দিল। সুপারিন্টেডেন্ট কেম্প সাহেব তাহাদের গমনে বাধা দিল এবং শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর বক্ষ হইতে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রাঙ্কিত উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।”

তারপরেই বিলেতী ঘুষি। প্রভুকে প্রহারে উৎসাহী দেখে ভৃত্যের দল ছুটে এল মহাউৎসাহে। শুরু হয়ে গেল ভূতের নৃত্য। বাবুরাম নামে এক সুবেদার সগৌরবে ঘোষণা করল—“শালা লোককো মারো হুকুম হুয়া।” কনস্টেবলদের হাতের লাঠি লাফিয়ে উঠল বন্যজন্তুর মতো জিঘাংসায়।

বাতাসে আর্তনাদ। মাটিতে রক্ত। সমস্ত ছাপিয়ে উঠল বজ্রগর্জন, বন্দেমাতরম্। মার খেয়েও কেউ নড়ে না এক পা। প্রহৃত তবু প্রস্থানোদ্যত নয়। নিরস্ত্র, তবু নিরস্ত নয়। অত্যাচারের নৃশংসতার মুখে নির্ভীক মাতৃমন্ত্র উচ্চারণে। প্রহারে মূর্ছাগত কয়েকজনকে রাস্তার নর্দমায় ফেলে দিল।

সোসাইটির একজন সভ্য চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা। কনস্টেবলরা মারতে মারতে তাঁকে ফেললে একটা পুকুরের মধ্যে। গলা-পর্যন্ত জলের তলায়। তখনও চলেছে লাঠিরমার। তখনও কিন্তু অত্যাচারিতের গলায় উচ্চারিত হয়ে চলেছে—বন্দেমাতরম্। তাঁর নিজের বর্ণনায় 'অবশেষে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল, আমি পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম; মনে হইল বুঝি আর মুহূর্ত মধ্যে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।'

বাবা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। তিনিও বিপ্লবী। বাবার কাছে ছেলের এজাহার—'বাবা, এই অবস্থায়ও পুলিস আমাকে যতবার প্রহার করিয়াছে আমি ততবারই 'বন্দেমাতরম্' বলিয়াছি।'

"চিত্তরঞ্জনকে যখন পুলিসেরা প্রহার করিতেছিলেন তখন কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল চীৎকার বলিলেন, "মনোরঞ্জনবাবুর ছেলেকে মারিয়া ফেলিল।" ব্যস্ত হইয়া অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ পশ্চাতে ফিরিলেন। ওদিকে হাবিলীর ভিতরে যে সকল প্রতিনিধি ছিলেন তাহারা বাহির হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে অশ্বারোহী হেইন্‌স সাহেব তাহাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিতে লাগিলেন। কনস্টেবলা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাবিলীর ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে নহবতের নিম্নে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিতেছিল। পুলিসের লাঠিতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। পুলিস যখন ফটকের সম্মুখে লাঠি চালাইতেছিল তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত-বেচারাম লাহিড়ী, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের হাবিলী ও রাজপথের সংযোগ সেতুর উপর আসিলেন। পুলিস বেচারাম-বাবু ও রজনীবাবুকে প্রহার করিল। বেচারামবাবু অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পুলিস এমন সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিল যে, তাহার মাথা ফাটিয়া গেল, তিনি ধরাশায়ী হইলেন।"

সহগামীদের প্রতি এই পাশবিক অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করার লোক নন কৃষ্ণকুমার মিত্র। প্রতি রক্তকণিকায় তিনি বিদ্রোহী। সুবেদার বাবুরাম সিংহকে মারলেন এক ধাক্কা, সে ছিটকে পড়ল দূরে। কাছেই ছিলেন কেম্প সাহেব। অকম্পিত কৃষ্ণকুমার কেম্প সাহেবের একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন ঘটনাস্থলে, যেখানে ব্রজেন্দ্রলালের রক্তে মাটি ভিজে। সেই রক্তের রঙ কৃষ্ণকুমারের চোখে। বললেন—তোমার পুলিস গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার করছে। এদের থামাও। নইলে মহাবিপদ ঘটবে।

সাহেবের পাশেই ছিল একটা কনেস্টবল। তার টুঁটি টিপে ধরে বললেন—এই কনস্টেবল হাবিলীর ফটকে গিয়ে প্রতিনিধিদের প্রহার করেছে। আমি নিজে তা দেখেছি।

কুটিল কেম্প বললে—এর নাম শচন্দ্র দে। একে আমি গ্রেপ্তার করলাম। কিন্তু গ্রেপ্তারের কিছুই ঘটল না। কনস্টেবল মিশে গেল তার দলে।

যোগেশ চৌধুরী কেম্পকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—

এই সব কনস্টেবলরা তোমার অধীন। এদের থামাবে কি?

সেটা আমার কর্তব্য। আমি জানি।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ এসে পৌঁছিলেন ঘটনাস্থলে। সুরেন্দ্রনাথের চোখে মুখেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ। কেম্পকে বললেন—

পুলিস এভাবে প্রহার করছে কেন? কেউ কোন অন্যায় করে নি। আর যদি তুমি মনে কর অন্যায় করেছে, গ্রেপ্তার কর। আমি সব দায়িত্ব নিজে নিচ্ছি। দরকার পড়লে আমাকেও গ্রেপ্তার করতে পার।

কেম্প বললে—আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

আমি রাজি।

আমরাও রাজী। আমাদেরও গ্রেপ্তার করা হোকে।

এই বলে এগিয়ে এলেন মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনীকুমার।

কেম্প বললে—আমি শুধু সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার আদেশ পেয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট ইমার্সন সাহেবের বাড়ি। ভিতরে বন্দী সুরেন্দ্রনাথ। বাইরে অপেক্ষমান অশ্বিনীকুমার, জমিদার বিহারীলাল রায়, কাব্যবিশারদ প্রভৃতি কয়েকজন। হঠাৎ সাহেবের চাপরাশী মারফত তাদের ডাক এল ভিতরে।

ভিতরে মাথা গলাতে না গলাতেই গলা-ফাটানো চীৎকার—

বেরিয়ে যাও। তোমাদের মাথায় টুপি নেই।

সত্যিই তো। সকলেই যে ধুতি চাদর পরা। শোলার টুপির সেলাম কই? সাহেবের তো ক্রুদ্ধ হওয়ারই কথা। যে দেবতার যেমন পুজো। অগত্যা তাঁদের সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

তারপরেই শুরু হল বিচারের প্রহসন।

সুরেন্দ্রনাথ ফৌজদারী আইনের ১৮৮ ধারার অপরাধী। সুতরাং দু'শত টাকা জরিমানা। অপরাধ? সেটা একমাত্র ঈশ্বরেরই অবগত।

বিচার শেষ হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ বললেন—

This is disgraceful.

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—I protest such a remark, a remark of this kind ought not to come from the court.

গর্জে উঠলেন বিচারপতি।

চুপ করুন। আপনি আদালত অবজ্ঞা করেছেন। আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু করছি।

যা খুশী করতে পারেন, আমি কোন অন্যায় করি নি।

আবার এক প্রস্থ বিচার-পর্ব। আবার দুশো টাকা জরিমানা।

ম্যাজিস্ট্রেটের পাশেই ছিল তার এক সিবিলিয়ান বন্ধু। তিনি ইমার্সনের তেলে-বেগুনে মেজাজকে ঠাণ্ডা করতে কি যেন মন্ত্রণা দিলেন। ইমার্সন এবার একটু নম্র। বিষ না থাকলেও কুলপানা চক্র তো আছে। ইমার্সন বললেন—

I give you an oppourtunity to apologise.

সুরেন্দ্রনাথের সংকোচহীন কণ্ঠের উত্তর—আমি ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করছি সবিনয়েই। আমি কোন অন্যায় করি নি।

বিচার শেষ। একঢিলে দুটো পাখি মারলেন ইমার্সন। সুতরাং জরিমানা দাঁড়ালো চারশো টাকা। সুরেন্দ্রনাথ সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যথাসময়ে। এবং যথাসময়েই হাইকোর্টে তিনি আপীল করেছিলেন তাঁর প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে। তাতে ফেরত পেয়েছিলেন জরিমানার টাকা। হাইকোর্টের রায়, সুরেন্দ্রনাথ আদালত অবমাননার মতো কিছুই করেন নি। বরং উল্টো অভিযোগ—তাঁকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি আত্মপক্ষ সমর্থনের।

এদিকে যখন চলেছে বিচারের প্রহসন, ওদিকে তখন বিশাল জনমণ্ডলী বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে শহর কাঁপিয়ে এগিয়ে গেছেন সভাস্থলে, পুলিসী তাণ্ডবের কাছে পরাভূত না হয়ে। সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে যথারীতি। অশ্বিনীকুমার অনুপস্থিত। তাঁর মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করে শোনালেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

"সময়ের গতি যিনি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের জন্মভূমির মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বলাভের সময় আগতপ্রায়। ব্রিটিশ রাজত্বের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ যেদিন পৃথিবীর অপরাপর জাতির মধ্যে আসন লাভ করিবে সেদিন অদূরে। পূর্বগৌরব এবং মহত্বলাভের উপায় বিস্মৃত হইয়া যখন ভারতবর্ষ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছিল, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর ভারতবর্ষকে অপর একটি নবজাতির সংস্পর্শে আনিয়া দিয়াছেন। এই

উদীয়মান জাতি আত্মশক্তি বলে বিভিন্ন দিকে অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছে এবং অধুনা সমগ্র পৃথিবীর প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। অধুনা-বিরল মহৎ লোকদিগের যত্ন ও চেষ্টায় এই উভয় জাতির এই সম্মিলন যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা কি জাগিয়া উঠে নাই? সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিয়া পৃথিবীর এক শক্তিশালী জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় নাই? যুগ-যুগান্তরের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কার্য করিবার চেষ্টা করিতে কি আমরা আরম্ভ কবি নাই? কুসংস্কার এবং মূর্খতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতজননীর নামে আমরা কি এদেশের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছি না? ভগবানের আশ্চর্য বিধান লক্ষ্য করুন—যাঁহার অনুপম প্রতিভা সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতির বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যিনি নব্যভারতের পিতৃপদবাচ্য; সেই যুগপ্রবর্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী মহৎ ব্যক্তিগণের কার্যাবলী, প্রাচীন ভারতের দৃষ্টান্তে পুনরায় মনুষ্যত্বলাভের শিক্ষা দিবার জন্য প্রতীচ্য জগৎ হইতে কর্নেল অলকট্‌, মাডাম ব্লাভাটাস্কি ও মিসেস এনি বেসান্টের আগমন, সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের মহৎ কার্য, আলিগড় মুসলমান কলেজ, ফারগুসন কলেজ, শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির স্বদেশ কল্যাণ বিষয়ক কার্যকলাপ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির সমন্বয়কর জাতীয় মহা-সমিতির রাজনৈতিক শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান এবং সামাজিক সমিতি-সমূহ কর্তৃক যে সমস্ত মঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহা, চিরস্মরণীয় ব্রাডল ও কেইনের কার্য, কংগ্রেসের স্থাপিতা মিঃ হিউম ও ভারতীয় পার্লামেন্টারী কমিটির মাননীয় সভ্যগণের পরহিত প্রণোদিত কার্য, সর্বত্র অগ্নির ন্যায় যাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে

সেই স্বদেশীভাব এবং ১৬ই অক্টোবরের বিরাট আন্দোলন এই সমস্ত এবং উদীয়মান জাপানের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীর সম্মুখে স্থাপন ভারতের পুনরুত্থানের জন্য বিশ্বপতির বিধান। সমগ্র দেশ নব চিন্তা, নব আদর্শ এবং নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত হইতেছে। রাজ-কর্মচারীগণের অত্যাচার অবিচারে এই নূতন স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে।...

"বর্তমানকালে বিশেষভাবে যে ব্যাপার আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে আমি এখন সেই বঙ্গবিভাগের কথা বলিব। এই ব্যাপারের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে ক্লেশকর। ভারত-সচিব বলিয়াছেন যে, বঙ্গবিভাগের আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। ভগবান জানেন, আমরা কি পাইতেছি। আমি মিঃ জন মার্লিকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তিনি কি আশা করেন যে, এরূপ একটা ব্যাপারের কারণ বিদূরিত না হইলে সভ্য-জগতের কুত্রাপিও আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে? এরূপ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া তিনি কি আশা করিতে পারেন? একদল আত্মম্ভরী ও অত্যাচারী ব্যক্তি একটা সমগ্র জাতির হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক এবং বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি সর্বপ্রকার স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লজ্জের ন্যায় জাতীয় প্রতিবাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন।...স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তীব্র অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে অত্যা-চারিত ব্যক্তি ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করিবার আশা করা যায় কি? কিন্তু স্যার ব্যামফিল্ড এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। "কোন জাতিই আইন দ্বারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তি দ্বারা তো নয়ই।" লাট্ ফুলার তাঁহার

দেশবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম সূত্রই বিস্মৃত হইয়াছেন! যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন তিনি গুর্খা সৈন্য স্থাপন, পিউনিটিভ পুলিস স্থাপন, স্পেশাল কনস্টেবল সম্প্রদায় গঠন, প্রকাশ্যস্থানে পবিত্র 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান নিষেধ, প্রকাশ্যস্থানে সভা নিষেধ প্রভৃতি আইনজারি করিলেন। যাহার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে?"

পরবর্তী বক্তা ভূপেন্দ্রনাথ বসু। সভাপতি বরণ করতে উঠে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তার প্রতিটি শব্দ যেন আগুনের ফুল্‌কি। বললেন, এতদিন ইংরেজের আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ছিল অবিচলিত। কিন্তু আজ যে ব্যাপার ঘটল তা দেখে জনসাধারণের মন থেকে মুছে গেল।

মন থেকে মুছে যাবার নয়, এমনি এক অবিস্মরণীয় দৃশ্যও ঘটেছিল সেদিনের সভায়। প্রত্যক্ষদর্শী সুরেন্দ্রনাথের বর্ণনা। "সভায় এসে দাঁড়ালেন বাবু মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। সঙ্গে পুত্র চিত্তরঞ্জন। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। পিতা ও পুত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পিতা বলে চলেছেন পুত্রের প্রতি নির্যাতনের নিষ্ঠুর কাহিনী। পুত্রের গায়ে বর্বর আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন। এই দৃশ্য কখনো ভোলার নয়। পরে এই দৃশ্যকে রূপ দেওয়া হয়েছিল একটা ছবিতে। ১৯০৬-এর কলকাতা-প্রদর্শনীতে সেটা ছিল একটা জনপ্রিয় দর্শনীয় বস্তু। লর্ড মিণ্টো উদ্বোধন করেছিলেন সেই প্রদর্শনী।"

সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে আবদুল রসুল বললেন—"হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এক জননী জন্মভূমির সন্তান এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হিন্দুর সহিত অভিন্ন। ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ চীন, তুরস্ক ও জাঞ্জিবার দেশীয় মুসলমানদের স্বার্থ এক হইতে পারে। কিন্তু

রাজনৈতিক অভিযানে আমরা স্বদেশীয় হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সহযাত্রী।”

সভাপতির ভাষণের পর অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ উঠলেন মঞ্চে। তাঁর প্রস্তাব, যেহেতু আজ প্রকাশ্য দিবালোকে সমস্ত শহরবাসীর সামনে সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ নির্যাতিত হয়েছেন সরকারী পুলিসের হাতে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দী হয়েছেন বিনা অপরাধে, তাতে প্রমাণিত হয় যে এদেশে বৈধ শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। সুতরাং বর্তমান গবর্নমেণ্টের উপর যে সকল কার্যের ফলাফল নির্ভর করে, এ বছরের সমিতি সে-সবের আলোচনা থেকে বিরত হয়ে কেবলমাত্র দেশের আত্মশক্তি বিকাশের সহায় যা কিছু তাই নিয়েই আলোচনা করবে।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে উঠে দাঁড়লেন ব্রহ্মবান্ধব আর ‘হাওড়া হিতৈষী’ সম্পাদক গীস্পতী রায় কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তারা।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন সভাস্থলে।

“সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলে, সহস্র সহস্র লোক আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইল। প্রায় দশ মিনিটকাল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পরে সভা যখন নিস্তব্ধ হইল তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার অগ্নিময়ী বক্তৃতায় বিদেশজাত পণ্যদ্রব্য বর্জনের জন্য মাতৃভূমির নামে সকলকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করাইলেন।”

প্রাদেশিক সমিতির দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রস্তাব করা হল যে, যেখানে গতকাল সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেখানে গড়তে হবে একটা স্মৃতিস্তম্ভ।

পরবর্তী প্রস্তাব বিলেতী দ্রব্য বর্জন ও শপথ গ্রহণ।

"জগদীশ্বর ও জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা সাধ্যমত বিদেশী পরিত্যাগ এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।"

সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এক একটি করে শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ পুনরুচ্চারণ করেন সেটাই।

বিলেতী দ্রব্য বর্জন প্রসঙ্গে একে একে বক্তৃতা করলেন ডাক্তার আবুল হোসেন, ভূপেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। তারপরে বলতে উঠলেন কাব্যবিশারদ। বক্তৃতা চলেছে। এমন সময় সভাক্ষেত্রে আবির্ভাব মূর্তিমান উপদ্রবের।

সকলের আগে সেই কুখ্যাত কেম্প সাহেব। তার পিছনে আর একজন শ্বেতাঙ্গ। তারও পিছনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী। কেম্পকে দেখামাত্রই সারা সভা জুড়ে উচ্চকিত হয়ে উঠল প্রবল উত্তেজনা। কেম্প বোধহয় কিছুটা কম্পিত তখন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আশা করি আপনার কাছে থাকলে আমি নিরাপদে থাকব।

সে তো থাকবেন। কিন্তু আগমনের আসল উদ্দেশ্যটা কি?

কেম্প বললে, সভাভঙ্গের পর কেউ রাজপথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে পারবেন না, নেতাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

যদি না দিই?

এখুনি সভা ভেঙে দিতে হবে।

যদি না দিই?

শুরু হবে বলের বলাৎকার।

বিপিন পাল প্রমুখ কয়েকজন সভা ভেঙে চলে যাবার পক্ষে মত দিলেন। কৃষ্ণকুমার প্রমুখেরা জানালেন, লাঠি বা বন্দুকের গুলি চালিয়ে পুলিস সভা ভঙ্গ করুক। তার আগে আমরা এস্থান ত্যাগ করছি না।

কেম্পের দ্বিতীয় দফা হুঁশিয়ারী—আমি আপনাদের সভা ভেঙে

চলে যেতে বলছি। দু'ভাবে এ কাজ হতে পারে। এক পুলিসের তাড়না। আর এক আপনাদের নিজেদেরই নীরবে স্থানত্যাগ।

"অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিলেন, 'যাও, সকলে গৃহে যাও। গৃহে গৃহে সভা হউক। চতুর্দিকে আগুন জ্বলুক, সে আগুনে চিরদিনের মত বিলাতী জিনিস দগ্ধ হউক।' রোষে, ক্ষোভে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে সভা হইতে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি তখনও বলিতেছিলেন—'পুলিস আমাকে লাঠি মারিয়া বা গুলি করিয়া তাড়াইয়া দিউক।' এইরূপে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির আরব্ধ কার্য অকালে শেষ হইল।"

যাঁর লেখা থেকে উধৃত হল এই সব বিবরণ, তিনি সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী, অশ্বিনীকুমারের 'চেলা' দলভুক্ত শরৎকুমার রায়।

বরিশালের সভা অপূর্ণ রয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু বরিশাল পুণ্য হল লাঠির ঘায়ে। সভা শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঘোষণা করেছিলেন—'আজ থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানের সূচনা হল।'

বরিশালের সভা শুরু হয়েছিল বছরের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখে। নতুন বছর নিয়ে এল নতুন প্রাণের সাড়া। কপালে পরিয়ে দিলে রক্ততিলকের ফোঁটা।

রাজনৈতিক সম্মেলন পণ্ড হল। আরও একটা সম্মেলন বাকী। সেটা সাহিত্যের। সভাপতি—রবীন্দ্রনাথ। উদ্যোক্তা লাখুটিয়ার তরুণ জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরী। বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশটা দু-ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতির শিকড় এক জায়গাতেই। ভাগ হয়েছে শুধু ভূগোলের। ভাব, ভাষা শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এসব তো ভাগাভাগির নয়। বিভেদের ছিদ্র দিয়ে যাতে বিচ্ছেদ মাথা গলাতে না পারে তারই প্রতিরোধে এই সম্মেলন।

নৌকা যোগে রবীন্দ্রনাথ যখন বরিশালে পৌঁছলেন, তখন শহর জুড়ে চলেছে পিউনিটিভ পুলিসের তাণ্ডব নৃত্য। রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন নৌকোতেই।

সম্মেলনের উদ্যোক্তরা সংকুচিত। সংকটাপন্ন। তাঁরা এসে কবিকেই পরামর্শ চাইলেন, কি করা উচিত। শহরে অশান্তি।

ওদিকে এমার্সনের শর্তটাও অপমানজনক। 'বন্দেমাতরম্' বলা চলবে না। অধিবেশন কি বসবে?

অধিনায়ক জবাব দিলেন—না।

বক্তৃতা রইল পকেটে। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন।

বরিশালের খবর বাতাস এনে ছড়িয়ে দিল কলকাতায়। লাঠির ঘায়ে বরিশাল পুণ্য হয়েছে, কিন্তু সম্মেলন সম্পূর্ণ হয় নি। ১৫ই এপ্রিল বেরুল উপাধ্যায়ের সন্ধ্যার বিশেষ সংখ্যা। তাতে বরিশালের পুলিসী-বর্বরতার বিস্তৃত বিবরণ। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ সভা গোলদীঘিতে। পরের দিন আরেক সভা বিডন উদ্যানে। আবার সভা ডাকা হল ১৮ই এপ্রিল, গোলদীঘিতে। বরিশাল থেকে ফিরছেন নেতারা। মাথায় তাদের লাঞ্ছনার মুকুট। এবার গলায় তুলে দিতে হবে শ্রদ্ধার মালা। বরিশাল যজ্ঞের অন্যতম অপরাজের অগ্নিহোত্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মচরিতে বর্ণনা দিয়েছেন সেই স্মরণীয় দিনের।

"১৭ই এপ্রিল আমরা বরিশাল ত্যাগ করিলাম। বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত যত ষ্টীমার স্টেশন ছিল সর্বস্থানেই গভীর গর্জনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে নানা শ্রেণীর লোক সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু সকল স্থানেই বক্তৃতা করিয়া সমবেত লোকদিগকে বঙ্গভঙ্গ নিবারণের জন্য দৃঢ় সংকল্প হইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ১৮ই এপ্রিল প্রত্যুষে আমরা শিয়ালদহ পৌঁছিলাম।

বরিশালের ঘটনার সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার লোক এমন উত্তেজিত হইয়াছিল যে প্রায় দশ হাজার লোক রাত্রি তিনটার সময়ে কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া চারিটার পর শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করেন। ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, য়্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির যুবকগণ এবং আমি ট্রেন হইতে নামিলাম। অমনি দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উত্থিত হইল। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ স্বদেশী দ্রব্যসমূহ মস্তকে বহণ করিয়া, 'মাগো, যায় যাবে চলে, জগৎ মাঝে, তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে'—গাহিতে গাহিতে স্টেশন হইতে বহির্গত হইলেন। তখন অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি যে গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, বহু সংখ্যক যুবক তাহার ঘোড়া খুলিয়া দিয়া কলেজ স্কোয়ারে টানিয়া আনিল।

ব্যারিস্টার মিঃ আশুতোষ চৌধুরী কলেজ স্কোয়ারের সভায় প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেন। তিনি অতি ধীর স্থির ব্যক্তি ছিলেন। বরিশালের ঘটনা তাঁহার মত লোককেও উত্তেজিত করিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিয়া বঙ্গভঙ্গ খণ্ডন ও স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিতে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন। মৌলবী মজিবর রহমান ও মৌলবী লিয়াকত হোসেন বরিশালের ব্যাপারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তীব্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অতঃপর অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির ৪নং কলেজ স্কোয়ার কার্য্যালয়ের সম্মুখে এক সভা হয়, তাহাতে কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, গীষ্পতী কাব্যতীর্থ ও আমি বক্তৃতা করি। সমবেত জনসমুদ্র বরিশালের ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে আমরা তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিলাম।"

সভার পর সভা। ২০শে এপ্রিল ছাত্রদের। স্থান মিলন-মন্দিরের মাঠ। ২৮শে এপ্রিল নেতাদের। স্থান পশুপতি বসুর

বাড়ির সামনে মাঠ। বরিশালের বেদনা যেন সারা বাংলাদেশ, সারা কলকাতা বুক পেতে নিতে প্রস্তুত। রমাকান্ত রায় তখন রাণীগঞ্জে। প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাশায়ী। বরিশালে তাঁরও যাওয়ার কথা ছিল, প্রতিনিধিরূপে। প্রতিবন্ধক হল বিকল স্বাস্থ্য। সেই থেকে বিরামহীন জ্বর। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থা। বরিশাল-প্রত্যাগত সহকর্মী ও অনুচরদের কাছ থেকে সেই সময়েই তাঁর কাণে এল সেখানকার অবর্ণনীয় অত্যাচার আর পীড়নের মর্মান্তিক ঘটনাবলী। অসুস্থ শরীরেও শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠলেন রমাকান্ত।

'ভগবান! এত অপমান আর সহ্য হয় না।'

প্রিয়জনেরা তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু আহত অন্তর্বেদনায় তিনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত।

'আমি কেন বরিশালে গিয়ে আর দশজনের সংগে মার খেলাম না।' চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা। সেই সঙ্গে ক্রমাগত একটি মাত্র উচ্চারণ, অস্থির উন্মাদনা—

'প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা—'

শুশ্রূষার জন্যে রাণীগঞ্জ থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির কর্মীরা কোমর বেঁধে দাঁড়াল তাঁকে সুস্থ করে তোলার উদ্যমে। কিন্তু সব ব্যর্থ। মৃত্যু হল মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধার। রমাকান্তের অন্যতম সুহৃদ, সহযোগী ও সেবক, শচীন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতির তর্পন এই প্রসংগে স্মরণীয়।

"এবার বরিশাল কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্য-ব্যপদেশে আমাকে ময়ূরভঞ্জ যাইতে হয়। সেখানে থাকিতে সংবাদ পাইলাম, রমাকান্তবাবু আর ইহলোকে নাই; তাঁহার মৃত দেহ পুষ্পমণ্ডিত করিয়া সোসাইটির হলে সভ্যেরা বহিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার আত্মার মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রার্থনা হইয়াছিল। কর্মীর বেশে যে গৃহে রমাকান্ত প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে সোসাইটির জন্য মফঃস্বলে কার্য

করিতেছিলেন, জীবনের অবসানে তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই গৃহেই চিরশান্তি লাভ করিল। কর্মের জন্য যে গৃহ হইতে একদিন তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ কর্মাবসানে তিনি সেখানে সজ্ঞানে ফিরিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই পরিচিত প্রিয়স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং মৃতেরা যে ভাষায় কথা বলে, তিনি সেই ভাষায় আমাদিগকে জন্মভূমির সেবার জন্য আকুল কণ্ঠে শেষ আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। মরিবার পূর্বে তিনি আমাদিগকে শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন "প্রতিহিংসা"।

বরিশালের পুলিশের লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া তিনি অসুস্থাবস্থায় শয্যাগ্রহণ করেন ; সে শয্যা হইতে আর উঠিতে পারেন নাই। প্রবল বিকারের সময় শুধু বরিশালের অত্যাচারের কথাই বলিতেন এবং "প্রতিহিংসা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সোসাইটির সভ্যদিগকে পুলিস লগুড়াঘাতে জর্জরিত করিয়াছে, এ নিদারুণ অপমান তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যু-কালে সোসাইটির সভ্যদিগকে ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে যাইতে দিতেন না ; কারণ তাহাদিগকে দেখিলে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন এবং বিকার আরও প্রবলাকার ধারণ করিত। এইরূপ বিকারের মধ্যে হঠাৎ একদিন প্রত্যূষে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।"

বরিশালের উত্তেজনার রেশ দীর্ঘদিন ধরে বাজতে লাগল দেশের প্রাণের ভিতরে।

বরিশাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনের একটা ঘটনা।

অধিবেশনে প্রস্তাব উঠেছিল যেখানে স্বদেশপ্রেমিকদের ওপর বর্বর অত্যাচার, লাঞ্ছনা করা হয়েছে, সেইখানেই গড়া হবে একটা স্মৃতিস্তম্ভ। সুতরাং তার জন্যে টাকা চাই। অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের সকলের কাছেই কর্তৃপক্ষের আহ্বান এল, স্মৃতি-স্তম্ভের জন্যে যাঁর যা সম্ভব দান করুন মুক্তহস্তে।

প্রথম দিনের অধিবেশনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনে জনসমাগম অনেক বেশী। সারা বরিশালে সকাল থেকে জনরব, বন্দেমাতরম্ বললেই আজ আর শুধু রেগুলেশন লাঠি নয়, চলবে রেগুলার গুলী। মাথার খুলি ফাটবে। ঝাঁঝরা হয়ে যাবে পাঁজরা। সরকার জানে কি করে অমান্য অবাধ্যদের বধ করতে হয়।

ফল হলো উল্টো, দুঃসংবাদ শুনেই যেন বেড়ে উঠল দুর্বিনীত জেদ। জনসমাগমে লাগল জোয়ার। তার মধ্যে নারীর সংখ্যা নগণ্য নয় মোটেই, প্রথম দিনের অধিবেশনে উপস্থিত নারীর সংখ্যা ছিল দু'শো। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা বিদ্রোহিনী নারীর সংখ্যা দ্বিতীয় দিনে দাঁড়ালো পাঁচশো।

স্মৃতিস্তম্ভ গড়ার আহ্বান তাঁদের কাণেও এসে পৌঁছিল। লোকে অর্থদানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসে নি। তবু অর্থাভাব হোল না, যার যা ছিল হাতের কাছে, নিঃশেষে তুলে দিল স্মৃতিস্তম্ভ তহবিলে।

বরিশালেরই একটা গ্রাম, নাম নরোত্তমপুর। তারই একজন অধিবাসী হলেন তারাপ্রসন্ন বসু। সরোজিনী দেবী তাঁরই স্ত্রী। স্মৃতিস্তম্ভের জন্যে তিনি যাকে বলে মুক্তহস্ত হয়ে দান করা তাই-ই করলেন তিনি। খুলে দিলেন ডান হাতের সোনার বালা। তাঁর এই দানের কথা শুনে সেদিনের সভায় জেগে উঠল তুমুল আলোড়ন। ব্যাপারটা কিন্তু শুধু দানেই শেষ নয়। স্বর্ণবলয়ের সংগে সংগেই একটা ছোট্ট চিঠিও এল অশ্বিনী দত্তের হাতে। পত্রবাহক সরোজীনি দেবীর পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলে হেমচন্দ্র।

বন্দেমাতরম্

পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলেষু,

শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে আমার ক্ষুদ্র দান গৃহীত হইয়াছে। খোকামণিকে দিয়া ডান হাতের বালা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা

করিলাম যে, যে পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্' বলা নিষেধী-সার্কুলার রহিত না হইবে, সে পর্যন্ত ঐ হাতে আর সোনার বালা পরিব না, বন্দেমারম্।

সেবিকা

শ্রীসরোজিনী দেবী।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'যজ্ঞ-ভঙ্গের' লেখক প্রিয়নাথ গুহর বিবরণ। "সতী রমণীর এই অসাধারণ আত্মত্যাগের ফলেই হউক, আর যে কারণেই হউক, পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেণ্ট 'বন্দেমাতরম্' সার্কুলার প্রত্যাহার করিয়াছেন। সার্কুলার উঠিয়া যাইবার পর তারাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রী নূতন স্বর্ণবলয় প্রস্তুত করিয়া হস্তে পরিয়াছেন। পাঠক-গণের অবগতির জন্য এখানে বলিতেছি যে, দেশের বিপদকালে কেশ-বিন্যাস না করিলে দেশের মঙ্গল হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বাখরগঞ্জের অনেক রমণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'বন্দে-মাতরম্'-সার্কুলার উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা আর চুল বাঁধিবেন না। এতদ্ব্যতীত বাখরগঞ্জের অনেক রমণী এ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছেন যে বঙ্গ-বিভাগ রহিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা আর চুল বাঁধিবেন না। বাখরগঞ্জবাসিনী রমণীদিগের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে ও হইতেছে। দেশের দুঃখ-দুর্দশা মোচন কল্পে বাখরগঞ্জবাসিনী রমণীদিগের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 'বরিশাল হিতৈষী' হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

'ধন গৌরবে বরিশালের অগ্রগণ্যে কলসকাঠিতে কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে যাইয়া যে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম; তাহা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না। দেখিলাম যে, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিতা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুল-ললনাগণ, গৈরিক বসন পরিধান করতঃ সাধব্য লক্ষণ শঙ্খমাত্র ভূষিতা হইয়া স্থানীয় অন্যতম জমিদার ব্রজকান্তবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতেছেন। কৌতূহল বশতঃ তাঁহাদের পশ্চাত-বর্তিনী জনৈকা পরিচারিকার নিকট বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিলাম যে, ঐ সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান না হইবেক, যে পর্যন্ত আপনাদিগের স্বামী পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণ আত্মরক্ষা করিতে এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিতে সমর্থ না হইবেক, সে পর্যন্ত তাঁহারা ঐরূপ বেশেই থাকিবেন। অনেকে আবার সংকল্প করিয়াছেন কবরীবন্ধনও করিবেন না। আভরণ-প্রিয়া ললনাদিগের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে রোমাঞ্চিত হইয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম, মা তোমরা পাণ্ডব কুলবধূর ন্যায় আপনাদিগের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন করতঃ ভারতে পুনরায় ধর্মরাজ্য স্থাপনের সহায় হও।"

ইতিহাসের পটভূমিকায় বরিশালের ঘটনা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল পর্ব, প্রচণ্ড পদক্ষেপ। একদিকে এইখানেই প্রথম জাঁকিয়ে উঠল স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের মারমুখী আক্রোশ। অন্যদিকে এইখানেই প্রথম জন্ম নিল বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে মরনপণ সংগ্রামের সুদৃঢ় শপথ। সে সংগ্রাম আক্রমন-কারীর বিরুদ্ধে শুধু বিদ্রোহী বাক্যের আস্ফালন নয়। শুধু আবেদন-নিবেদনের ভাষায় লেখা রাজার প্রতি অনুগত প্রজার বিচার প্রার্থনা নয়। সরাসরি বিপ্লব চেতনার অঙ্কুর পাতা ছড়াতে শুরু করলে অত্যাচার-লাঞ্ছিত বরিশালের ঐতিহাসিক অধিবেশনের পর থেকে।

সেদিনের বরিশাল-যজ্ঞের নেতা সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলা-দেশে যে আলোড়ন উঠেছিল, তার ঢেউ গিয়ে পৌঁচেছিল ভারত-বর্ষের প্রান্তে প্রান্তে। 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় বরিশাল অধিবেশনের দশ দিন পরে বেরিয়েছিল একটা কবিতা, সুরেন্দ্রনাথের বন্দনায়—

"He comes ! the conquering hero comes ;
Sing poems, brother ! sound the drums !
Ye, men and women of Bengal
With patience wait the tyrant's fall.

The scales have fallen from your eyes,
On ! On ! where path of honour lies,
On ! On ! if needed, freely bleed,—
For, Patriot's blood is freedom's seed."

'যুগান্তর' ঠিক একই কথা লিখেছিল বরিশাল অধিবেনের সাত দিন পরে।

"The thirty crores of People of India must raise their hands to stop the curse (Barisal happenings) of oppression. Force must be met by the force.

'সন্ধ্যা' লিখলে, এবার চাই লাঠির বদলে লাঠি।

এইখানেই নরমপন্থীদের সংগে চরমপন্থীদের বাধল বিরোধ। বরিশাল-ঘটনার পর কিছুদিন মাত্র সভা-সমিতির উত্তেজনার।

সভার চাপে জোড়া লেগে ছিল নরমপন্থী গরমপন্থীদের মধ্যেকার চাপা বিরোধ। কিন্তু বেশী দিন চাপা রইল না।

নরমপন্থীদলের কাগজ 'হিতবাদী'। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। হিতবাদীতে বেরুল একটা ব্যঙ্গচিত্র। চরমপন্থীদলের দুই নেতা বিপিন পাল ও ব্রহ্মবান্ধব তার উপলক্ষ্য। বরিশালে কনেস্টবলরা লাঠি পেটাচ্ছে প্রতিনিধিদের। আর সেই লাঠির ভয়ে ঐ দুই নেতা ছুটে পালাচ্ছেন প্রাণপণে। ব্যঙ্গচিত্রের নীচে কাব্যবিশারদের লেখা ছড়া।

আত্মশক্তির পরিণাম।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম—
চম্পটে চট্‌পটে হয়ে
পগার পারে চল্লে,
ঐ গো ডি ডি ধল্লে !

কাব্যবিশারদের উস্‌কানিতে নয়, ইতিহাসের চলমান নিয়মেই বরিশাল কনফারেন্সের পর থেকেই ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করল

নরম ও চরম এই দুই দলের বিরোধ। নরমপন্থী (moderate) দলের নেতা সুরেন্দ্রনাথ। চরমপন্থী (extremist) দলের নেতা বিপিনচন্দ্র।

বরিশাল থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথের মন ভাঙা। রাজনীতির আগুনে খেলায় যোগ দিতে তাঁর মনের বারণ। 'বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে।' ছাড়লেন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক পদ। অবশ্য বঙ্গ-দর্শন তাঁকে ছাড়ল না। আপাতত ভুলতে চাইলেন দেশের ভাবনা। কিন্তু নাড়ীর মধ্যে যার অবিরল স্পন্দন সেই দেশ, দেশের মাটির টান তাঁকে তা ভুলতে দিল না। তাঁকে ব্যথিত করে তুলল নরম বনাম গরম বিরোধ। যে-সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন ঐক্য, তখন চারিদিকে অন্তর্বিরোধ, মত বিভেদের দূষিত পরিবেশ দেখে বিষণ্ণ কবি অস্থির হয়ে ছুটে এলেন কলকাতায়।

কলকাতা। ১৫ই বৈশাখ। পশুপতি বসুর বাড়ির প্রাঙ্গণে মহতী জনসভা। রবীন্দ্রনাথ পড়লেন তার 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ।

"ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। সুতরাং কোন একজনকে আমাদের 'দেশনায়ক' বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।...সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।"

বিপুল করতালিতে নন্দিত হল কবির আহ্বান। কিন্তু সেটা মত-সংঘর্ষের বৃহৎ ছিদ্রে সাময়িক একটা জোড়াতালি হল মাত্র। অনতিকাল পরেই নিন্দিত হল কবির আহ্বান।

নরম বনাম গরমের সংঘাত ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে আরও প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রইল।

———



সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। তাই বলে ষড়যন্ত্র থেমে নেই নখ-দাঁত গুটিয়ে। সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে সূর্যের উদ্ভাসিত আলোর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। ষড়যন্ত্র এগিয়ে চলেছে মাটির তলায় গোপন সুড়ঙ্গ কেটে, ছদ্মবেশে, রাত্রির কুটিল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

যত বাড়ছে আন্দোলনের শক্তি ততই বেড়ে চলেছে শহরে-গ্রামে সংগ্রামে যোগদানকারী ছাত্রের সংখ্যা। পড়ে রইল স্কুলের পড়া। কলেজের ক্লাস। দলে দলে ছাত্ররা নেমে আসছে দেশের গর্জে-ওঠা প্রাণের সাড়ার ভিতর। তাদের প্রাণ-কল্লোলের স্পর্শে যা ছিল তরঙ্গ তা হয়ে উঠছে বিক্ষুব্ধ স্রোতধারা।

এতদিন বয়কট আন্দোলন চলছিল শুধু বিদেশী পণ্য বর্জনকে কেন্দ্র করে। উদ্দাম জলতরঙ্গ মুখ ঘোরাল আরেক উদ্যমের মোহানার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরীভূত করতে হবে বিজাতীয় শিক্ষার প্রাধান্য। শিক্ষার ভার নিতে হবে নিজেদের হাতে। শিক্ষার গড়ন হবে দেশের উপযোগী, দেশের সংস্কৃতি—ঐতিহ্য-র প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মেরুদণ্ডহীন সরকারী অনুগ্রহপ্রার্থী শিক্ষিত চাকুরে সৃষ্টি নয়, বৃহৎ জাতীয়বোধ ও পরিপূর্ণ মানবিকতা বোধে দীক্ষিত মানুষ গড়ার পক্ষে সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনই হবে জাতীয় শিক্ষার মূল কথা।

১৬ই অক্টোবরের পর মাত্র এক সপ্তাহ কেটেছে। এই সময়ে দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ছাত্র-বিক্ষোভ, ছাত্র সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনাকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে সরকার জারী করলেন এক পরোয়ানা। আশ্চর্য, জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের আন্দোলনের গড়ে ওঠার পক্ষে এই সময়ে ইন্ধন যোগাল কুখ্যাত-সেই কার্লাইল সার্কুলারই। সেই পরোয়ানা অনুযায়ী ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি, রাজনৈতিক সভা-সমিতি, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বন্দেমাতরম্ গাওয়া বারণ।

বাংলার প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে পাঠান হয় ঐ সরকারী সার্কুলার। ম্যাজিস্ট্রেট পাঠালেন প্রত্যেকটি স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে। কর্তৃপক্ষ শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে। ২২শে অক্টোবর ৫ই কার্তিক স্টেটস্‌ম্যানে ছেপে বেরোল পরোয়ানা।

১। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্প্রতি ছাত্রগণকে যে সকল কার্যে নিযুক্ত করা হইতেছে, তাহাত শিক্ষা ও শাসননীতি একেবারে বিপর্যস্ত হইতেছে। ইহা ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্ঠকর। গবর্নমেন্টের সাহায্য বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে এইরূপ ব্যবহারে প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না।

২। অতএব আপনার অবগতি ও উপদেশের জন্য জানাইতেছি যে, স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে যদি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান হইতে নিবৃত্ত না করেন কিংবা তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন সংসৃষ্ট বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী ক্রয়-বিক্রয় নিবারণ (Picketing) ইত্যাদি অপকার্য হইতে বিরত না রাখেন, তাহা হইলে উক্ত স্কুল ও কলেজসমূহ গবর্নমেন্টের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে ; উহারা আর গবর্নমেন্টের বৃত্তি লাভার্থে প্রতি-যোগিতা করিতে পারিবে না ; এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ সকল স্কুল ও কলেজের সহিত সংশ্রবচ্ছেদ করিতে বলা হইবে। স্কুল ও

কলেজের কর্তৃপক্ষগণ বাস্তবিক চেষ্টা করিয়াও যদি ছাত্রদিগকে নিবৃত্ত রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবিলম্বে অবাধ্য ছাত্রদিগের নামের তালিকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন এবং উক্ত ছাত্রদিগের শাসনের নিমিত্ত তাঁহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখ করিবেন।

৩। আমি একথাও জানাইয়া রাখিতেছি যে, কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা গোলযোগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইলে, শান্তি রক্ষার্থ উক্ত স্কুল বা কলেজের শিক্ষক ও ম্যানেজারদিগকে স্পেশাল কনস্টেবল নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদিগের কার্য বিশেষ ফলদায়ক ও মূল্যবান হইবে; কারণ ছাত্রেরা ইহাদিগকে মান্য করিতে বাধ্য এবং ইহারাও ছাত্রদিগকে সনাক্ত করিতে পারিবেন। যাঁহাদিগের নিকট এই পরোয়ানা প্রেরিত হইল, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা ইহার মর্ম তাঁহাদের অধস্তন কর্মচারীদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থানার কর্মচারীদিগকে আদেশ করিবেন যে ছাত্রগণ যদি প্রথম দফায় উল্লিখিত কোনরূপ অন্যায় আচরণ করে, তবে থানার কর্মচারীগণ তাহা রিপোর্ট করিবেন।

সার্কুলার প্রচারের দু-দিন পরেই কলকাতার ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমীর ঘরে সভা বসল। ঘর ভরা লোক। সভাপতি এ. রসুল। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে আছেন বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি। সভাপতির ভাষণে রসুল সাহেবের তেজস্বী কণ্ঠ ঘোষণা করলে, "আজ মহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। হিন্দু ও মুসলমান-দিগের মধ্যে যাঁহারা জমিদার, ও বণিক আছেন তাঁহারা আজ তাঁহাদের দান এবং বৃত্তি লইয়া অগ্রসর হউন। তাঁহাদের প্রদত্ত দান ও বৃত্তিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হউক।"

তিনদিন পরে পটলডাঙার মল্লিক বাড়িতে ছাত্রদের আবার এক বিরাট সভা। এবার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। বক্তাদের

শ্রেণীতে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র, সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কলকাতার সমস্ত কলেজ থেকে প্রায় এক হাজার ছাত্র, জমায়েত হয়েছে সভায়। সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু প্রথম প্রস্তাবের উত্থাপক। প্রস্তাব—আমরা ছাড়বো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ছাড়বো না স্বদেশ সেবার মহাব্রত। প্রস্তাবের সমর্থনে উঠে দাঁড়াল প্রেসিডেন্সী কলেজের সতীশচন্দ্র সিংহ, মুসলমান ছাত্রদের পক্ষ থেকে মহম্মদ সিদ্দিক। সভাপতির ভাষণে কবি কণ্ঠে মন্দ্রিত হল উদ্দীপক প্রেরণা।

"আমাদের দেশে শিক্ষার ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধ। সুতরাং ছাত্ররা যে সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষাগুরুদিগের অনুবর্তী হইয়া চলিবে, তাহা সম্ভবপর নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে।...ছাত্রেরা যদি আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে বর্তমানে আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন, তবে সে আনন্দেরই কথা। এই স্বদেশী আন্দোলন যে কৃত্রিম, সে কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না। আজ যে ছাত্রেরা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত, এবং বৃদ্ধরা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, সকলে মিলিয়া দেশকে এক মহাসংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।...সুতরাং আজ যে গবর্নমেন্টের পরোয়ানায় আপনাদের তরুণ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোন ঠাণ্ডা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাই না। আমি এ-বিষয়ে আপনাদের সহিত এক। আপনারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া, শুধু যোগ দিয়া নয়, বয়স্কদের মধ্যেও ইহা সঞ্চারিত করিয়া, বিধাতার হুকুম পালন করুন, প্রবীণেরা তাহাতে কোন বাধা দিবেন না।...

কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করিয়া যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, গবর্নমেন্টের চাকরি ও গবর্নমেন্টের সম্মানের আশা বিসর্জন দিয়া স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা

করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের সমাজ যদি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। আজকার এই অবমাননা যে নূতন, তাহা নহে, অনেকদিন হইতেই ইহার সূত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার উপর গবর্নমেণ্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই ; সুতরাং গবর্নমেণ্ট যদি এই পরোয়ানা প্রত্যাহারও করেন, আমরা তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া শান্ত থাকিতে পারিব না।··· গবর্নমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপমান করিয়াছেন—তাহা নিজেকেই অপমান করা। ইহার জন্য গবর্নমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইলে আমরা দূরে গিয়া নিজেদের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব।”

ছাত্রদের বুকে উৎসাহের, আশার অফুরান শক্তির উদ্বোধন ঘটল কবির বাণীতে।

একদিকে ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমীর মাঠ। অন্যদিকে গোল-দিঘি। ছাত্রসমাজের দুটি রাজনৈতিক সাজঘর। সবুজ প্রাণে রক্তাক্ত সংকল্প জাগে, জাগায়। চিরযুবারা ছোটে চিরজীবি হবার ডাকে, দুঃখ-দুঃস্বপ্ন, দলন-দমনের মৃত্যুসাথে, মুক্তি-সন্ধানে সেদিন তাই গোলদিঘির গভীরে যত জল, তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তাল তরঙ্গ তার তীরে। প্রবল কল্লোল। গোলদিঘির এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের জন্ম-তারিখ কিন্তু স্বদেশী যুগ নয়। তারও আগে, ডিরোজিও-র কালে, ইয়ং বেঙ্গলের যুগে। স্বদেশী যুগে কেবল বেড়েছে তার ব্যাপ্তি। গোষ্ঠীর বদলে সমষ্টির সমাহার। নদীর জলে সমুদ্রের প্লাবন।

সেকালের একটা রচনা থেকে উদ্ধৃত নীচের গোলদিঘি প্রশস্তি এই প্রসঙ্গে তথ্যমূল্যে স্মরনীয়। নব্যভারতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের নাম “বিলাতী পণ্য বর্জনে স্বদেশী শিক্ষা”। লেখক বিধুভূষণ দত্ত। ১৩১৩ সালের ৭ই আগস্ট উদ্‌যাপনের উৎসব উপলক্ষে এটি পড়া হয়েছিল কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ে।

"বঙ্গীয় নব-উদ্দীপনাক্ষেত্রে গোলদিঘি রাজনৈতিক পীঠস্থান। অন্যূন অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন সহাধ্যায়ীগণ সহ ইহারই তীরে, অখাদ্য-ভক্ষণ, সুরাপান ইত্যাদি পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সভ্যতার (?) স্রোত 'ইয়ং-বেঙ্গল' অর্থাৎ নব-বঙ্গসমাজে প্রবাহিত করিয়া প্রাচীনদের সহিত নবীনদের সমর ঘোষণা করেন। প্রথম অবস্থায় যাহা হইবার তাহা হইল।...দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তি বহির্মুখীন হইল। ইংরাজ তাহাদের চক্ষে দেবতা, তাহাদের অনুকরণই কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল। কালের কুটিল গতিতে আবার ঠিক সেই স্থানেই বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবকসমাজ অর্ধশতাব্দীর পরে ঘরে ফিরিয়াছে, দেশ চিনিয়াছে। গোলদিঘির ধারে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাতৃমন্দিরে আহ্বান করিয়া যুবকবৃন্দকে যে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হইত, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে।......

দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দের পাদস্পর্শে সেই পীঠস্থান ধন্য। এই গোলদিঘির তীরে দাঁড়াইয়াই অঙ্গচ্ছেদে অশৌচগ্রস্থ যুবকগণ তিনদিন নগ্ন পদে উত্তরীয় ধারণ করিয়াছিলেন।......

যেদিন অঙ্গচ্ছেদের ঘোষনাপত্র প্রচারিত হইল, সেদিন কলিকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া গোলদিঘিতে সমবেত হইল। অদ্ভুত-কর্মী, প্রকৃত ত্যাগী স্বর্গীয় বীর রমাকান্ত রায়ের কার্যক্ষেত্রও এই গোলদিঘি।...

এই গোলদিঘির তীরেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়। জাতীয় সংগীতের মর্মস্পর্শী ভাষায় মায়ের নাম প্রচার করিবার প্রথাও আরম্ভ হয় এই গোলদিঘি হইতে। সেই জাতীয় উদ্দীপনার বোধনকালে নিত্য নিত্য গোলদিঘির পশ্চিমপার হইতে জনৈক যুবক সুললিত কণ্ঠে—'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখ রেখ মনে ধ্রুব জ্ঞান' গান করিত।...তারপর ক্রমে ক্রমে শহরের নানা স্থানে

দলে স্বদেশ-প্রীতিতে মাতোয়ারা ছাত্রবৃন্দ মাতৃ-সংগীতের মিছিলও বাহির করিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি গোলদিঘি।"

২রা নভেম্বর ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমীর মাঠে, অন্য নাম পান্তির মাঠ, আর এক সান্ধ্য সম্মেলন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি।

সে যুগে এই পান্তির মাঠই ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান রঙ্গমঞ্চ। আর ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমীর ক্লাব ঘর ছিল সাজঘর। বিনয় সরকারের আত্মকথন—

"কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর পূব দিকে ছিল মাঠ। তাকে লোকেরা বলতো, 'পান্তির মাঠ'। মাঠের দক্ষিণেই মেট্রোপলিটান কলেজের পেছনটা। আমরা থাকতাম দোতলায়। বঙ্গ-বিপ্লবের অনেক কিছুই ঘটত এই বাড়ির সামনের মাঠে। সবই আমরা ঘরে বসে দেখতাম। সভায় হাজির থাকার দরকার হত না। তবে সভায় যা কিছু ঘটতো, তার বেশ কিছু আমাদের বাড়িরই ঘর-গুলোয় আর একতলায় তৈরি হয়ে থাকতো। কেননা, সতীশবাবু আর ব্রহ্মবান্ধব এই দুজনের শল্লা, স্বদেশী আন্দোলনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে হামেশা জরুরী হত। প্রকারান্তরে বলা চলে যে, বঙ্গ-বিপ্লবের 'গ্রীনরুমে' বা সাজঘরেই রাধাকুমুদ, রবি আর সামাধ্যায়ীর সঙ্গে আমি ১৯০৫-এর গৌরবময় দিন, সপ্তাহ, বা মাসগুলো কাটিয়েছি। তখন আমাদের আত্মিক অভিভাবক সতীশবাবু ও ব্রহ্মবান্ধব।"

৪ঠা নভেম্বর কলকাতায় গড়ে উঠল অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি। নেতা হলেন সঞ্জীবনী-র কৃষ্ণকুমার। প্রধান দুই উদ্যোক্তা হলেন শচীন্দ্রনাথ বসু ও রমাকান্ত রায়। প্রথমজন ছাত্রনেতা। দ্বিতীয়-জন জাপান ফেরত ইঞ্জিনীয়ার। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়াই হল এই সোসাইটির আসল কাজ।

সেই একই সঙ্গে রয়েছে স্বদেশী প্রচারেও মন-প্রাণ-উজাড় করে দেওয়া।

নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এই সময়ে আনন্দমোহনের কাছে গেলেন তাঁর মতামত জানতে। আনন্দমোহন তখন মৃত্যুশয্যাশায়ী। বাক্-শক্তিহীন অবস্থা।

কার্লাইল সার্কুলার সম্বন্ধে আপনার মত কি?

তিনি শুধু সংক্ষেপে একটি কথাই বললেন। 'Defience'! অর্থাৎ অগ্রাহ্য কর এই সার্কুলার। অর্থাৎ কবর দাও ঐ জবরদস্তি-পরোয়ানার, কোন রকম ভয়-ভাবনাকে পরোয়া না করেই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "গবর্নমেণ্ট যদি দুই দিন পরে এই পরোয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।"

কার্লাইল সার্কুলারের প্রথম কোপ পড়ল রংপুরের দুটি স্কুলের ঘাড়ে। একটা রংপুর জেলা স্কুল। আরেকটা টেক্নিক্যাল স্কুল। অপরাধ দুটি স্কুলের ছাত্ররা যোগ দিয়েছে স্বদেশী সভায়। গেয়েছে বন্দেমাতরম্। সুতরাং শাস্তি অনিবার্য। প্রায় দেড়শ ছাত্রকে দিতে হবে মাথা পিছু পাঁচ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে বহিষ্কার।

জ্বলে উঠল আগুন। ছাত্ররা বুঝল তাদের তেজস্বিতার দাম, রক্তের মূল্য। তারা নতুন করে গলায় সাধতে শুরু করে দিলে সাধের বন্দেমাতরম্।

রংপুরের জনপ্রিয় উকীল উমেশচন্দ্র গুপ্ত। বিদ্যালয় আর বিদ্যার্থীর প্রতি এই সরকারী অপমান-অসম্মানকে মাথা পেতে নিতে তিনি নারাজ। এগিয়ে এলেন অকুতোভয়ে। শুধু সরকারী-নির্যাতনকে নিন্দা জানিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়। দায়িত্ব আরো বড়। যে-সব ছাত্র দেশপ্রেমের অপরাধে নির্যাতীত, নিগৃহীত, যাদের জীবন থেকে চিরকালের জন্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বিদ্যালাভের

ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তাদের জন্যে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারা যায় তাহলে বুঝতে হবে জাতীয় শিক্ষার দাবি কোনো মৌলিক উদ্যোগ নয়, নিছক মৌখিক উত্তেজনা।

উমেশচন্দ্রের উৎসাহে, নেতৃত্বে এক নতুন উন্মেষ ঘটে গেল রংপুরে। রংপুরেই প্রথম সৃষ্টি হল জাতীয় বিদ্যালয়। বিনয় সরকারের ভাষায় "রংপুর হচ্ছে বাংলার শিক্ষা-স্বরাজের প্রবর্তক। সেখানকার উকীলেরা এই আন্দোলনের জন্যে যারপরনাই উঁচু-দরের সৎসাহস আর স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছিলেন।"

কলকাতা চুপ করে বসে নেই।

অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি তার জন্মদিন থেকে সাবালক, সংগ্রামী। গোলদিঘিতে বসল সভা। রংপুর ছাত্রসমাজের উপর সরকারী নিপীড়নের প্রতিবাদে। "এই শতাব্দীর ছাত্র আন্দোলন এই সভাতেই শুরু হয়।"

পরের দিনই ডন সোসাইটিতে ডাকা হল আর এক প্রতিবাদ সভা।

সভায় উপস্থিত দুশোজন ছাত্র-প্রতিনিধি। বক্তাদের আসনে রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র। তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর সরকারী প্রলোভন কাটিয়ে উঠে সত্যিই যদি আজকের নবজাগ্রত ছাত্রসমাজ জাতীয় শিক্ষা-লাভের জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাহলে নেতাদের বাধ্য হতে হবে এ-বিষয়ে অগ্রসর হতে। ছাত্রদের অনমনীয় দৃঢ়তাই হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম সোপান।

"আজ যে সকল ছাত্র গবর্নমেন্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়-দিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাত্ররা কি তাহাতে প্রস্তুত

আছেন? আজ জোয়ারের সময় তাঁহারা যে আত্মদানের সংকল্প গ্রহণ করিবেন, ভাঁটার সময় যেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হন। যদি তাঁহারা এই সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন, তবে এই দিন বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।”

রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে উঠল ছাত্র প্রতিনিধিদল। তারা সম্মত। সুখের দিনের কুসুম, দুঃখের দিনের কাঁটা দুইই মাথা পেতে নিতে রাজী। ছাত্রদের পক্ষ থেকে সেদিনের আলোচনায় অংশ নিলেন নরেশচন্দ্র সেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতিরা।

ঐ একই দিনে শ্যামপুকুর মাঠে আরও এক বিশাল জনসভা। সভাপতি বগুড়ার নবাব আবদুল শোভান চৌধুরী। “তিনি সভাপতি হওয়াতে ঢাকার নবাবের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকে প্রতিবাদ করা হইল। এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লা যে বাঙলার সমগ্র মুসলমান-সমাজের একচ্ছত্র নেতা নহেন, ইহাও প্রমাণ হইল।”

৯ই নভেম্বর আবার দুটো সভা। একটা গোলদিঘিতে। আর একটা পান্তির মাঠে।

পান্তির মাঠের জনসভায় স্বনামধন্য সুবোধ মল্লিক সভাপতির আসনে বসে ঘোষণা করলেন স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করতে সম্মত। সভায় উঠল প্রবল হর্ষনাদ। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি। বিপিন পাল, সুবোধ মল্লিককে সেই সভায় উপহার দিলেন ‘রাজা’ সম্মানের উপাধি। সেই থেকে চলে আসছে রাজা সুবোধ মল্লিক। সভা শেষ হলে ডাকা হল গাড়ি। গাড়ি থেকে খুলে নেওয়া হল ঘোড়া। ঘোড়ার বদলে জনতাই সেই গাড়িকে টেনে নিয়ে চলল কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে, ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত, গাড়ির ভিতরে সদ্য-সম্মানিত রাজা সুবোধ মল্লিককে বসিয়ে। দানের দক্ষিণা।

পরের দিনে ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাবের এক সভায়

বিপিনচন্দ্র' ঘোষণা করলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জনৈক জমিদার-বন্ধু কলকাতায় প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তায় পাঁচ লক্ষ টাকা দান করতে উৎসাহী। ঐ দিনই পান্তির মাঠের জনসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজা সুবোধ মল্লিককে ধন্যবাদ জানালেন তাঁর প্রতিশ্রুত দান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর উৎসাহের জন্যে।

১১ই নভেম্বর। গোলদীঘিতে বিশাল সভা। ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি। বক্তা সতীশচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, মৌলভী আবুল হোসেন, শচীন্দ্রনাথ বসু।

১২ই নভেম্বর। পান্তির মাঠের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কেবল মানুষ। প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছে সেদিন। সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল। বক্তাদের আসনে ভগিনী নিবেদিতা, অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি।

সেদিনের সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় দুটি। ১। বাংলা সরকারের সহকারী ডি. পি. আই. মিঃ রাসেল-এর কলকাতার ছাত্র-সমাজের নৈতিক চরিত্রের প্রতি নিন্দোক্তি। রাসেল সাহেবের অভিযোগের সংখ্যা তিন। ১। কলকাতার কিছু কিছু ছাত্রাবাস ব্রথেলের দ্বিতীয় সংস্করণ। ২। কিছু কিছু ছাত্র সত্যিই ব্রথেলে কাটায়। ৩। ছাত্রাবাসের পরিচারিকা সাধারণত নষ্ট চরিত্রের।

নীতিবাগীশ রাসেল সাহেবের এই স্বকপোলকল্পিত অভিযোগের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠল সমস্ত সভা, সমস্ত বক্তার ধিক্কার ও প্রতিবাদ। ঐ দিনই নিবেদিতা ডন সোসাইটি-তে দিলেন তাঁর প্রদীপ্ত ভাষণ। বিষয়—বর্তমান সমস্যা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা।

১৬ই নভেম্বর 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে' বসল এক মন্ত্রণাসভা। সভাপতি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। সভায়

দেশের প্রায় সমস্ত বরেণ্য নেতাই উপস্থিত। সভায় গৃহীত হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত প্রস্তাব। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-পদ্ধতি আর পাঠ্যতালিকা রচনার জন্যে তৈরি হল দুটো কমিটি। পাঠক্রম রচনার পুরোপুরি দায়িত্ব পড়ল সতীশচন্দ্রের উপর। এই ব্যাপারে সতীশচন্দ্রের পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস ব্যানার্জী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সতীশচন্দ্রের উপর পড়ল আরও একটা গুরুভার। সেটা অর্থসংগ্রহের।

অর্থও, আশ্চর্যের বিষয়, সংগৃহীত হতে লাগল অভাবিতরূপে। রাজা সুবোধ মল্লিক আগেই ঘোষণা করেছিলেন এক লক্ষ টাকা দানের। সতীশচন্দ্রের জনৈক জমিদার বন্ধু সম্মত হলেন আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই জমিদার-বন্ধুই প্রখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তৃতীয় অপর একজন দাতা, অজ্ঞাতনামা, সম্মত হলেন দু লক্ষ টাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে উদ্যানসংলগ্ন গৃহ দান করতে। চতুর্থ দাতা বছরে তিরিশ হাজার টাকা দানে উৎসাহী।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে উৎসাহ-উদ্দীপনা-উত্তেজনার মাতন লেগেছে দেশে। অর্থের অযাচিত অভাবিত আবির্ভাব তার অন্যতম নিদর্শন। আবার এরই উল্টোপিঠে রয়েছে অনর্থ। নেতাদের অন্তর্বিরোধ।

সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেওয়ার বিরোধী। পান্তির মাঠের এক সভায় তিনি দীপ্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন ছাত্র সমাজকে 'তোমরা গবর্নমেণ্টের স্কুল কলেজ ছাড়িও না।' ছাত্ররা সেদিন অমান্য করল তাঁর আদেশ। সভা জুড়ে উঠল কর্ণবিদারী প্রতিবাদের কলরব কোলাহল, সেদিন সুরেন্দ্রনাথের বাক্যে কর্ণপাত নেই কারোর।

২৪শে নভেম্বর পান্তির মাঠের সভা থেকে সারা শহরে ছড়িয়ে

পড়ল এক দুঃসংবাদ। বরিশালে ছাত্রদলনের, স্বদেশী-দমনের উদ্যোগে সরকার নিয়োগ করেছে গুর্খা সৈন্য। তারা চালিয়েছে অবাধ অত্যাচার। ছাত্রসমাজ ফুঁসে উঠল ক্রোধে।

২৭শে নভেম্বর ছাত্ররা দল বেঁধে হাজির হল সুরেন্দ্রনাথের দরবারে। তারা জানালে, যতদিন বরিশালে মোতায়েন থাকবে গুর্খা সৈন্য আমরা বন্ধ করলাম আমাদের স্কুল-কলেজের পড়া।

সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের জানালেন—'যাহারা তোমাদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে বলিতেছে, তাহারা দেশের শত্রু'। অসন্তুষ্ট ছাত্ররা ফিরে এল। তারা এ নির্দেশ মানতে নারাজ। তাদের কানে বাজছে বিপিনচন্দ্রের বজ্র-নির্ঘোষ।

"তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না। আবার দ্বিধা করিতেছ কেন? আজ আবার তাদের (নেতাদের) মত জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে কোন্ নেতার হুকুমে করেছিল? সেদিন গোলদিঘিতে যখন নিজেরা বলেছিলে 'আমরা গোলামখানা ছাড়ব' তখন কার কথা শুনে বলেছিলে? ...আজ যদি এই 'রাজার মাঠে' দাঁড়িয়ে তোমরা দৃঢ়ভাবে বল, 'আমরা এখানে দাঁড়ালাম, ওখানে আর যাব না, যেখানে To Let লেখা হয়েছিল, সেখানে আর যাব না' দৃঢ়ভাবে একথা যদি তোমরা বলতে পার, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হবে। অন্য পন্থা নেই। এ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে কি দেখতে পাও? এই দেখতে পাও যে, এই শিক্ষার আন্দোলন প্রথমে political আন্দোলন, তারপর educational আন্দোলন। কার্লাইল সার্কুলার, লায়ন সার্কুলারের তাড়নায় এবং বন্দেমাতরমের অবমাননায় এর উৎপত্তি।

...পড়াশুনা কিসের? যখন বাড়িতে ডাকাত পড়ে, তখন কি তোমরা বই খুলে পড়? গ্রামে যখন মড়ক লাগে, তখন কি কেউ এক্‌জামিনের ভাবনা ভাবে? বরিশালের খবর শুনে আমরা যে

বুড়ো, আমাদেরই রক্ত গরম হয়ে ওঠে, মুখে ভাত যায় না, রাত্রে ঘুম হয় না, আর তোমরা কি এমনই অমানুষ হয়েছ যে, তোমরা আজ একজামিন নিয়ে ব্যস্ত! তোমাদের যৌবনের সে উদারতা, সে দেবভাব, যৌবনের সে বিশ্বপ্রেম আজ কোথায়?···পড়াশুনা ছেড়ে দল বাঁধ, মুখে বল 'বন্দেমাতরম্'। আর প্রাণে মায়ের অভয় নিয়ে বরিশালে যাও। যাও মাদারিপুরে যাও, যাও ফরিদপুরে যাও, যেখানে গুর্খা গিয়েছে—সেখানে যাও। যেখানে গুর্খা যায় নাই সেখানেও যাও। গিয়ে গ্রামে গ্রামে 'বন্দেমাতরম্' রব তুলে দাও।"

ছাত্রদের মনে মরিয়া আবেগ। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 'বয়কট' করবোই। এই 'বয়কট' প্রতিপালনের প্রথম পদক্ষেপ হল আসন্ন এম. এ. পরীক্ষা না দেওয়া। সেই ঘটনা-বহুল, সংঘাতময় দিনের স্মৃতিলিপি, বিনয় সরকারের সরস ভাষায় ফুটে উঠেছে অবিস্মরণীয় রূপে।

"১৯০৫-এর শীতকালে এম. এ. পরীক্ষার দিন। অতএব এম. এ. পরীক্ষাটা বয়কট করানো দাঁড়িয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের প্রথম ধাপ। এইখানে আসছে ডন সোসাইটির সঙ্গে যোগ। এই সোসাইটির রবী ঘোষ ছিল এম. এ. পরীক্ষার্থী। সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ফার্স্ট বয়। কাজেই এম. এ. বয়কটের আন্দোলনে নেতৃত্ব এসে পড়ল আপনা আপনিই রবীর ঘাড়ে। শেষ পর্যন্ত 'সতীশবাবুর গোআলটা' পরিণত হল এম. এ. বয়কটদের কর্মকেন্দ্র।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস চব্বিশঘণ্টা হৈ হৈ, রৈ রৈ। আওয়াজ শুধু এম. এ. পিকেট করো, এম. এ পিকেট করো।

আমাদের তে-তলার ছাদে এম. এ পরীক্ষার্থীদের সভা হল দু'রাত উপর্যুপরি। অ্যাটর্নী হীরেন দত্ত সেই সভায় এসে হাজির হলেন। বললেন, যেই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট হবে, অমনি

আমি উকিলি ছেড়ে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক মাস্টার হব। এমন শাঁসাল বক্তৃতা খুব কম শোনা যায়।

সভার সকলের তাক্ লেগে গেল। পাকা উকিল—পশারওয়ালা নামজাদা উকীল। বয়সও প্রায় চল্লিশ। কোথায় ছোঁড়ারা গিয়ে তাঁকে ভজাবে না সেই নিজে এসে যেচে বলছে,—ভাঙো সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়, কায়েম করো স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তার হব চাকর।

হীরেন দত্তর একটা কথা মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'শ্যামের বাঁশরী বেজেছে। গোপীনিরা সব যে যেখানে আছে, সেথান থেকেই ছুটে আসবে।'

শেষ পর্যন্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট হল না। কিন্তু স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হল। হীরেনবাবু উকিলি ছাড়লেন না। তবে মাসিক ২৫০৲ টাকা করে একজন অধ্যাপকের বেতন দিয়ে যেতে লাগলেন।

সতীশবাবু আর হীরেন দত্ত হাইকোর্টের উকিলি-মহলে ঘুরা-ফিরা করলেন। ঝুনো উকীলদের রাজা রাসবিহারী ঘোষ তেতে উঠলেন। তুঁদে ব্যারিস্টার তারক পালিত ক্ষেপে গেলেন। ব্যারিস্টার আবদুল রসুল আর আশুতোষ চৌধুরী এবং অ্যাটর্নী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীও দলে যোগ দিলেন। গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জজ। তাঁর সহানুভূতিও জুটল। ডাক্তারদের ভেতর এলেন নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ও সুন্দরীমোহন দাস। অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ ষোল আনা এদিকে। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী সুবোধ মল্লিকের লাখটাকার সঙ্গে নিজের তিন লাখ টাকা জুড়ে দিতে রাজী হলেন। তার উপর গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী পাঁচলাখ।···উচুমহলে এই ধরনের উত্তেজনা, আন্দোলন, সহানুভূতি। আর সঙ্গে সঙ্গে জননায়কগণের সার্বজনিক সভা বসল বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে।

কিন্তু এম. এ. বয়কট হবার প্রস্তাব গৃহীত হল না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শল্লায় কর্তারা বললেন, 'বাবারা, পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ ক'রো না। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আমরা কায়েম করবোই কোরবো।' এম. এ. পরীক্ষার্থীরা মাস দেড়েকের ভেতর তৈয়ের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে দিল। যার ফার্স্ট হবার সে ফার্স্ট হল। যার ফেল হবার সে আর পাস হল না।"

১৯০৬-এর ১১ই মার্চ। এক প্রকাশ্য সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর প্রস্তাব। ১লা জুন রেজেষ্ট্রীকৃত হল এই প্রতিষ্ঠান। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। তার নির্দেশ ও পরিচালনায় বাংলার মফঃস্বলে স্থাপিত হল কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয়। কলকাতাতেও পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচীকে রূপায়িত করার উদ্যোগে স্থাপিত হল জাতীয় স্কুল ও কলেজ। তার উদ্বোধন দিবসের উৎসব হল টাউন হলে, ১৪ই আগস্ট। সেদিনের বিরাট জনসভার সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ। প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, মৌলভী মহম্মদ ইউসুফ ও রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে রবীন্দ্রনাথ জানালেন।

"অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতেই পাওয়ার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহাই নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কি-ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যেন আমরা না ভুলি।...আমাদের

বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দ শঙ্খ বাজিয়া উঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে; আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।"

পরের দিন থেকে বৌবাজারের এক ভাড়াটে বাড়িতে বসল কলেজ। অরবিন্দ সেই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। সতীশচন্দ্র সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। যে যেখানে শিক্ষায় উৎসাহী, উদ্যোগী সবাই ছুটে এসে যোগ দিলে জাতীয় কলেজের প্রাঙ্গণে। সখারাম গণেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, মহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার—এদের মত পণ্ডিত-মন্যদের সমাগমে জাতীয় কলেজ কলকাতায় স্বনামধন্য হয়ে উঠল রাতারাতি। কলেজের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার পরিচয়-সূচক শিক্ষা। এই তালিকাভুক্ত শিক্ষাক্রমের বাইরেও নিয়মিতভাবে পরিষদ আয়োজন করত সান্ধ্য বক্তৃতামালা। এতে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচ্য শিল্প নিয়ে আনন্দ কুমারস্বামী। অঙ্কশাস্ত্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনিষদ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের পিছনে সেদিনের অন্যতম উদ্যোগী সংগঠক হীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিনয় সরকারের শ্রদ্ধাঞ্জলী—"১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিপ্লবের সময় হীরেনবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ। কিন্তু এই বয়সেও তিনি 'ছোকরাদের' সঙ্গে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। যুবক বাংলার ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন প্রাণের সহিত। তার জন্যে পরে কখনো পস্তান নি।

১৯১৪ পর্য্যন্ত তাঁকে বাদ দিয়ে যুবক বাংলা কোনো পরামর্শ বা কাজকর্ম চালাতো কিনা সন্দেহ। মনে রাখা ভাল যে, তাঁর পেশা

উকিলি আর উকিলিতে পসরাও ছিল। কাজেই অনেক কিছুর জন্য তাঁর শল্লার দাম ছিল যুবক বাংলায় প্রচুর। তাঁর ডাক পড়তো সর্বদা ও সর্বত্র।

'বন্দেমাতরম্'এর তিলক কেটে হীরেনবাবু হাজির ছিলেন যুবক বাংলার নয়াজীবনের সাড়ার ভেতর। 'বন্দেমাতরম্' মার্কা বঙ্গ-সন্তান বাঙালীর ইতিহাসে অমর। বাঙালী জাত যত আহাম্মকই হোক্, ১৯০৫-১৪ সনের বন্দেমাতরম্ দীক্ষিত বাঙালীর বাচ্চাকে সে কোনদিন ভুলতে পারবে না।"

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও তার শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ-দর্শী ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী বিনয় সরকারের বৈঠকীচালের স্মৃতিকথা এখানে খুবই উল্লেখযোগ্য।

"জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ষোল আনা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার সঙ্গে গবর্নমেন্টের কোন বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। দাঁড়িয়ে গেল একটা খাঁটি স্বরাজের কর্মকেন্দ্র। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পক্ষে শিক্ষা বিপ্লব অনুষ্ঠিত হল। এইটেই চরম যুগান্তর।

শিক্ষা বিষয়ক প্রভেদ ছিল বিস্তর। টেকনিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হল সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক। পাঠশালায় ভর্তি হওয়া মাত্রই প্রত্যেক শিশুকে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হতো। ম্যাট্রিকের সময়ে ক্লাসে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্ব-জনিক করা হয়েছিল।

কয়েকটা বিশেষত্ব খুবই মূল্যবান। ইস্কুল বিভাগে ভাষা সাহিত্য, অর্থ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য তত্ত্ব, ইত্যাদি।

ইস্কুল বিভাগের সর্ব নিম্নশ্রেণী হতে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সব কিছু শিখার জন্য বাংলা ভাষাকেই বাধ্যতামূলক ও সর্বজনিক বাহন করা হয়েছিল।

১। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সুকুমার শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার উপর জোর দেওয়া হল।

২। পালি হিন্দী ও মারাঠি ভাষা শেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই তিন ভাষার সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের সঙ্গে ছাত্রদের আত্মিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করবার লক্ষ্য ছিল।

৩। ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখাবার ব্যবস্থাও ছিল।

নানা সংকট, নানা মত বিরোধ। আবার অন্যদিকে অর্থ চিন্তা। তবু সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এগিয়ে চলল তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

অধ্যক্ষের ভূমিকায় জনসমাজে অরবিন্দের পাণ্ডিত্য ও ছাত্র-সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশই বেড়ে চলল। কিন্তু বরোদার ৭৫০ টাকার চাকরি ছেড়ে প্রথমে মাত্র ৭৫ টাকা, পরে একান্ত অসচ্ছলতার জন্যে ১৫০ টাকা যে পদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন প্রধানত নিজের ইচ্ছাতেই, সেই পদ এক বছর বাদে একদিন তিনি ত্যাগ করলেন। তার কারণ কোন মতবিরোধ বা নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব নয়। এর কারণ সমাজের আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে তাঁর কানে ক্রমাগত বেজে চলেছিল এক বিশাল আহ্বান। রাজনীতির অগ্নিযজ্ঞে ঝাঁপ দিতে তিনি ক্রমাগত হয়ে উঠছিলেন উৎসুক, উন্মুখ। নিজেই লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে রচনা করে চলেছিলেন অগ্নিময় সেই পটভূমি। নীরবে, আপাত-নিরস্ত্র নিরীহ জীবনের অন্তরালে।

১৯০৬ এর মার্চ মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন বরোদা থেকে। তার আগে ১৯০৫ এর শেষভাগে 'ভবানী মন্দির' নামে লিখেছেন একটা ১৫-১৬ পাতার ক্ষুদ্রাকৃতি বই। পাণ্ডুলিপি সহ বারীন্দ্রকে পাঠালেন সেটা ছেপে বার করতে। ডি. গুপ্ত প্রেসে সারা রাত জেগে বারীন্দ্রনাথ সেটা ছাপিয়ে কলকাতায় জনে জনে বিলি করলেন গোপনে।

বইয়ের শুরুতেই শক্তিদায়িনী ভবানীর উদ্দেশ্যে স্তব। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল তাঁর 'ভবানী মন্দির'। 'ভবানী মন্দির' বইটি ছিল সেকালে গুপ্ত-সমিতির বেদমন্ত্র। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ভারতবর্ষের কোন দুর্ভেদ্য দুর্গম অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপ্লুত মনোরম পরিবেশে স্থাপিত হবে ঐ নামের একটি মন্দির। সেখানে দেশের পরাধীনতার উচ্ছেদে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নেবে বাংলার বীর সন্তানেরা।

'ভবানী মন্দির' বেরোবার অল্পদিন পরেই প্রকাশিত হল যুগান্তর। সে-কালের যুগান্তকারী পত্রিকা। উকীল অবিনাশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হল ৫০ টাকা। তাতেই বেরুল কাগজ। বারীন্দ্রকুমারের নিজের জবানীতে—

"আমি ও অবিনাশ ২৭নং কানাইলাল ধর লেনের বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে যুগান্তর অফিস খুলে বসলাম। দেবব্রতের এবং আমার লেখা সম্বল করে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পত্রাকারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ আবেদন কয়েকটি জেলা-কেন্দ্রে চলে গেল, বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক মুখপত্র প্রকাশের সহায়তার জন্য। যথাসময়ে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর বের হল। এবং আমাদের জানিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে কাগজ পাঠানো হল।...হঠাৎ অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি অভূতপূর্ব।... প্রথম সংখ্যা আদৌ বিক্রি হচ্ছে না শুনে, কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে আমি ও অবিনাশ ট্রামে বের হলাম এবং মোড়ে মোড়ে 'ওরে যুগান্তর আছে' হেঁকে হেঁকে নিজের কাগজ নিজেই কিনতে লাগলাম। উদ্দেশ্য এই ভাবে ট্রাম যাত্রী বাবু ভায়াদের দৃষ্টি নতুন কাগজের দিকে আকৃষ্ট করা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে বেগতিক দেখে আমরা নিজেই রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যুগান্তর বিক্রি করা আরম্ভ করলাম। ভদ্রলোকের ছেলের সাধারণ রাজপথে সেই প্রথম হকারী করা।"

উদ্যোক্তা হিসেবে যুগান্তরের বাইরে বারীন্দ্র। অন্তরে অথবা অন্তরালে অরবিন্দ। মাঝে মাঝেই প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু স্বনামে নয়। তখনো ভাল করে বাংলা লিখতে পারেন না। বাংলা লেখায় এসে ভিড় করে সংস্কৃত আর মারাঠী শব্দ। অবিনাশ শুধরে দিতেন সে-সব দোষত্রুটি।

দেখতে দেখতে একদিন চাঁপাতলার যুগান্তর অফিসের রূপান্তর ঘটল যুগান্তরের আড্ডায়। আবার একদিন এই যুগান্তরের আড্ডাতেই জন্ম নিল বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বিপ্লবী বাঙালী। যুগান্তর-এর আড্ডাই ছিল সেদিনের জাগ্রত বাঙালীর সশস্ত্র রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের গোপন আখড়া, তাদের গুপ্ত সমিতি, তাদের রক্তাক্ত বাসনার বাসর ঘর।

নীচের তলায় প্রেস। ওপরে অফিস, শোবার ঘর। পাশে একটা ছোট্ট কুঠরী। সেখানে এক কাঠের সিন্দুক। সেই সিন্দুকের অন্ধকার গহ্বরে ভরা থাকে সংগৃহীত অগ্নিবান, বিপ্লবের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র।

বরিশালে পুলিসী বর্বরতার পর থেকেই বাঙালী যুবকদের বুকের মধ্যে ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছিল এক বীর্যবান বাসনা, রক্ত দিয়ে শুধতে হবে রক্তের ঋণ। তারই জন্যে বোমা তৈরী। তারই জন্যে রিভলভার জোগাড় করা। তারই জন্যে স্বদেশী ডাকাতি।

কৃষ্ণকুমারের আত্মচরিতে পাওয়া যায় সেদিনের বাঙালী ছেলের সেই সব বিপুল দুঃসাহসী আকাঙ্খার ছোট ছোট জ্বলন্ত জলজ্যান্ত ছবি।

"বরিশাল কনফারেন্সের অব্যবহিত পরে দুইজন অপরিচিত যুবক সুরেন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার ব্যারাকপুরের বাটীতে দেখা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—'আমরা ব্যামফীল্ড ফুলারকে হত্যা করিবার জন্য আজ রাত্রেই যাত্রা করিব।' সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—'ইহার ফল অতি মন্দ হইবে। আমরা যে উপায়ে বঙ্গভূমিকে অখণ্ড

করিতে চেষ্টা করিতেছি সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।' তাহার উত্তরে তাহারা বলিল—'বানারীপাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে গুর্খারা লাঞ্ছিত করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতিশোধ লইব'। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন 'ব্যামফীল্ড ফুলার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" তখন যুবকদ্বয় শান্ত হইল। তাহারা বলিল—"আমাদের কয়েকজন লোক ফুলারকে হত্যা করিতে গিয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা দরকার। আমাদের সংগে টাকা নাই, আপনি আমাদের রেল ভাড়া দিন।" ইহারা আসামে যাইয়া আততায়ীদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।......স্যার ফ্রেজার একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে খ্রীষ্টান যুবকদিগের সমিতিতে বক্তৃতা করিতে গিয়েছিলেন, যতীন্দ্র নাথ রায় নামক বারাসত নিবাসী এক যুবক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রকাশ্য সভামধ্যে তাঁহাকে রিভলভার দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু রিভলভার হইতে গুলী বাহির হইল না। সে আবার গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; এমন সময় বর্দ্ধমানের মহারাজা তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।......আমি স্বদেশী আন্দোলনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম, অনেকে মনে করিত আমি ইংরাজ রাজ্য ধ্বংস করিতে পক্ষপাতী, সুতরাং বিপ্লবীদলের অনেকে আমার নিকট আসিতেন। একদিন রাত্রিকালে এক যুবক আসিয়া আমাকে বলিল—"পুলিশ বীডন ষ্ট্রীটের সভা ভাঙিয়া দিয়াছে, অনেক যুবককে প্রহার করিয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী বহু দোকান লুট করিয়াছে, অতএব ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিরূপে প্রতিশোধ লইবে?'

যুবক বলিল—'রাত্রিকালে পুলিশেরা শহরের নানা স্থানে পাহারা দেয়, এক এক স্থানে একজনের বেশী থাকে না। একটা বৃহৎ আয়োজন হইলে এক রাত্রিতে আমরা সমস্ত পুলিশকে হত্যা করিতে পারি।' আমি বলিলাম, 'এমন বৃহৎ আয়োজন করা সম্ভব নয়। সমস্ত পুলিশ একরাত্রে হত্যা করিলেও তোমাদের উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হইবে না। পরদিনই নূতন পুলিশ নিযুক্ত হইবে, বিশেষতঃ তোমাদের জানা উচিত এ জগতে একজন ন্যায়বান নিয়ন্তা আছেন, তাঁহার রাজ্যে অধর্ম কখনও জয়যুক্ত হয় না।'

যুবক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর কলিকাতার দুই এক স্থলে রাত্রিকালে পুলিশকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, এবং কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করাও হইয়াছিল। আমি তখন বুঝিলাম বাংলাদেশে পুলিশ হত্যা করিবার জন্য একটি দল গঠিত হইয়াছে।

আর একদিন এক যুবক আসিয়া আমাকে বলিল,

'ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদের দলে কয়জন লোক আছে?'

যুবক বলিল, 'বাংলাদেশের নানা স্থানেই আমাদের দলের লোক আছে। কলিকাতায় আমরা বোমা তৈয়ার করিতেছি। অনেক বন্দুক ও রিভলভার সংগ্রহ করিয়াছি, কয়েকটি ঘোড়াও সংগ্রহ করিয়াছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কয়টা ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছ?'

সে বলিল—'দুইটা'।

'কয়টা বন্দুক ও রিভলভার তোমাদের আছে?'

সে বলিল, 'কুড়িটা'।

বোমার বিষয় প্রথম এই যুবকের কাছেই শুনিয়াছিলাম। বোমা যে কি তাহা আমি জানিতাম না। যুবক বলিল—

'বোমার পরীক্ষা হইতেছে, যুবকেরা বন্দুক রিভলভার ব্যবহার করিতে শিখিতেছে।'

আমি তাহাকে বলিলাম—'এই আয়োজনে তোমরা ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস করিবে? তোমরা টাকা পাইবে কোথায়?

যুবক বলিল—'ডাকাতি করিয়া।'

আমি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিলাম—'ধর্ম এব হতোহোন্তি', যাহারা ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাহারা বিনষ্ট হয়। তোমরা এ দুষ্কর্ম করিও না।'

যুবকটি আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

চট্টগ্রামের এক যুবক কলিকাতায় পাঠ করিত। সে আমাকে বলিয়াছিল—'জার্মানী হইতে অস্ত্র আমদানী করা হইয়াছে, জার্মানী হইতে এক জাহাজ বোঝাই করিয়া অস্ত্র আনা হইতেছে। ইহার দ্বারা অনায়াসে আমরা ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিব।'

আমি তাহাকে বলিলাম—'ভারতবর্ষে এমন কোন বন্দর নাই, যাহা ইংরেজ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে না। তোমাদের জাহাজ কোন্ বন্দরে আসিবে?'

সে বলিল, 'চট্টগ্রামের অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ অবস্থিতি কবিবে, রাত্রিকালে জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া নৌকাযোগে কর্ণফুলী নদী দিয়া দুর্ভেদ্য পার্বতীয় প্রদেশে তাহা লইয়া যাওয়া হইবে।'

আমি বলিলাম—'তোমাদের অজ্ঞতার আর পার নাই, সত্য সত্যই যদি কোন জাহাজ অস্ত্র লইয়া আসে তবে তাহা নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।'

ইহার কয়েকদিন পরে বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল আমাকে বলেন, একখানি অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে আসিতেছিল। কিন্তু তাহা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই ধরা পড়িয়াছে। আমি সে কথা শুনিয়া ভাবিলাম—তবে ত সত্যসত্যই যুবকগণ মহাষড়যন্ত্রের আয়োজন করিয়াছিল।......' যুগান্তরের আড্ডা সেদিনের বাংলা দেশে এই মহাষড়যন্ত্র শেখানোর পাঠশালা। সম্বল স্বল্প। কিন্তু

আকাঙ্ক্ষা আকাশ-ছোঁয়া। উপকরণ নেই, কিন্তু দিগ্বীজয়ের উৎসাহ যেন ছুটন্ত ঘোড়া। রক্তের ভিতর দিয়ে দিনরাত ছুটে চলেছে টগবগ্ টগ্‌বগ্।

যুগান্তরের আড্ডা সম্পর্কে আড্ডার অন্যতম অংশীদার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা রসে, রহস্যে অবর্ণনীয়।

"১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের তখন শীতকাল।...কলিকাতার যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম ৩-৪টি যুবকে মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে,কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।...দেবব্রত যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারের গৃহিণীবিশেষ।

বারীন্দ্র তখন দেওঘরে পলাতক।...পরে বারীনের সহিত দেখা হইবার পর তিনকথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে।"

এই যুগান্তরের আড্ডাতেই দেবব্রত বসু লেখেন তাঁর স্বরচিত ও স্বকণ্ঠে গীত গান।

"কোটি কোটি সুত হুঙ্কারী দাঁড়াল, উঠিয়া দাঁড়াল, জননী!
বঙ্গ বেহার উৎকল মাদ্রাজ গুর্জ্জর রাজপুতনা
দাক্ষিণাত্য পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ।
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা, রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলী, লক্ষ মুণ্ডমালা চণ্ডী সাজাল।
কাঁপে সিন্ধুজল, কাঁপিল হিমাদ্রী, কাঁপে নদী কানন ধরিত্রী,
অম্বর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল।"

একদিকে চলেছে গুপ্ত সমিতির গোপন অভিসার, রক্তাক্ত সংগ্রামের রিহার্সাল। অন্যদিকে সমাজের উপরে চলেছে রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই। ১৯০৬-এর ৪ঠা জুন। তিলক এসেছেন কলকাতায়। আসেন নি, তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনানো হয়েছে। আহ্বায়ক বাংলায় চরমপন্থী নেতাদের সংগঠন 'স্বদেশী মণ্ডলী'। উদ্দেশ্য কলকাতায় শিবাজী উৎসব আর মা ভবানীর পূজার উদ্বোধন করানো হবে তাঁকে দিয়ে।

বাংলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের তিলকের সম্পর্কে খুব নিবিড়। র‍্যাণ্ড অ্যাণ্ড আয়াষ্টের হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত সন্দেহে তিলক যেদিন দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, সেই সময়ে তিলককে সাহায্যের জন্যে বাংলাদেশে উৎসাহের সাড়া পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে কলকাতা থেকে ব্যবহারজীবী পাঠানো হয়েছিল বম্বের হাইকোর্টে।

সেই তিলক এসেছেন কলকাতায়। চরমপন্থীদের মনে চরম উদ্দীপনা। কিন্তু নরমপন্থী চটে গরম। সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন শিমুলতলায়। অনেক অনুরোধ-অনুনয় করে ফিরিয়ে আনা হল তাঁকে। নরমে গরমে একটা সমঝাওতা করার চেষ্টা করা হল।

৫ই জুন সভা বসল ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমীর মাঠে। সভাপতি বরিশালের অশ্বিনীকুমার। ৬ই জুন বক্তৃতা করলেন তিলক। ৭ই জুনের সভায় সভাপতিত্বে বরণ করা হল সুরেন্দ্রনাথকে।

১০ই জুন তিলক চললেন গঙ্গাস্নানে। পিছনে ৩০ হাজার লোকের মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতার ছবি। এদিক ওদিক থেকে বেজে উঠল বোমার আওয়াজ। তোপধ্বনি। কলকাতা উত্তপ্ত।

কলকাতা যখন তিলককে নিয়ে সভায়, শোভাযাত্রায় ব্যস্ত, অন্যদিকে অন্তরালে অরবিন্দ পা বাড়িয়েছেন এক ভয়ংকর

পরিকল্পনায়। অরবিন্দের চিঠি নিয়ে বারীন্দ্র চলছেন শিলং-এ, অরবিন্দের শ্বশুরবাড়িতে। চিঠিতে লেখা বারীন্দ্র অসুস্থ, তাই শিলং-এ চলেছে শরীর সারাতে। কিন্তু আসল কারণ তা নয়। বারীন্দ্র চলেছেন ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদ বা গুপ্ত সমিতির প্রথম শুভ-উদ্বোধনের আয়োজনে। ফুলার সাহেব তখন শিলং-এ। তাকে বধ করতে হবে—এইটেই প্রধানতম লক্ষ্য।

ঠাকুরবাড়ির সুরেন ঠাকুর দিয়েছেন এক হাজার টাকা। তার সঙ্গে সংগ্রহ করা হয়েছে কয়েকটা কাঁচা হাতে-গড়া বোমা আর দুটো রিভালবার। এই হচ্ছে আমরণ সংগ্রামের রণ-সম্ভার।

বারীন্দ্র শিলং-এ গিয়ে লক্ষ্য করবে ফুলারের গতিবিধি। স্থির করবে আক্রমণের স্থান, কাল। তার টেলিগ্রামে আসবে সাংকেতিক নির্দেশ, কলকাতায়। কখন কলকাতা থেকে পাঠানো হবে হত্যাকারীকে।

হত্যাকারীর ভূমিকায় প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু অপরিণত বালক বলে তাঁর বদলে পরবর্তী হত্যাকারী স্থির করা হল হেমচন্দ্র কাননগোকে।

শিলং-এ সুবিধে হল না। ঠিক হল গোহাটিই হচ্ছে ফুলার-বধের যোগ্য বধ্যভূমি।

কিন্তু গৌহাটিতেও হল না। ফুলার সাহেব হঠাৎ চলে এলেন বরিশালে। বারীন্দ্রও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ ফুলারকে অনুসরণ করে বরিশালে উপস্থিত। ফুলার বরিশালে থাকলেন না। বরিশাল কনফারেন্সের পর এই প্রথম বরিশালে আগমন তাঁর। ব্রহ্মকুণ্ড নামের একটা স্পেশাল স্টীমারে করে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। নদীতীরেই অভ্যর্থনা হল। তারপরই ফুলার আবার ফিরে চললেন গৌহাটিতে। সেখান থেকে রংপুর। হত্যাকারীর দলও যাবে রংপুরে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘাটতি পড়েছে টাকায়। হত্যাকারী সোজা চলে এলেন কলকাতায়, অরবিন্দের কাছে।

হত্যাকারীর নিজস্ব বিবরণ—"সেখানে 'ক' বাবুর (অরবিন্দ) কাছে, সে যাবৎ ফুলার-বধ চেষ্টার বিবরণ বলে টাকার অভাব বলে জানাল। তিনি তৎক্ষণাৎ পেটরা হাতড়ে, সব সমেত পঁচিশটি টাকা মাত্র তার সম্বল আছে দেখালেন। তাই হাত তুলে দিলেন। দরকারী তু'একটা কিছু কিনে সে সেই দিনই রংপুরে যাত্রা করল। আশানুরূপ টাকা না পেয়ে ক-বাবুকে (অরবিন্দ) টাকা পাঠাবার জন্য আবার তাগাদা দিয়েছিল। টাকার কোন উপায় না দেখে ক-বাবু নরেন গোসাঁইকে রংপুরে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করা চাই।"

প্রথম স্বদেশী ডাকাতির চেষ্টা হল রংপুরে। কিন্তু ব্যর্থ হল তুটোই। ডাকাতি এবং ফুলার বধ।

১৯০৬-এর ৪ঠা আগস্ট পদত্যাগ করে স্বদেশে প্রস্থান করলেন ফুলার। শান্ত-সমাহিত চিত্তে এই ব্যর্থ-প্রয়াসকে গ্রহণ করলেন অরবিন্দ। কিন্তু ব্যর্থতা তাঁকে পরাভূত করল না। আপন সংকল্পে তিনি সুদৃঢ়।

কিছুদিন পরে বিপিনচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন অরবিন্দ। আর এক নতুন অধ্যায় দেখা দিল তাঁর জীবনে।

ইতিহাস ক্রমশ রক্তাভ করে তুলছে রঙ্গমঞ্চকে। ক্রমশ সাজ সাজ রব উঠেছে সংগ্রামী বাঙালীর সবুজ হৃদয়ের সাজঘরে।



হাওড়া স্টেশনে লোকারণ্য। হাতের ফুলের মালা। গলায় জয়ধ্বনি। কে আসছেন? কার অভ্যর্থনা?

আসছেন দাদাভাই নৌরজী। কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। শুরু হচ্ছে ১৯০৬-এর ২৬শে ডিসেম্বর। রসা রোডে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ির প্রায় কাছেই বাঁধা হয়েছে বিরাট মণ্ডপ। নৌরজী এবারের সভাপতি।

অনেক কাঠ-খড় পুড়েছে এই নির্বাচনের পিছনে। চরমপন্থীরা চেয়েছিলেন তিলককে। নরমপন্থীরা গররাজী। বাড়ির পাশে অধিবেশন, তবু চরমপন্থী চিত্তরঞ্জন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন পুরুলিয়া। যাবার আগে স্ত্রী বাসন্তীদেবীর উপর ভার দিয়ে গেলেন অতিথি-সৎকারের। তিলক, খাপার্দে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় নেতারা কলকাতায় এসে তাঁর বাড়িতেই উঠবেন।

অনেক ভেবে-চিন্তেই নরমপন্থীরা নির্বাচন করেছেন নৌরজীকে। নৌরজী ছিলেন বিলেতে। ভূপেন বসুর টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছল তাঁর কাছে। আপনাকে সভাপতি হতে হবে এবারের কলকাতা কংগ্রেসের। নৌরজী সম্মতি দিলেন।

৮২ বছরের বৃদ্ধ নেতা, সকলেরই শ্রদ্ধেয় Grand old man. চরমপন্থীরা মনে মনে চটলেও মুখে প্রতিবাদ করলেন না। নরমপন্থীরা ইংরেজ প্রভুদেরও তুষ্ট করলে এই সিদ্ধান্তে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

রাসবিহারী ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বে বিরাট মিছিল হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছে ভবানীপুরের পথে। যেতে যেতে বৃদ্ধ নৌরজী চশমার ফাঁক দিয়ে পড়তে লাগলেন শহরের দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় হরফের লেখা, Support Boycott, Support Autonomy. বিচক্ষণ নৌরজী বুঝলেন বাংলার হালচাল। নরম বনাম গরম মত-সংঘাত।

আগে-ভাগে অধিবেশন উপলক্ষে বসেছে স্বদেশী মেলা। 'রয়টার'এর ওপর ভার পড়েছিল মেলার বিজ্ঞাপনের। 'রয়টার' বিজ্ঞাপন দিলে—মেলার জন্যে চাই সুন্দরী যুবতী, আর দেশী বিদেশী জিনিসপত্র।

স্বদেশী মেলার বিজ্ঞাপন দেখে স্বদেশ প্রেমিকদের চক্ষুস্থির। সুন্দরী যুবতী? আচ্ছা বেশ! দর্শকদের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে সেটা নয় কোনমতে মানা গেল। কিন্তু বিদেশী জিনিস স্বদেশী মেলায় কি কারণে প্রয়োজন? কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিন পাল ফুঁসে উঠলেন। এইই যদি হয়, তাহলে আমরা বয়কট করবো ঐ মেলা।

হলও তাই। এসব কংগ্রেস অধিবেশনের আগের ঘটনা।

ঝড়ের পূর্বাভাষ।

মেলা যখন বসছে, তখন সমারোহ করে তার দ্বারোদ্ঘাটন কে করবে? কেন, বড়লাট মিণ্টো।

মডারেটরা মিণ্টো-প্রেমিক। অনেক আশা-ভরসা তাঁর উপর। চাওয়ার মতো করে চাইলে তিনি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও দিয়ে দিতে পারেন। তাঁকে তুষ্ট রাখতে হবে তুলসী-চন্দনের অর্ঘ্য দিয়ে।

একদা যথাসময়ে মিণ্টো সাহেবের আবির্ভাব ঘটল মেলা-প্রাঙ্গণে। উদ্বোধনী ভাষণে দেশীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বর্ষণ করলেন কিঞ্চিৎ উপদেশামৃত।

স্বদেশী কর, মেলা কর, আমি খুব খুশী। কিন্তু দেখ বাপু, এর সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ো না। আমি চাই honest স্বদেশী। honest স্বদেশীতে ভেজাল থাকবে না।

চরমপন্থীরা ঘা খেয়েছে তিলকের অমনোনয়নে। মিণ্টোর মিঠে বুলি তাদের কাটা ঘায়ে ছড়ালো নুনের ছিটে। প্রতিবাদে পরের দিনই বিডন উদ্যানে বিরাট সভা। সভাপতি লালা লাজপত রায়। তিলক, খাপার্দেরা প্রধান বক্তা।

কংগ্রেস অধিবেশনের আগেই এই রকম ফুটন্ত-জ্বলন্ত আবহাওয়া। অধিবেশন শুরু হল। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠলেন বৃদ্ধ নৌরজী। স্বকণ্ঠে ভাষণের একটুখানি পড়েই বাকী-টুকু পড়তে দিলেন গোখলেকে। ভাষণ শেষ হল। চরমপন্থীরা চরম নিরাশ। নতুন কোন বক্তব্য নেই। সেই মামুলী কথার চর্বিত চর্বন। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা। 'বয়কট' নিয়ে আবার শুরু হল সংঘর্ষ। বেপরোয়া বিপিন পাল ঘোষণা করলেন—এখন থেকে 'বয়কট' কথাটার মানে শুধু বিলেতী চিনি-নুন-কাপড়ই বর্জন নয়, সব রকমে ইংরেজ-প্রভুত্বের সংশ্রব বর্জন। তা ছাড়া 'বয়কট' আন্দোলনকে সারা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করতে হবে।

নরমপন্থীরা বললে—তা হয় না। 'বয়কট' শুধু বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দাদাভাই নৌরজী না-মঞ্জুর করে দিলেন বিপিন পালের প্রস্তাব। প্রতিবাদে তিলক, অরবিন্দ, মতিলাল ঘোষ, খাপার্দে, অশ্বিনীকুমার দত্তদের নিয়ে বিপিন পাল সদলবলে সভা ত্যাগ করে চলে এলেন চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে। সেখানে বসেই তাঁরা নতুন শক্তি সঞ্চয়ের পরিকল্পনায় মাতলেন, যা দিয়ে আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁরা নামবেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে বোঝা-পড়ায়।

অধিবেশণে তিলকের সংগে ফিরোজ শা মেটার এক দফা বাগ্-বিতণ্ডা হয়ে গেছল। রাগ করে ফিরোজ শা অধিবেশনের দিন-গুলোয় আর হাজির হলেন না। বিপিন পাল অধিবেশনের মধ্যে

একেবারে মুখের উপরেই বলে বসেছিলেন—'Sir Ferocious Mehta'. মণ্ডপের ভিতরে প্রতিদিনই এই রকম 'মেঘে মেঘে ধূম্রাকার' অবস্থা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয় হল চরমপন্থীদেরই। শেষ-অভিভাষণে নৌরজী ঘোষণা করলেন-কংগ্রেসের আদর্শ, স্বরাজ।

বিপিন পালের বন্দেমাতরম্ লিখলেন—"আমরা দাদাভায়ের প্রথম বক্তৃতা শুনে খুব নিরাশ হয়েছিলাম। কিন্তু উপসংহার শুনে সে ক্ষোভ মিটেছে।"

উৎসাহিত তিলক বললেন—"এই তো আমরা চেয়েছিলাম। দাদাভাই আমাদের স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়ে গেলেন। স্বদেশীতে যার আরম্ভ, স্বরাজে তার পূর্ণবিকাশ।"

নরমপন্থীরা অবশ্য 'স্বরাজ' কথাটাকে এত গভীর ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে রাজী নয়। কিছুদিন 'স্বরাজ' কথাটার খাঁটি অর্থ কি, তাইই নিয়ে দুই মহলে চলল ব্যাখ্যা-বিভ্রাট।

কংগ্রেস অধিবেশন নিয়ে কলকাতা যখন সরগরম, নিবেদিতা তখন কলকাতার কাছেই রোগশয্যায় মগ্না।

তাঁর ফরাসী জীবন চরিতকার, লেজেল রেম˚-র উপাখ্যানে পাই—

"সেবার গ্রীষ্মকালে নানা দুর্দৈবের মধ্যে আবার পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ আর বন্যা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইল। অশ্বিনীকুমার দত্তের চেষ্টায় অনেকগুলি সাহায্য-সমিতি গড়ে উঠল। নিবেদিতাকে তিনিই বরিশালে নিয়ে যান। গৈরিকবসনা নিবেদিতা ভাষণ দিয়ে ওখানে প্রচুর টাকা তুললেন। সে টাকায় পাঁচ-হাজার লোককে তিন দিন অন্তর পেট পুরে খেতে দেওয়া হত।

দেশের অবস্থা তখন খুব খারাপ। বরিশাল থেকে নিবেদিতা সে-দুর্দিনের ভয়াবহ বিবরণ নিয়ে এলেন। মানুষ একেবারে সর্বস্বান্ত। কলাপাতা পরছে, খাচ্ছে আগাছা, আর ভাঙা কুঁড়ের সামনে মরছে।

মেয়েরা আর্তনাদ করছে—'মাগো ভাত দে।' বাজারে সওদার জিনিস বলতে এক নৌকা শসা আর লঙ্কার চারা। বন্যার স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে একখানা বজরায় চেপে নিবেদিতা চার দিন ধরে খালে খালে ঘুরলেন। জল ক্রমেই বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে জিনিসের দাম। চাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। রূপকথায় যেমন, তেমনি বন্যার তাড়ায় বাঘে-গরুতে একত্র হয়। ছাগলের খুরের নীচে কুণ্ডলী পাকায় গোখরা সাপ। আতঙ্কে হিংসা ভুলে গেছে সবাই। কলকাতার লোককে এ-বিষয়ে অবহিত করার চেষ্টা করলেন নিবেদিতা। তিনি আর পুষ্পদেবী নামে সঙ্গিনী আরেকটি মহিলা ভাষণ দিলেন টাউন হলে, কাগজে কাগজেও লিখলেন। কিন্তু কেউ গা করল না।

এদিকে অসীম ক্লান্তি। হঠাৎ জ্বরে (cerebral fever) ধরল নিবেদিতাকে। সবাই ভাবল ম্যালেরিয়া, বলল বিশ্রাম নিতে। চলে গেলেন শহর থেকে আট মাইল দূরে দমদমে। একটা আম-বাগানে আনন্দমোহন বসুর একখানি আরামকুঠি ছিল, সেখানে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু গাছের ডালে ডালে হাওয়ার হাহাকার। কার একটানা মরণ-কাতরানি যেন তাড়া করছে নিবেদিতাকে।···"

কংগ্রেস অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে গোখলে ছুটে যান দমদমে, নিবেদিতাকে দেখতে। রাত জেগে মাথায় বোলান বরফ।

পদ্মার এপারে বাংলাদেশের কলকাতায় এই যখন অবস্থা, জাতীয় ঐক্য যখন মতবিভেদের ধাক্কাধাক্কিতে মৃতপ্রায়, তখন পদ্মার ওপারে ঢাকায় কুমিল্লায় পড়েছে এক নবজন্মের সাড়া; কলুষিত বিদ্বেষের আঁতুরঘরে। নবজাতকের নাম মুসলীম লীগ। পিতৃব্য নবাব সলিমুল্লা।

সলিমুল্লা যেন অনেকটা প্রহ্লাদকুলের দৈত্য।

তাঁর পিতামহ নবাব আবদুল গণি ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং হিন্দুপ্রীতির জন্যে প্রসিদ্ধ। হোলীর সময় চারদিকে গান-বাজনা,

রাঙা আবীরের উল্লাস। কিন্তু নিজের বাড়িতে নিরানন্দ। প্রতি বছর তাঁর হিন্দু-দারোয়ান ও কর্মচারীরা দোলের দিনে উৎসবে মাতে। গান-বাজনায় আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে সরগরম। সেবারের বিস্ময়কর স্তব্ধতা দেখে তিনি ডেকে পাঠালেন কর্মচারীদের।

তোমরা গান বাজনা করছো না কেন?

কর্মচারীদের করুণ কণ্ঠস্বর।

মৌলবী সাহেবের বারণ।

তোমাদের ধর্ম তোমরা পালন করবে, মৌলবীদের তাতে কি? যাও, আবীর নিয়ে মৌলবীদের দাড়ী রাঙিয়ে দিয়ে এস।

আরেকবার, তখন তাঁর পুত্র জমিদারীর কর্তা। নিজে অবসর নিয়েছেন নবাবী থেকে, এই সময় একজন হিন্দু কর্মচারী কর্মচ্যুত হলেন। অপরাধ, তাঁর পুত্রের মতে, কয়েক হাজার টাকার হিসেবের গরমিল। পদচ্যুত কর্মচারী যাতে নবাব বাড়িতে আসা-যাওয়াও না করেন, সে-রকম নিষেধনামাও জারী করা হল।

নবাব গণি মিঞা বেরিয়েছেন পথে, ভ্রমণে। হঠাৎ দেখা সেই কর্মচারীর সঙ্গে। গণি মিঞা-র চোখে মুখে আক্ষেপ।

কি বাবা, বুড়া বিষয় ছেড়েছে বলে কি আর বুড়ার সঙ্গে দেখাও করতে নেই?

করজোড় কর্মচারীর চোখ আনত, আপ্লুত।

—হুজুর, মনিব, আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু আমার এমনই ভাগ্য যে, আপনার দেখা পেতে পারি না। আমার জন্য দেউড়ীর দরজা বন্ধ।

কেন?

আমার হিসেবে ৪০ হাজার টাকার গরমিল।

তোমার কি বিশেষ অর্থাভাব হয়েছিল?

না।

বৃদ্ধ নবাব কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি চললেন প্রাসাদে।

নিজের ছেলেকে ডেকে বললেন,—'দেখ, আমার নতুন জমিদারী বন্দোবস্তের সময় এ ইচ্ছে করলে ৪ লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে পারত। কিন্তু নেয় নি। মনিবের সেবা করেছে ধর্মভাবে। সুতরাং এ যে চুরি করেছে, আমার বিশ্বাস হয় না। আর যদি করেও থাকে, সেটা আমারই দোষ, আমি এর অভাব পূর্ণ করতে পারি নি। যে গরমিল হয়েছে, তা আমার নামে খরচ লিখে একে চাকরিতে বহাল কর।'

সলিমুল্লা এই দাদুর নাতি।

বড়দিনের ছুটি। নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের বিংশতি অধিবেশন বসেছে ঢাকায়। সারা ভারতবর্ষ থেকে গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হয়েছেন। এমন কি অনেকে এই কারণে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি।

সম্মেলন শেষ হল। কিন্তু নেতারা ঢাকা ছেড়ে পা বাড়ালেন না। আরও একটা আলোচ্য বিষয় বাকী আছে।

সেটা কি? একটা সর্বভারতীয় মুসলমান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আকাঙ্ক্ষাটা ছিল অনেকেরই মনে অঙ্কুরের মতো। উদ্গত হতে পারে নি। এবার সলিমুল্লা এগিয়ে এলেন উদ্যোগে-উৎসাহে।

১৯০৬ এর সেটা শেষ দিন। ৩০শে ডিসেম্বর। ঢাকায় জন্ম নিল সারা ভারত মুসলিম লীগ।

তারই কিছুদিন পরে সলিমুল্লা বক্তৃতা দিলেন মুন্সীগঞ্জের রাকবি বাজারে।

প্রথমেই অভ্যর্থনা জানালেন ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর তারিখটিকে, যেদিন দু-টুকরো হয়েছিল বাংলাদেশ, ইংরেজের শান্-দেওয়া ইস্পাতের ফলায়। সলিমুল্লা ঘোষণা করলেন ঐ দিনটি মুসলমানদের কাছে happy day, শুভদিন। তারপর?

এবার মুসলমান ভাইরা সব এক হও, জোট বাঁধো। কেন? এবার আমাদের এই হিন্দুপ্রধান স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এতদিন ছিল না বলেই আমাদের অনেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। কংগ্রেস চায় ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ-বিতাড়ন। আমরা তা চাই না। ইংরেজ আমাদের সুযোগ দিচ্ছে, দেবে। বয়কট আন্দোলন হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। মুসলমানরা তাতে যোগ দিয়েছে সত্যি। কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প। পদমর্যাদায় অখ্যাত। তাদের লক্ষ্য, নেতা সাজা। লোভ, নাম-ডাকের। তাদের পিছনে রয়েছে হিন্দু নেতাদের প্ররোচনা।

সেদিন সলিমুল্লার এই সারগর্ভ ভাষণে শুধু যে মুসলমান শ্রোতারাই বিমুগ্ধ হল তাই নয়। সরকার পক্ষও বিমোহিত হল। যাক এতদিনে সিদ্ধ মনস্কাম।

এর কিছুকাল আগেই 'সিমলা ডেপুটশন' মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে লাটসাহেব মিন্টোর দরবারে পেশ করে গেছে একটা স্মারকলিপি। বক্তব্যটা একই। প্রত্যুত্তরে মিন্টো তাঁদের দিয়ে-ছিলেন বরাভয়।

আমি রইলাম আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। অভাব অভিযোগ যখন যা জানাবার, অকপটে জানাবেন।

আর পায় কে? পোয়া বারো।

১৯০৭-এর মার্চ মাস। নাবাব সলিমুল্লা এসেছেন কুমিল্লা পরিদর্শনে। বিশাল শোভাযাত্রা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে।

'এমন সময় হারে রে রে রে, ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে'। বিনা বাতাসে হেঁকে উঠল আকস্মিক ঝড়। হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমানরা। লুঠ হতে লাগল হিন্দুদের দোকান। নিপীড়ন শুরু হল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।

তখন কি পুলিস ছিল না কোথাও? সেই ভ্রাতৃবিরোধের দিনে তারা কি এগিয়ে এসেছিল পরিত্রাতারূপে? না তারা ছিল নিষ্ক্রিয়-নিস্পৃহ দর্শক। হয়তো তামাশা দেখছিল। কিংবা মহান দার্শনিকের মনোভাব নিয়ে তুলনামূলক তত্ত্বালোচনা করছিল মনে মনে, কোনটা বেশী শক্ত। হিন্দুদের মাথা, না মুসলমানদের লাঠি?

একদিনে শেষ, এক ফুঁয়ে নিভে যাবার আগুন ছিল না সেটা। কিছুদিন পরে আরও লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল ময়মনসিংহের জামালপুরে।

প্রতি বছর পুণ্য স্নান ও মেলা উপলক্ষে জামালপুরে এসে জড়ো হয় দূর-দূরান্তর, দেশ-দেশান্তরের তীর্থযাত্রীরা। এবারে বসেছে তেমনি মেলা। তেমনি তীর্থযাত্রীর ভিড়। গোড়ার দিকে ভিড়টা জমে নি। গুজব রটেছিল, দাঙ্গা বাধার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঢোল-সহরতে যখন জানান হল, হিন্দুরা নির্ভয়ে যোগ দিতে পারে, ভিড়ের চেহারা ফুলতে লাগল। কিন্তু ভুল ভাঙতে বেশীক্ষণ লাগল না। নিরাপত্তার ঐ যে আশ্বাস, ও কেবল খলের ছল। 'হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,' দলে দলে পিশাচ নৃত্য শুরু করে দিলে মেলা প্রাঙ্গণে।

লুঠ হতে লাগল স্বদেশীর দোকান। ভাঙল বাসন্তী প্রতিমা। ছুঁড়ে ফেলে দিল নারায়ণ শিলা। মেয়েরা সব প্রাণভয়ে আশ্রয় নিলে দয়াময়ীর মন্দিরে। কোথাও সারারাত কাটাল আকণ্ঠ জলের তলায়।

জ্বলতে থাকল জামালপুর। প্রভাবশালী হিন্দুরা এগিয়ে এল আত্মরক্ষার তাগিদে। তাদের হাতের বন্দুক উঠল গর্জে। মুসলমানরা প্রতিশোধে শুরু করে দিলে স্থানীয় জমিদারদের কাছারী লুঠ।

দিকে দিকে রটে গেল বগুড়া, রংপুরেও অচিরাৎ শুরু হবে সাম্প্রদায়িকতার এই মারণ-উৎসব। এমন কি কলকাতাতেও। সরকার মুসলমানদের পক্ষে।

সরকার পক্ষ থেকে ভারতসচিব মিঃ মর্লি কৈফিয়ত দিলেন, হিন্দুরা জোর করে মুসলমানদের দিয়ে বয়কট আন্দোলন করাতে চায়। এ তারই প্রতিক্রিয়া।

প্রতিবাদ জানালেন ১৫জন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা। ছেপে বেরোল স্টেট্সম্যানে। যুক্তি দিয়ে তারা প্রমাণ করলেন এই দাঙ্গার সঙ্গে বয়কটের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। একথা স্বীকৃত হয়েছে ইংরেজী সংবাদপত্রে, সমর্থিত হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের সওয়ালে। এটা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যার মূল উদ্দেশ্য বর্তমান আন্দোলনকে বাধাদান।

এবার চোখ বুলনো যাক্ সরকারী সংবাদপত্র, সরকারী কর্মচারীদের মতামত-মন্তব্যের ওপর।

মিঃ বেটসন বেল, দেওয়ানগঞ্জের আই. সি. এস অফিসার। বললেন, "হাঙ্গামার সঙ্গে বয়কটের কোন সম্পর্ক নেই।"

ঐখানেরই স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, নিজে মুসলমান। তাঁর বক্তব্য "হাঙ্গামা বাধানোর পিছনে কোন উত্তেজক কারণ ছিল না। হিন্দুদের লাঞ্ছিত করাই ছিল দাঙ্গাকারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য।" আর এক মোকদ্দমার বিচারকালে—"অভিযোগকারীদের সাক্ষ্যে প্রমাণ হয় যে হাঙ্গামার দিন আসামী মুসলমান জনতার কাছে একখানা ইস্তাহার পাঠ করেছিল এবং বলেছিল সরকার বাহাদুর ও ঢাকার নবাব হুকুম জারি করেছেন, হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুঠ করলে, তাদের ওপর অত্যাচার চালালে শাস্তি হবে না। তাই তারা কালী প্রতিমা ভাঙে, দোকান-পাট লুঠ করে।"

জামালপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ বার্নিভাল এক দাঙ্গার মোকদ্দমায় মন্তব্য করলেন—"কতকগুলো মুসলমান ঢোল সহরতে প্রচার করে যে, সরকার হিন্দুদিগকে লুঠ করিতে অধিকার দিয়েছেন।"

হাড়গিলচরের মহিলা-হরণ মামলায় মিঃ বার্নিভালকে আরও

বলতে শোনা গেল—"প্রচার করা হয় যে সরকার মুসমানদের হিন্দু বিধবাদের নিকা করতে হুকুম দিয়েছেন। তাতেই হাঙ্গামা বাধে।"

স্টেট্‌সম্যান লিখলে—"পূর্ববাংলায় প্রতিবেশী হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের এই আকস্মিক বিদ্বেষ প্রকাশের পিছনে কোন এক শক্তির রহস্যময় প্রভাব রয়েছে। একে জ্বলে ওঠার মুখেই নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত ছিল। ইংরেজ সরকারের দুর্বলতাই এই আগুনেকে দ্বিগুণ জ্বালিয়ে তুলেছে"।

মিঃ নেভিনসন, ইংরেজ সাংবাদিক। সারা পূর্ববাংলায় তিনি ঘুরেছেন ঘটনাকালে। নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর বিবরণ— "প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমি দেখেছি ইংরেজ অফিসাররা মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছে, যেখানেই মাথা তুলেছে সাম্প্রদায়িকতার সংঘর্ষ। বাংলার পূর্বাঞ্চলে সরকার এখন সরাসরিই মুসলমান সমাজকে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় মেতেছেন। ছোটখাট দোষে হিন্দুদের দিকে সরকারী শাসনযন্ত্রের শাসিত অস্ত্র উদ্যত। সরকারী চাকরি থেকে ক্রমশই হঠানো হচ্ছে তাদের। হিন্দুদের স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে সরকারী-সাহায্য। মুসলমানরা যখন হাঙ্গামা করছে, পিউনিটিভ পুলিস হিন্দুদের বাড়িতেই চালিয়েছে যথেচ্ছ তল্লাসী (ransacked) আর দুচারটে গুর্খা সৈন্যকে মোতায়েন করা হয়েছে হিন্দু অধিকৃত অঞ্চলে।···

ধর্মগুরু মোল্লা-মৌলভীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাণী বিতরণ করেছে মুসলমান ধর্মের নবজাগরণের জন্যে। গ্রামবাসীদের বলেছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মুসলমানদের পক্ষে এবং আইন-আদালতের কাজ তিন মাসের জন্যে বন্ধ। সুতরাং হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করলে, হিন্দুর দোকান লুঠ করলে, হিন্দু নারী হরণ করলে কোনরকম শাস্তি পাবার আশংকা নেই। এক রকমের 'লাল ইস্তাহার' এই সব কথাকেই অত্যন্ত বর্বর ভাষায় প্রচার করেছে। দেখা গেছে মুসলমানদের জন্যে প্রচুর সরকারী আসন

সুরক্ষিত। এমনকি যে সব ক্ষেত্রে যোগ্য মুসলমান প্রার্থী মেলে নি, সে সব আসন শূন্য ফেলে রাখা হয়েছে।…মুসলমানরা এখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশ রাজত্বে তাদের সাত খুন মাপ।"

মিঃ ওডোনেল একজন ইংরেজ এম. পি.। তার অভিযোগ, বিচারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইংরেজ জজদের মুসলমান প্রীতিটা একটু মাত্রাধিক্য।

এবার আসা যাক 'লাল ইস্তাহার' প্রসঙ্গে।

লাল ইস্তাহার কোন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাপার নয়। অনেক-দিনের হিন্দু বিদ্বেষ দিয়ে লালিত।

"প্রথম উঁকি দিয়েছিল ঢাকায় যখন মুসলিম লীগের কনফারেন্স চলেছে, গত বছরের ডিসেম্বর।"

মিঃ লে মেস্যুরিয়ার, পূর্ববাংলার ও আসামের চীফ সেক্রেটারীর রিপোর্টে ফাঁস হয়েছে এসব তথ্য।

"তারপর বরিশালে মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে। দায়িত্ববান মুসলমানরা একে চাপা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মে মাসে আবার এর প্রচারের কথা উঠল। 'বেঙ্গলী' প্রকাশ করলে যে রাজশাহীর মাদারী পাড়ায় এই ইস্তাহার ছড়ানো হচ্ছে। এখুনি এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ময়মনসিংহের এস. পি. কে এবং অন্যান্য জেলায় আদেশ দেওয়া হল অনুসন্ধানের, কারা ছাপছে, ছড়াচ্ছে। কিন্তু সেই সময়ে এস. পি. পড়লেন গুরুতর অসুখে। দেরি হয়ে গেল তত্ত্ব-তল্লাসীর। ইতিমধ্যে ঢাকার কমিশনার জানালেন যে ঐ ইস্তাহার লেখকের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং জেলা-শাসকের কাছে তাকে হাজির করা হয়েছে।

আসামী ধরা পড়ল। কিন্তু তার শাস্তি হল লঘু দণ্ড। 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করার সামান্য অপরাধে একজন হিন্দুর ওপর যে শাস্তি চাপানো হয়, তার তুলনায় বারুদের মতো উত্তেজক এই ইস্তাহার প্রচারের জন্যে যে শাস্তি দেওয়া হল তা নগণ্য। মাত্র

একহাজার টাকার ব্যক্তিগত বণ্ডে সই। একবছরের মধ্যে শান্তি বিঘ্নকর কোন কাজ করা চলবে না। আর যখনই ডাক পড়বে থানায়, হুজুরে হাজীর থাকা চাই।

লেখকের নাম, ইব্রাহিম খাঁ।

এই বিচার পর্ব দেখে কলকাতার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্তৃপক্ষরা পর্যন্ত লজ্জায় অধোবদন। স্যার এইচ. এ. স্টুয়ার্ট লিখেছেন "কোন সন্দেহ নেই কুমিল্লার শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তারপর লাল-ইস্তাহারের লেখকের নামে যে মামলা উঠেছিল, সেটাকে মাঝপথে তুলে নিয়ে এটাই প্রমাণ করা হল যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে রয়েছে মুসলমান-প্রীতির প্রবণতা।"

মিঃ এইচ. অ্যাডামসন লিখলেন—"মামলা শুরু করে সেটাকে তুলে নেওয়াটা যে বিচারের নামে প্রহসন, আমিও তা মানি। ম্যাজিস্ট্রেটের নথি-পত্র দেখে মনে হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটা সাধারণ কাগজে আসামীর বণ্ড লিখিয়ে নিয়ে যা করেছেন সেটা তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত।"

এই প্রসঙ্গে মহামান্য লর্ড মিণ্টো রায় দিলেন—"এই মামলার সত্যিকারের আইন-কানুন আমার জানা নেই। কিন্তু কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে যখন দেখলাম মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয়েছে এটা অত্যন্ত অবিচার।"

এবার চোখ বুলোনো যাক লাল ইস্তাহারের পাতায়, তার জাহ্-মাখানো ভাষায়, যা হাজার হাজার মুসলমানকে কুমিল্লায়, জামালপুরে অমানুষিক উল্লাসে খেপিয়ে তুলেছিল হিন্দু-নিধন যজ্ঞে।

"মুসলমান; উঠ, জাগ, হিন্দুর দোকান হইতে কোন জিনিস কিনিও না। হিন্দুদিগের দ্বারা প্রস্তুত কোন জিনিষ স্পর্শ করিও না। হিন্দুকে কোন চাকরি দিও না। হিন্দুর অধীনে চাকরি লইয়া হীনতা স্বীকার করিও না। তোমরা অজ্ঞ, কিন্তু তোমরা জ্ঞানার্জন করিলে সব হিন্দুকে এখনই জাহান্নমে পাঠাইতে পার।

এ প্রদেশে তোমরাই সংখ্যায় অধিক। কৃষকদিগের মধ্যেও তোমাদেরই সংখ্যা অধিক। কৃষি অর্থাগমের উপায়। হিন্দুদের আপনাদের টাকা নাই। তাহারা তোমাদের টাকা লইয়াই বড়লোক হইয়াছে। তোমরা যদি জ্ঞানার্জন কর, তবে হিন্দুরা আর খাইতে পারিবে না এবং শীঘ্রই মুসলমান হইবে।"

এটা হল লাল ইস্তাহারের সবচেয়ে ভদ্র চেহারা। এরই আরেক রকম নমুনা আছে, যা বিকৃত রুচির ভাষায় লেখা, যাকে ধিক্কৃত করার ভাষা নেই।

"এতদ্বারা শহরের হিন্দু শালাদের জানানো যাইতেছে যে, সাতদিনের মধ্যে শালাদের ঘরবাড়ি লুঠ করিব। হিন্দু কি করিতে পারে। শালারা মুষ্টিমেয় হইয়া সমুদ্রবৎ মোছলেমদের সঙ্গে লড়িতে চায়, শালারা জানে না যে আমাদের একদিন না হইলে ছিকার ওপর হাঁড়ি ওঠে। আমরা মৎস্য মোলাইতেছি, আমরা দুগ্ধ মোলাইতেছি. আমরা তরকারী মোলাইতেছি, কোন জিনিস আমরা মোলাইতেছি না।···ভাই মুসলমানগণ, তোমরা নাপাক হিন্দুদের কোন প্রকার সংশ্রব রাখিও না, হিন্দুকে মার, হিন্দুর গৃহ লুট কর, হিন্দু আওরতকে ধরিয়া নিকা কর, হিন্দুর মন্দির ভগ্ন কর, হিন্দুর দেবদেবী ভগ্ন কর, যে রকমেই পার হিন্দুকে তাড়াও, তাহা না হইলে তোমাদের মঙ্গল নাই। ভাই সকলে সাতদিনের মধ্যে হিন্দুদের উচ্ছেদ করিয়া ব্যাঙ্ক লুটিয়া টাকা সংগ্রহ কর, গবর্নমেন্ট কিছুই বলিবে না।"

শালাদের বড় ভগ্নীপতি
পাবনাস্থ মোছলেমগণ।

কুমিল্লা-জামালপুরের দাঙ্গার দিনে বন্দেমাতরম্ এর সংবাদিকতা যেমন রুদ্র, তেমনি দীপ্ত ও মহীয়ান।

"কুমিল্লা মেঘে ঢাকিয়াছে। গবর্নমেন্ট বলে, স্বরাজ-দম্ভকারী বাঙালীরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করুক। হে বাংলার

পদলেহনকারী ক্রীতদাসেরা, যদি তোমাদের দক্ষিণ বাহুতে শক্তি না থাকে তবে তোমরা তোমাদের সন্তানদের জীবন ও স্ত্রীলোকদের ইজ্জত রক্ষা করিতে পারিবে না।"

২৯শে এপ্রিল। "আজ প্রাতে জামালপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গৌরীপুর কাছারী লুঠ হইয়াছে। 'দয়াময়ী' মন্দিরও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুরা মেয়েছেলে নিয়ে শহর পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু পথে মুসলমানেরা অবরোধ করিয়া গাড়ি থামাইবার চেষ্টা করিতেছে।"

১লা মে। ভগ্ন বাসন্তী প্রতিমার ছবি ছেপে বেরুল বন্দে-মাতরমে। সেই সঙ্গে অরবিন্দের অগ্নিস্রাবী মন্তব্য। "এই ছবি হল আমাদের নিজেদের লজ্জা, দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে নৈতিক অধঃপতনের ও আমাদের মনুষত্ববোধ বিলুপ্তির ছবি।"

৭ই মে। "হয় সংশোধন কর, না হয় শেষ কর। পূর্ববঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র হইতে সংবাদ আসিতেছে যে বদমায়েসরা স্ত্রীলোক-দিগকে বলপূর্বক ধর্ষণ করিতেছে, অথবা ধর্ষণ করিবে বলিয়া শাসাইতেছে।...যদি বাঙালী জাতি সত্যিই এমনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে যে দুর্বৃত্তের দ্বারা তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নষ্ট হইতে দেখিয়াও প্রতিকারার্থে আঘাত না করে, তবে যত শীঘ্র এই বাঙালী জাতি পৃথিবী ভারাক্রান্ত না করিয়া পৃথিবী হইতে মুছিয়া, লুপ্ত হইয়া যায়, ততই ভাল।"

৯ই মে। "আর দেরি করা নয়। 'কেশরী' (তিলকের পত্রিকা) যথার্থই লিখিয়াছে যে, এই উপযুক্ত সময়; যখন বাঙালী জাতি স্বদেশী আন্দোলন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের নেতা হইয়াছে, তখন এই ঘটনার উপযোগী ব্যবহার সে করিবে।"

১০ই মে। "আমরা পশুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। আমরা প্রতিদিন পূর্ববঙ্গ হইতে হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইতেছি যে, হিন্দুর

উপর মুসলমান ভাড়াটে গুণ্ডা লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে; তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে নূতন জাতীয়ভাবকে নিষ্পেষিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া যায়। মিঃ তিলকের মারাঠা লিখিতেছে যে আমাদিগকে কি সত্যিই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অন্ততঃ কুড়িটি মস্তক বাধা প্রদানার্থে ভগ্ন হইবার পূর্বে সত্যই কালাপাহাড় দুর্গা-প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছে? ঐ দুর্গাপ্রতিমার দেহের ভগ্ন অংশগুলি লইয়া দুবৃর্ত্তেরা যখন প্রকাশ্য রাজপথে জয়োল্লাস করিয়া যাইতেছিল তখন কি বাধা প্রদানার্থে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই? স্ত্রী-লোকদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া পাশবিক অত্যাচার করিবার পূর্বে কি বাধাপ্রদান করিতে গিয়া রাজপথে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই? হে মা দুর্গা, তুমি সত্যই অপমাণিত হইয়াছ এবং তোমার সমতুল্যা নারী জাতিকে আমরা বিশ্বাঘতকতা করিয়া শত্রু হস্তে সমর্পণ করিতেছি। মারাঠার এই ধিক্কারের সম্মুখে আমাদের মাথা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িয়াছে।"

জামালপুরের দুর্গাপ্রতিমা ভেঙেই মুসলমান শান্ত হয় নি। ময়মনসিংহের অম্বারিয়া গ্রামের কালীমূর্তি ভাঙল। রায়গঞ্জের বারোয়ারী কালীপ্রতিমার গলায় পরিয়ে দিলে গরুর হাড়, জুতো আর মাথার খুলির মালা। জামালপুরের হাঙ্গামার সময়েই কামিনীকুমার ভট্টাচার্য লিখলেন তাঁর ভয় ভাঙানো গান।

আপনার মান রাখিতে জননী! আপনি কৃপাণ ধর গো।
পরিহারী চারু কণক ভূষণ; গৈরিক বসন পর গো।
আমরা তোদের কোটি কুসন্তান
ভুলিয়া গিয়াছি আত্মঅভিমান
করে, মা পিশাচে তোদের অপমান,
তাও নেহারি নীরব সহি গো!
তোদের তপ্ত শোণিত পরশে
পিশাচে পীড়িত ভারতবর্ষে

জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়।
শুনিয়ে তোদের ভৈরব হুঙ্কার, নিখিল চমকি উঠুক আবার
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে কর মা ধৌত কর গো।

এইভাবে কুমিল্লা জামালপুরের ইংরেজ শাসনের সোনার তরী ভরে উঠল স্বদেশী-ভাঙা ভেদনীতির প্রথম পাকা ফসলে।

কলকাতা-কংগ্রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিলক ঠিক করলেন, এখন কিছুদিনের জন্যে তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হবে মাদ্রাজ। জাতীয়বাদী চিন্তাধারার দিক থেকে মাদ্রাজ পিছিয়ে আছে। কংগ্রেস অধিবেশনে মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্তি আয়ার, আনন্দ চার্লু, এঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বয়কট প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন ফিরোজ শা মেটা-র লেজুড় হয়ে।

মাদ্রাজ যাত্রার পথে তিলক বিপিন পালকে নিলেন সঙ্গে। ১৯০৭-এর ১লা মে। মাদ্রাজে পা দিয়েই বিপিনচন্দ্র রাজমন্দ্রী শহরে তাঁর মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের কপাট খুলে দিলেন। পয়লা বক্তৃতাতেই প্রলয়কাণ্ড। সরকারী কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে বসল।

পরের দিন আর এক বক্তৃতায় সোজাসুজি ঘোষণা করলেন— "The Indians desired to make it autonomous, absolutely free of the British Parliament."

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কানাকড়ি প্রভুত্ব না মেনে ভারতবর্ষ চায় তার পূর্ণ স্বাধীনতা।

তীরের ফলার মতো সুতীক্ষ্ণ এই উচ্চারণ এসে সোজা বিঁধল বড়লাট মিণ্টো, ভারতসচিব মর্লির বুকে। তাঁদের ললাটদেশে একই সঙ্গে বুঝি ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার স্বেদ, দুষ্কৃতি-দমনের সংকল্প।

বিপিনচন্দ্রের বজ্রনাদে মাদ্রাজের মাটিতে যখন ভূমিকম্পের মতো কাঁপুনি, সেই সময় পাঞ্জাবে ঘটে গেল একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

১৯০৭-এর ১০ই মে সিপাহী বিদ্রোহের অর্ধশতবার্ষিকী। সরকারপক্ষ অনুমান করলে, এই উপলক্ষে পাঞ্জাবে একটা বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। এই অনুমানের পিছনে কারণ আছে। কয়েকমাস আগে পাঞ্জাবের চাষীদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে অকারণ করের বোঝা। 'কলোনাইজেশন বিল' তৈরি করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে অনেক পূর্ব-স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা। বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে আন্দোলন। এই আন্দোলনের পিছনে যাঁর মাথা, তিনি হলেন লালা লাজপত রায়। আর তাঁর ডান হাত অজিত সিং। তারা সারা দেশে খেপিয়ে তুলেছে কৃষক সমাজকে। এই সব ক্ষুব্ধ কৃষকদের আত্মীয়স্বজনরা গভর্নমেন্টের শিখ রেজিমেন্টের সৈন্য। বিদ্রোহী নেতারা তাদেরও ডাক দিয়েছে—"to rise, to attack the English and be free."

লাহোর, অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, ফিরোজপুর, মুলতান, এসব জায়গা যেন উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি, যে কোন মুহূর্তে উদ্‌গীরণ শুরু হয়ে যেতে পারে। যেতে পারে নয়, কিছুটা হয়ে গেছে রাওয়াল-পিণ্ডিতে। জনতার ক্রোধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সাহেবদের বাড়িঘর।

সুতরাং আরও বড় বিদ্রোহের অনুমান অমূলক নয়।

৯ই মে। কলকাতা। গভীর নিশুতি রাত। অরবিন্দ নিদ্রাগত। এই সময় তাঁর এক সহকর্মী তাঁকে জাগিয়ে তুললেন ঘুম থেকে। কি ব্যাপার? সহকর্মী তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটা টেলিগ্রাম। অরবিন্দ পড়লেন।

বিনা বিচারে লালা লাজপত রায় ও অজিত সিং-এর নির্বাসন। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন অরবিন্দ। তখুনি হাতে তুলে নিলেন কাগজ-কলম। লিখলেন—

"লালা লাজপত রায় বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইলেন। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রোয়জন। টেলিগ্রামে প্রকাশ

৪ দিনের জন্যে এই ঘটনায় ক্রোধব্যঞ্জক সভা হইতে পারিবে না। ক্রোধব্যঞ্জক সভা? বক্তৃতা ও ভাল করিয়া লিখিবার কাল অতীত হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের সমরাহ্বান ঘোষিত হইয়াছে। আমরা সেই আহ্বানে অগ্রসর হইব। পাঞ্জাববাসী সিংহের জাতি। এই যে সব লোক তোমাদিগকে ধূলিসাৎ করতে চাহে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও যে, তাহারা যে একজন লাজপত রায়কে লইয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে শত শত লাজপত রায়ের আবির্ভাব হইবে। শতগুণ উচ্চ তোমাদের সমরাহ্বান তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক। জয় হিন্দুস্থান।"

মাদ্রাজের বক্তৃতা পর্ব মাঝপথে থামিয়ে বিপিনচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন কলকাতায়। হয়তো তাঁর নিজের মধ্যেই দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছিল—নির্বাসনের। দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল অরবিন্দের মনেও। বন্দেমাতরমে লিখলেন—"যদি বিপিনচন্দ্র পাল নির্বাসিত হন, যদি বন্দেমাতরম্ সন্ধ্যা ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, তাহলে আগুন কেবল চাপা পড়বে এবং পরে তা হয়ে উঠবে আরো সর্বগ্রাসী ও অপ্রতিরোধ্য।"

মাদ্রাজ থেকে ফিরে বিপিনচন্দ্র কলকাতার এক বক্তৃতায় হঠাৎ মা-রক্ষাকালীকে আহ্বান জানিয়ে বসলেন রাজনীতির জগতে। বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টের লোক। সেখানে প্রচলন আছে শ্বেতবর্ণা রক্ষাকালীর।

বিপিনচন্দ্র বললেন, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে করতে হবে এই পুজো, প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে। প্রত্যেকটি পুজোয় দিতে হবে ১০৮টি ছাগ বলি। প্রত্যেকটি ছাগলের গায়ের রং হবে সাদা।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এই বক্তৃতা শুনে রেগে লাল। তারা ভাবলে, এটা তাদের প্রতিই কটাক্ষ।

সরকারী মতে কয়েকটি সংবাদপত্র এই সময়ে শুরু করেছিল বড্ড বেশী বৃটিশ-বিরোধী প্রচার। সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ এরাই।

অরবিন্দ যা আশংকা করেছিলেন তাই হল। শুরু হল সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ।

৩রা জুলাই। যুগান্তর আপিসে ঢুকে পুলিস শুরু করে দিলে তল্লাসী।

ডিটেকটিভ পুলিস ফোর্সের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিস এসে ঢুকলেন ৪১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে।

আপনি কে?

আমি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। যুগান্তরের কার্যাধ্যক্ষ।

সম্পাদক কে?

ঐযে, যিনি বসে আছেন।

যিনি বসেছিলেন তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

আপনিই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত? তাহলে এই খানাতল্লাসী ওয়ারেণ্টের পিছনে সই করে দিন। এবার কিন্তু একবার আপনার বাড়িতেও যাব।

বাড়ি তল্লাস করে পুলিস হস্তগত করলে কয়েক কপি যুগান্তর।

তারপর ৫ই জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বেরুল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। আসলে 'যুগান্তর'-এর কোন নির্দিষ্ট সম্পাদক ছিল না। বারীন্দ্রকুমার, দেবব্রত বসু এঁরা দেখতেন লেখা। ভূপেন্দ্রনাথ করতেন লেখা যোগাড়। এঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন অরবিন্দ, গণেশ দেউস্কর, অবিনাশ চক্রবর্তী। সহকর্মীদের পরামর্শে ভূপেন্দ্র-নাথই ধরা দিলেন সম্পাদক রূপে।

ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর পক্ষে জামিনের দরখাস্ত করলে আদালত জানাল, দুজন লোককে পাঁচ হাজার টাকা করে জামিন দাঁড়াতে হবে।

নিবেদিতা ছুটে এলেন ভূপেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে। দশহাজার টাকা লাগবে জামিনের জন্যে? ঠিক আছে, ব্যাঙ্কে

আমার ঠিক ঐ পরিমাণ টাকাই আছে। তোমরা নাও। আমি ভিক্ষে করে ঐ টাকা পূরণ করে নেব।

জামিনে খালাস পেলেন ভূপেন্দ্রনাথ। মোকদ্দমার দিন পড়ল ২২শে জুলাই।

যুগান্তরের বিরুদ্ধে সরকারী হামলা বা মামলার মূল উপলক্ষ্য হল ১৬ই জুনের দুটি প্রবন্ধ। একটির নাম 'নাই ভয়', আরেকটির 'লাঠ্যৌষধি'।

বিচারপতি কিংসফোর্ডের মতে দুটি লেখাই বিপজ্জনক। প্রথমটিতে বলা হয়েছে—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য যেন একটা ভিত্তিহীন অট্টালিকা, একটু আঘাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে। তবুও যে এতদিন এটা টিকে আছে তার কারণ ভারতবাসীর নির্বুদ্ধিতা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের বক্তব্য আরও 'নগ্ন ও পরিষ্কার'। পাঞ্জাবে সরকারী-বিরোধী হিংসাত্মক কর্মনীতি সমর্থন জানিয়ে এতে বলা হয়েছে যে, কাবুলী দাওয়াই এখন শ্রেষ্ঠ দাওয়াই। There is no such wonderful remedy as the Kabuli Medicine.

বিচারে একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল ভূপেন্দ্রনাথের। ২৫শে জুলাই-এর বন্দেমাতরম্-এ অরবিন্দ এই কারাবরণকে সম্মান জানিয়ে 'one more for the alter' প্রবন্ধে লিখলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে মানুষকে দুঃখ বরণ করতেই হবে with erect heads and undimmed eyes.

২৪শে জুলাই-এর অপরাহ্ণ। কলেজ স্কোয়ারে কলকাতার নাগরিকদের সভা। সভার উদ্দেশ্য ভূপেন্দ্রনাথের কারাবরণকে অভিনন্দিত করা।

৯ই আগষ্ট। ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়িতে বাংলার নারী সমাজের সভা বসেছে তাঁর সহধর্মিণীর ডাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ ভূপেন্দ্রনাথের গৌরবোজ্জ্বল কারা-

বরণকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভিষেক জানিয়ে তাঁর মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি অভিনন্দন পত্র, এই হচ্ছে সভার উদ্দেশ্য।

সভানেত্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী লীলাবতী দেবী। সভা শুরু হল রবীন্দ্রনাথের 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' গান দিয়ে। সভানেত্রী প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তারপর শ্রোতাদের কাছে পাঠ করে শোনান হল অভিনন্দন পত্র। পড়লেন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী।

'যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।'

সময়োচিত সম্ভাষণ পুরঃসর নিবেদন,

আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার লইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেক বঙ্গনারী অসীম গৌরব অনুভব করিতেছি। পতিত জাতি ক্ষীণপুণ্য হৃতধর্ম ও লুপ্ত গৌরব পুনরায় লাভ করিতে গিয়া পদে পদে যখন তীব্র অপমান ভোগ করেন, তখন সে নিগ্রহ উজ্জ্বল মণির ন্যায় জাতীয় জীবনের শোভাবর্ধন করিয়া থাকে। বিধাতার শুভ বরে আপনার পুত্র অদ্য যে স্পৃহনীয় আভরণ অর্জন করিয়া আনিয়াছেন, তাহার দীপ্তিতে কেবল আপনার কুল নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত হইয়াছে। এরূপ সন্তানের জন্মে কুল পবিত্র, জননী ধন্যা ও জন্মভূমি আলোকিত হইয়া থাকেন। আপনার পুত্রের ন্যায় নির্ভীক স্বদেশ-সেবক পুত্র প্রতি বঙ্গনারীর অঙ্কে অবতীর্ণ হউন, এই আশীর্বাদ অদ্য আমরা বিধাতার নিকট ভিক্ষা করিতেছি।

স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা দেবী এই উপলক্ষে লিখেছিলেন একটা সুদীর্ঘ কবিতা। 'শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি।'

"তোমারে দেখিনি বৎস! তবু দূর হতে
অযুত বিজয় মাল্য পরাই গলেতে।
তরুণ বয়সে তুমি! সিংহের সমান
যুঝিয়া রাখিলে ভবে বাঙালীর মান।
রাখানি তোমার তেজ, তোমার সাহস,
থাকিবে অটুট বঙ্গে, তোমার সুযশ।
এক হতে অযুতের হইবে উত্থান,
জননীর দুঃখনিশা হবে অবসান।...

সভায় কবিতাটি পড়ে শোনালেন কৃষ্ণকুমার মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা। কবিতা পাঠের পর রুপোর থালায় কারুকাজ করা সেই অভিনন্দন পত্রটি সাজিয়ে তুলে দেওয়া হল ভূপেন্দ্রনাথের জননী শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী দেবীর হাতে। সভা শেষ হল গান দিয়ে—'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে।'

যুগান্তরেই পরের সরকারী কোপদৃষ্টি পড়ল বন্দেমাতরমের দিকে। ৩০শে জুলাই শুরু হল খানাতল্লাসী। অরবিন্দ আপিসে অনুপস্থিত। পুলিস কিছু কাগজপত্র হাতড়ে নিয়ে চলে গেল।

তারপর এল ৭ই আগস্ট, বয়কট আন্দোলনের তৃতীয় বার্ষিকী দিবস। সন্ধ্যা-র আপিসে, যেখানে ছাপা হতো 'যুগান্তর', আবার পুলিস হানা দিয়ে কয়েকটি ছাপানো ফর্মা নিয়ে চলে গেল। তবে একেবারে নির্বিবাদে নয়। বাধল ছোটখাট সংঘাত। হাঙ্গামায় দুজন যুবক ও দুজন গোয়েন্দা পুলিস আহত হল।

৭ই আগস্টের পর কেটেছে মোট দিন সাতেক। হঠাৎ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হল অরবিন্দের নামে। কারণ?

যুগান্তর কাগজে যে-সব রাজদ্রোহমূলক লেখা বেরোয়, যার জন্যে তার সম্পাদককে দেওয়া হয়েছে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি, সেই সব লেখাই 'বন্দেমাতরমে' অনুবাদ হয়ে বেরোয়। এটা ঘোরতর বে-আইনী কাজ। তা ছাড়া বন্দেমাতরমে যেসব

লেখা বেরোয়, সেগুলো তো যেন আগুনের ফুল্‌কি। সরকার পক্ষের কৌশলী মিঃ গ্রেগরীর ভাষায়—'The whole tone of this article is of a seditious character."

তা না হয় হল। কিন্তু অরবিন্দের হাতে হাতকড়া কেন?

উনিই যে বন্দেমাতরম-এর সম্পাদক।

প্রমাণ আছে?

আদালতেই প্রমাণ হবে।

১৬ই আগস্ট অরবিন্দ পুলিসের কাছে আত্মসমর্পন করলেন। খালাস পেলেন আড়াই হাজার টাকার জামিনে।

২রা আগস্ট তিনি পদত্যাগ করেছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ থেকে। কারণটা রাজনৈতিক। তাঁর রাজনৈতিক মতামত যাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়, সেই ভেবেই তিনি সরে এলেন।

২২শে আগস্ট, অরবিন্দ যখন বিচারের আসামী, তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে এক সভা ডাকা হল। সভার শেষে ছাত্ররা দাবি করলে কলেজে রাখার জন্য তারা অরবিন্দের একখানা ফটো তুলতে চায়।

পরের দিন অরবিন্দ এলেন কলেজে। জাতীয় স্কুল এবং কলেজের ছাত্ররা একে একে এসে অবনত মস্তকে তাদের প্রিয় গুরুর পদপ্রান্তে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে যেতে লাগল। গলায় পরিয়ে দিলে আপ্লুত অন্তরের আনন্দ-বেদনা দিয়ে গাঁথা পুষ্পমাল্য। ছবি তোলা হল দুটি। একটায় তিনি একা। আরেকটা সমবেত।

ছাত্ররা দাবী করলে তারা শুনতে চায় তাঁর ভাষণ। অরবিন্দ সে দাবি অপূর্ণ রাখলেন না। বললেন—"Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice."

অরবিন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষের

আকাশে বাতাসে। রবীন্দ্রনাথ সবার আগে জানালেন তাঁর স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

বিচার-পর্ব শুরু হল। কিন্তু কিছুতেই প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে অরবিন্দই বন্দেমাতরমের সম্পাদক, তখন কাগজে কোথাও সম্পাদকের নাম ছাপা হত না বা হওয়ার আইনসঙ্গত বাধ্যবাধকতা ছিল না।

রাজা সুবোধ মল্লিক বন্দেমাতরমের ম্যানেজিং ডাইরেকটার। তাঁর স্বাক্ষ্য থেকে জানা গেল বিপিনচন্দ্র পালও এই কাগজের এক-জন নিয়মিত লেখক।

তাহলে তাঁকেও আদালতে হাজির করা হোক সাক্ষী হিসেবে। নিশ্চয়ই তিনি হদিস দিতে পারবেন ঐ সব নিষিদ্ধ রাজদ্রোহমূলক লেখাগুলোর জন্যে আসল দায়ী কে? লেখা দুটির নাম হল 'Politics for India' আর 'India for Indians'.

চিত্তরঞ্জন দেখলেন শিয়রে শমন। বিপিন পালকে যদি পুলিস সাক্ষী দিতে বাধ্য করে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে। শেষ পর্যন্ত অরবিন্দকে হয়তো বাঁচানো যাবে না।

চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে বসলেন শলা-পরামর্শে। আপনি সাক্ষী দিতে অস্বীকার করুন।

কেন?

প্রথমত আপনি মাদ্রাজে যে-সব ভয়ংকর বক্তৃতা দিয়েছেন, তার জন্যেই সরকার আপনাকে অনায়াসে অনির্দিষ্টকালের জন্যে নির্বাসনে পাঠাতে পারে। কিন্তু এখন যদি আপনি সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আদালত-অবমাননার দায়ে নিদেন পক্ষে আপনার জেল হবে ছ' মাসের। মান্দালয় দুর্গে অনির্দিষ্টকালের বন্দিত্বের চেয়ে ছ' মাসের জেল অনেক ভাল।

তা ছাড়া আপনি সাক্ষ্য না দিলে প্রমাণের অভাবে অরবিন্দ

পাবেন মুক্তি। যাকে বাজেয়াপ্ত করার জন্যে পুলিস হন্যে হয়ে আছে, সেই বন্দেমাতরম্‌ও বাঁচবে।

এ ছাড়া আপনারা যদি একে একে এইভাবে বন্দী হন চরমপন্থী আন্দোলন ভেঙে পড়বে।

বিপিনচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—

শাস্তি যে ছ' মাসের জেলই হবে তার কি কোন স্থিরতা আছে?

আমি দায়ী রইলাম।

সম্মত হলেন বিপিনচন্দ্র। পুলিশ কোর্টের প্রাঙ্গণে সেদিন অগণিত জনতা। বিপিন পাল আদালতে ঢুকলেন। রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। রুদ্ধবাক দর্শক।

আদালতে ঢুকেই বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করলেন—

"আমি এই মোকদ্দমায় কোনরূপ অংশগ্রহণ করা বা হল্‌প করা আমার বিবেক-অনুমোদিত নয় বলেই তা করতে প্রস্তুত নই।"

সমস্ত আদালত বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আদালতের হাকিম কৌঁসিলীরা বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। বিপিনচন্দ্র অবিচলিত।

"I refuse to answer any question in connection with the case."

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ৫০ টাকার মুচলেকার বিনিময়ে সেদিনকার মতো বিপিনচন্দ্র বেরিয়ে এলেন আদালত থেকে। মামলা গেল ম্যাজিস্ট্রেট রামানুগ্রহ নারায়ণ সিংহের এজলাসে।

পরের দিন বিচার।

সবাই ভাবলে, এবার আর নিস্তার নেই। আদালত-অবমাননার এত বড় অপরাধ ইংরেজরা বেকসুর হজম করবে না। কিন্তু অসাধ্যসাধন করলেন চিত্তরঞ্জন। মামলার সওয়াল-জবাব শুরু হবার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন দীপ্ততেজে।

বিচারপতি,

আমি জিজ্ঞাসা করি সাক্ষী হইলেই কি বিবেকবাণীর

আদেশানুযায়ী কাজ করিবার অধিকার তাহার লুপ্ত হয়? সাক্ষীর কি একথা বলিবার অধিকার নাই যে, যদিও সাধারণত হল্‌প গ্রহণ করা বা সাক্ষ্য দেওয়া তাহার কর্তব্য সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু যেখানে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব, সত্য বলিবার শক্তি হৃত, স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিহত, যে মোকদ্দমা পরিচালনে ন্যায়ের মর্যাদা সংরক্ষিত হয় না, যেখানে শাসনযন্ত্রের যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিতে ধর্মাধিকরণের কোন আধিপত্য নাই, সেই বিচার-আদালতকে সাহায্য না করিলে বাস্তবিক তাহার অপরাধ হয় কি? ইংলণ্ড বা আমেরিকা দেশে নিশ্চয়ই এ সমস্ত মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য হইতে পারে, কেননা সেখানে যে ক্ষমতায় এই সমস্ত অভিযোগ ও মোকদ্দমা পরিচালিত হয়, তাহা গণতন্ত্রের মতামতের মুখাপেক্ষী, আবশ্যক হইলে উহা সেই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু যেখানে সে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়, তথায় আমি এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ অভিযোগে সহায়তা প্রদান না করিলে কেন দণ্ডার্হ হইব? আর যদি বিবেকের অনুশাসন মানিবার জন্য বাস্তবিকই আমার অপরাধ হইয়া থাকে, ব্যক্তির জন্মগত অধিকার বলে কর্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত কার্য করিলে যদি সত্যই আমার দণ্ড হয়, যদি ন্যায়-বিরুদ্ধ, অসঙ্গত ও ধর্ম-বিগর্হিত অভিযোগে সহায়তা প্রদান না করিয়া আমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তবে আমিও মুক্ত কণ্ঠে নিবেদন করিতেছি যে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাই যে কেহই দুঃখভোগ, দণ্ড বা কারাভোগ ব্যতীত স্বীয় অধিকারলাভে সমর্থ হয় না। এবং আমিও অবনত মস্তকে আপনার প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

যিনি শাস্তি দেবেন, সেই বিচারকের চোখেই জল।

বিপিনচন্দ্র শাস্তি পেলেন মাত্র ছ' মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু অরবিন্দের বিচার তখনও শেষ হল না।

এবার এল সন্ধ্যার পালা।

১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যায় ছেপে বেরিয়েছিল একটা প্রবন্ধ। নাম 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'। রাজদ্রোহমূলক রচনা। সুতরাং শুরু হয়ে গেল খানাতল্লাসী। প্রথমেই গ্রেপ্তার হলেন ম্যানেজার সারদাচরণ সেন। জামিনে পেলেন খালাস। পুলিসের কাছে আরও দুটো ওয়ারেন্ট ছিল। একটা মুদ্রাকর হরিচরণ দাসের নামে। আরেকটা ব্রহ্মবান্ধবের।

ব্রহ্মবান্ধব পরের দিনই সারদাচরণকে ডেকে বললেন—এখুনি থানায় যাও।

কেন?

পুলিসকে ডেকে আনো। আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জামিনেও খালাস। বিচারের দিন এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

ব্রহ্মবান্ধব বললেন—আমি যে আদালতে যাব, কি প'রে যাব?

কেন যা প'রে আছেন।

ছিঃ। ফিরিঙ্গীর আদালতে যাব গেরুয়া বসনে? আমি সন্ন্যাসী। গেরুয়া আমার বড় প্রিয় পোষাক।

তাহলে উপায় কি?

উপায় আছে। আদালতে যাবে ব্রহ্মবান্ধব নয়, যাবে ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার গলায় পৈতে পরিয়ে দাও। যজ্ঞো-পবীত ধারণ করে, শ্বেতবস্ত্রে আমি যাব আদালতে।

তাই হল।

বিচারের দিন। চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছিলেন যাতে এই বিচার কিংসফোর্ডের কাছে না হয়ে, অন্যত্র হয়।

কিংসফোর্ড দুঁদে বিচারক। বিশেষ করে হিন্দু রাজদ্রোহীর ওপর হাড়ে চটা। কিন্তু জজ ক্যাস্‌পার্‌স সে আবেদন অগ্রাহ্য করে দিলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর। সরকার পক্ষের কৌঁসিলী হিউম সাহেব

মোকদ্দমার বিবরণ বলতে ওঠার আগেই চিত্তরঞ্জন আদালতে পেশ করলেন ব্রহ্মবান্ধবের এজাহার।

"কথিত প্রবন্ধটি এবং কাগজখানির সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। কিন্তু আমি এই বিচারে কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। কারণ ভগবৎ-নির্দিষ্ট স্বরাজ সাধনায় সামান্য কর্তব্য সম্পাদন করিতে, যাহাদের স্বার্থ আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী, এম্ববিধ কোন বৈদেশিক জাতির নিকটে আমি দায়ী নহি।"

খড়্গের মতো ধারালো উচ্চারণ। কিন্তু বিচারকও খড়্গহস্ত। সুতরাং বিচারপর্ব চলতে লাগল।

চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে উপাধ্যায় যান পরামর্শ নিতে। চিত্তরঞ্জনের ভাষায় "উপাধ্যায় আমার বাড়িতে আসিয়া মোকদ্দমা বুঝাইতে বুঝাইতে অধিক রাত্রিতে আর গৃহে ফিরিয়া যাইত না, আমার বাড়িতেই বিছানা থাকা সত্বেও ভূমিশয্যায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিত।"

উপাধ্যায় দীর্ঘকালের হার্নিয়া রোগী। বিলেতে যখন বেদান্ত-প্রচারক, তখন থেকে। লণ্ডনের অনেক নামজাদা ডাক্তাররা দিয়েছিল সুচিকিৎসার পরামর্শ। উপাধ্যায় উদাসীন।

দেখ, বিদেশে আছি। আমার ইচ্ছে নয় যে, আমি তোমাদের অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকি। যদি মরি, আমার দেহ কেন মিশবে এদেশের মাটিতে?

সেই অসুখ নিয়েই কাঠগড়ার আসামী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ঠায়ে দাঁড়িয়ে কাটে। কেউ দয়াপরবশ হয়ে চেয়ারের কথা তুলতে গেলে অগ্নিশর্মা।

কখনোই না। আমি তো চোর, ডাকাত, খুনের আসামী নই। আমি ফিরিঙ্গীর কাছে ভিক্ষা চাইবো? কিংসফোর্ড সাহেব যদি ভদ্রলোক হয়, অযাচিতভাবেই তার উচিত আমাকে আসন এগিয়ে দেওয়া।

সাতদিন দাঁড়িয়ে কাটানোর ফলে অসুখ বাড়তে বাড়তে এমন বিড়ম্বনাময় হয়ে উঠল যে, অস্ত্রোপচার ছাড়া আর গতি নেই। ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ শহরের সেরা ডাক্তার ভার নিলেন তাঁর চিকিৎসার। ভর্তি করা হল ক্যাম্বেল হাসপাতালে। হাসপাতাল হয়ে উঠল তীর্থ। দলে দলে আসে বন্ধু-বান্ধব। আসে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল মিষ্টি। শেষ পর্যন্ত সে সব বিতরণ করা হয় হাসপাতালের দরিদ্র রোগীদের।

এই সময়ে আবার পড়ল বিচারের ডাক। সারদাচরণ আদালতে দাখিল করলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট। আসামী অসুস্থ।

সরকার পক্ষের সেয়ানা উকীল জানালে—তা হয় না। সামান্য একটা সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিচার বন্ধ করা যায় না। ডাক্তারের নিজে এসে জানানো উচিত ছিল যে আসামী অসুস্থ।

শেষ পর্যন্ত আদালতে চিঠি গেল ক্যাম্বেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর কাছে। কবে নাগাদ আসামী সুস্থ হতে পারে?

কদিন যেতে না যেতেই সন্ধ্যা আপিসে আবার খানাতল্লাসী। পুলিস এবারে এসে চাইলে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধগুলোর হস্তলিপি। সারদাচরণ গ্রেপ্তার হলেন আবার। জামিন অগ্রাহ্য। পরিণামে জেল। হাসপাতালে উপাধ্যায় অধীর হয়ে উঠলেন সারদাচরণের দুঃখে।

ওদিকে হাসপাতালে জেরা চলেছে রোজ। চিত্তরঞ্জন ক্লান্ত। একদিন জেরা করছেন সরকার পক্ষের অনুবাদক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের। সেদিন সকাল থেকে তাঁর খাওয়া হয় নি। শরীর অসুস্থ। কিন্তু দেখা গেল, চারটে বাজে, তবু কিংসফোর্ড টিফিনের ছুটি তো দিলেনই না, উল্টে চারটের পরও টেবিল আঁকড়ে কাজ করে যেতে লাগলেন। চিত্তরঞ্জন জানালেন—আজকের জেরা এই-খানেই বন্ধ থাক্। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড মেজাজ দেখিয়ে বললেন—"No argument, not a single word do I like to hear

from you. You must go on with the case." নির্ভয়চিত্ত চিত্তরঞ্জনও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এই আদালতে আর তিনি ঢুকবেন না। উপাধ্যায়কে জানালেন, আপনাকে জেলে যেতেই হবে।

উপাধ্যায় বললেন,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ফিরিঙ্গীর সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়।

তাই হল। কদিন পরেই হয়েছিল তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার। সেই মুহূর্তের মূর্ছাগত অবস্থা থেকেই ঘনিয়ে এল চিরনিদ্রা।

অনেকে মনে করলেন তেজস্বী ব্রাহ্মণের এ যেন ইচ্ছা মৃত্যু।

অরবিন্দ বন্দেমাতরমে লিখলেন—"The great Upadhaya mystically borne away from us on the wings of a kindly death."

ব্রহ্মবান্ধবের জীবনীকার প্রবোধ সিংহের বিবরণে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী মুহূর্তের মর্মস্পর্শী চিত্রমালা—

"চারিদিক হইতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, যুবক, বৃদ্ধ দলে দলে তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য হাসপাতালের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। তাঁহার সম্মানের জন্য অনেক দোকান-পাট বন্ধ হইল। হাসপাতালের কর্তারা শবদেহ সেখানে বহুক্ষণ রাখিতে দিলেন না। অগত্যা একটার সময় তাড়াতাড়ি তাঁহার শবদেহ বহন করিয়া বাহিরে আনা হইল। পথের ধারে গাছের তলায় শব রাখিয়া, সেই তীব্র রৌদ্রে অন্য সকল বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। বেলা ২টার সময় তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাঁহার সাধের সন্ধ্যা অফিসে মৃতদেহ লইয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে ঠন্‌ঠনিয়ার কালীবাড়ির সম্মুখে সে দেহ রক্ষা করিয়া মায়ের নির্মাল্য ও চরণামৃত গ্রহণ করা হইল। আর একবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া ব্রাহ্ম নরনারীদের শোকাশ্রুর পুষ্পাঞ্জলী লইয়া

সকলে সন্ধ্যা অফিসে আসিলেন। তখনই কয়েকজন লোকনায়ক একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—বেলা চারিটার সময় সন্ধ্যা অফিস হইতে একটি শোভাযাত্রা করিয়া মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে চারি পাঁচ সহস্র লোক আসিয়া সমবেত হইল। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য এত লোক উপস্থিত হইল যে, ইতঃপূর্বে আর কাহারও মৃতদেহের অনুগমনে এত অধিক লোক সমাগত হয় নাই। এখান হইতে কয়েকখানি ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিবার পর মৃতদেহ নানাপ্রকার পুষ্পপত্র প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ঠিক চারিটার সময় সকলে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শোভাযাত্রা শিবনারায়ণ দাসের লেন সন্ধ্যা অফিস হইতে বাহির হইয়া কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, বিডন স্ট্রীট এবং নিমতলা স্ট্রীট দিয়া গমন করিয়া শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইল।···সর্বাগ্রে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক বন্দেমাতরম্ সংগীত গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন; তৎপশ্চাতে কতকগুলি স্বদেশ-প্রাণ যুবক উপাধ্যায়-মহাশয়ের মৃতদেহ বহণ করিয়া লইয়া চলিলেন। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় শোভাযাত্রা শ্মশানঘাটে উপনীত হইল। মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ও হরিবোল ধ্বনিতে শ্মশানভূমি বিকম্পিত হইতে লাগিল।

সভাস্থলে কতকগুলি সুমধুর জাতীয় সংগীত গীত হইল। শ্রদ্ধা-ভাজন স্বদেশ-হিতৈষী ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পত্নী, উপাধ্যায় মহাশয়ের পদধুলি গ্রহণ করিবার জন্য শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুন্দরীবাবুর পত্নী যখন উপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন, তখন শ্মশানক্ষেত্রে যে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা বর্ণনাতীত।···

কয়েকটি সুন্দর জাতীয় সংগীত গীত হইলে পর বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায় উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে

কয়েকটি কথা বলিলেন—"শ্যামসুন্দরবাবু (চক্রবর্তী) উপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে এত অধিক আঘাত পাইয়াছিলেন যে বেশী কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন না। শ্যামসুন্দরবাবু বলিবার পর উপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মুখে অগ্নিপ্রদান করিলেন। ভক্তগণ কলসে কলসে ঘৃত ও রাশি রাশি চন্দনকাষ্ঠ, ধূপ-ধুনা চিতানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনুকূল পবনে চিতা ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গগনস্পর্শী অনলশিখার মধ্যে যখন সে দেহ জ্বলিতে লাগিল, যখন চারিদিকে শোকবিদ্ধ হৃদয়ের জাতীয় সংগীতের রোল দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, তখন শ্মশানে বৈরাগ্যের তীব্র অনলে সকলের প্রাণ যেন জ্বলিয়া উঠিল। সকলে উদাস নয়নে সে অগ্নিসংযুক্ত তনুর পরিণাম করিতে লাগিল। সেই চিতার উপরে উপাধ্যায়ের হৃদয়শোনিত পুষ্ট কয়েকখানি 'সন্ধ্যা ও 'করালী' অর্পিত হইল।

যে সুন্দর তনু শ্যামনগর ও ভাটপাড়ার বাগানে ও জঙ্গলে, চুঁচুড়ার ভাগীরথী বক্ষে, গোয়ালিয়রের দুর্গে, রাজপুতনার মরুভূমি প্রদেশে, হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যে, অক্সফোর্ডের দার্শনিক সভায় কলিকাতার বিডন-উদ্যানে, এলবার্ট হলে এবং ভারতের নানাস্থানে নানা কার্যে এতদিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিত, আজ তাহা শ্মশানে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল।"

আইন-আদালত, পুলিসী হামলা, কারাবরণ-নির্বাসন শেষ পর্যন্ত মৃত্যুশোক, সব মিলিয়ে উত্তেজনার যেন একটা ঝঞ্ঝাঘাত বয়ে গেল কলকাতার উপর দিয়ে। যাদের রক্তের রং কিছুটা ফিকে, পেশীটা কমজোরী, পাঁজরে ঘুণ, তাদের অনেকে সেদিন হয়তো আশা কিংবা আশঙ্কা করেছিল এরপর ভস্মসাৎ হবে চরমপন্থীদের আন্দোলন। উপাধ্যায় স্বর্গত। অরবিন্দের মাথায় ঝুলছে বিচারের খাঁড়া। তিনটে শিরদাঁড়াই তো ভাঙা। চড়া সুরে শিকল ভাঙার গান গাইবে কে?

এবার বন্ধ হয়ে যাবে বন্দেমারম্। যুগান্তর জব্দ। সন্ধ্যা তো নিভন্ত। তাহলে আবার ফিরে চলো নরমপন্থীদের নিরুপদ্রব আবেদন-নীতির নির্ঝঞ্ঝাট আসরে। মেঘ ডেকেছিল। ফণা তুলেছিল কালবৈশাখী। কিন্তু সব থেমে যাচ্ছে। এবার নামবে স্নিগ্ধ, শীতল বারিধারা।

কিন্তু হায়, তেমন ধারা যে ঘটল না কিছুই। যা ঘটল, তা কারুর ধারণাতেই আসে নি।

যুগান্তর তেমনি বেরোতে লাগল। কোথাও এতটুকু ভয়-পেয়েছির আভাষ পর্যন্ত নেই। যেমন ছিল, তেমনি একরোখা, বেপরোয়া, ডানপিটে।

কদিন যেতে না যেতেই ছেপে বেরুল 'মিথ্যার পূজা'। অন্ত-রালের লেখক অরবিন্দ।

"ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গী সরকার ভাবিয়াছিল এই-বার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল। মরিল না বটেই; অধিকন্তু আবার ভবিষ্যতে যে মরিবে তাহার আশা পর্যন্ত দিল না। ইহাতে সরকারের তো রাগ হইবারই কথা!

ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউজ 'হা হুতাশ' করিয়া শেষে আশা দিল—'ভয় নাই; ছোটলাট আবার যুগান্তর সম্পাদককে জেলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।' ছোটলাট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি যুগান্তরের কতগুলো সম্পাদক আছে একবার দেখিয়া লইবেন।

যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে? যুগান্তর তো জাতীয় ভাব-সমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণামাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাক্কা লাগে। সম্পাদক তো তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী তো ধরা পড়ে না; যন্ত্রী যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা

লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পরতলে আত্ম-বলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক—তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক। গর্বস্ফিত অন্ধ! তাহাদের সংখ্যা জানিতে চাও? একদিন জানিবে। তাহাদের সকলকে কারাগারে পুরিতে পার এত বড় কারাগার তো আজও তোমরা গাঁথিয়া তুলিতে পার নাই।

আপনাকে আপনি যে গোলাম না সাজায়, তাহাকে গোলাম সাজাইতে পারে এতবড় বীর ত্রিভুবনে কেহ নাই। তুমি আমায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করাইবে; আমি যদি 'ও দুঃখ নয় মা, দয়া তোমার' বলিয়া সহাস্য মুখে কারাগৃহে প্রবেশ করি—তবেই তো তোমার দমনের চেষ্টা ব্যর্থ! তুমি আমায় ফাঁসীকাঠে ঝুলাইবে? আমি মরিবার সময়েও ক্ষমতা তুচ্ছ করিয়া মরিব। এক দিকে মাতৃমন্ত্র, অপরদিকে ইংরেজের পরাধীনতা স্বীকার করাইতে চাও! মোগল সম্রাট যখন একদিন তোমাদেরই মতো মদগর্বে অন্ধ হইয়া শিখগুরুকে ধর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তখন শিখগুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন, ধর্ম দেন নাই। আমরাও তাহাই করিব। ভারতে আবার ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। মোগল সিংহাসন যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিল, তোমার পলাশীতে কুড়ানো সিংহাসনও সেখানে ভাসিয়া যাইবে। আমরা রাখি বলিয়া তোমরা আছ, বাঁচাই বলিয়া তোমরা বাঁচ। আমরা তোমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিই বলিয়াই তোমরা আমাদের অনশনক্লিষ্ট করিতে পার; আমরা নির্জীব সাজিয়া থাকি বলিয়াই তোমরা আমাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহসী হও; আমরা তোমাদের মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই তোমরা সত্যই মাথার মণি; যে-দিন নিষ্ঠীবনের মতো তোমাদের ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিব—সেদিন তোমরা নিষ্ঠীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহ। আমরা ভ্রান্তির ঘোরে মিথ্যার পূজায় প্রবৃত্ত বলিয়াই মিথ্যা আজ সত্যের

আসনে বসিতে সাহস পাইয়াছ। পরমহংসদেব বলিতেন—মায়াকে মায়া বলিয়া চিনিলে মায়া পলাইয়া যায়। যেদিন আমরা বুঝিব যে আমরা কতকগুলো অন্নদাস, ভবঘুরেকে ধরিয়া স্বহস্তে তাহাদের কপালে রাজটিকা পরাইয়া দিয়াছি, সেদিন বুঝিব আমরা বাস্তবিক কানা নহি, শুধু স্বেচ্ছায় চোখ বুঝিয়া অন্ধকার দেখিতেছি মাত্র, যেদিন বুঝিব আমরা দূর্বল নহি, শুধু আলস্যের ঘোরে অজ্ঞানের ঘোরে পড়িয়া আছি মাত্র—সেইদিন আমাদের দুর্দশার নিবৃত্তি। সেদিন আর আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত নহি বলিয়া জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইতে ছুটিব না। অনন্ত শক্তির আধারভূতা, রন্ধ্রে রন্ধ্রে চৈতন্যময়ী আমাদের জননী, আমরা আবার কাহার দাস?

প্রতিজ্ঞা কর দেখি আর মিথ্যার সংস্পর্শে আসিব না, ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ জাদুগৃহে পাণ্ডিত্যের তক্‌মা পাইয়া ভেড়া বনিয়া থাকিব না, ছোটলাট বড়লাট বাহির হইলে অভিনন্দন পত্র লইয়া চিরদাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য তাহাদের পিছু পিছু ছুটিব না—; তখন মায়ের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবে, দেখিবে মা চির-স্বাধীনা। একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া মায়ের অভয়পদ দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে ইংরাজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার মায়াপুরী।—"

যুগান্তর চায় জাতির রূপান্তর। বৃহন্নলার ছদ্মবেশ খুলে বেরিয়ে আসুক সব্যসাচী অর্জুন। পিষ্ট-পতিত-পরাভূতের হাতে ঝলসে উঠুক প্রখর প্রহরণ।

যুগান্তরের ডাক গিয়ে পৌঁছলো দেশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। তাদের মধ্যে প্রচার করতে হবে স্বাধীনতার মন্ত্র, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে এবার দিন এসেছে বিদ্রোহের, বিপ্লবের।

যুগন্তরের পাতায় কবিতার ছন্দে একদিন ফুটে বেরুল তার সুস্পষ্ট 'রণনীতি'।

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে
গাও উচ্চে রণ জয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে
শুন ঐ ডাকে ভারত মাতা॥
কে বল করিবে প্রাণে মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন শুন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালী।
জয় মা ভারত জয় মা কালী॥
সাজে শয়ন কি হীন-বিলাসে শত্রু বিদগ্ধ যখন পুরপল্লী।
ইংরাজ চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে
প্রেয়সীর ভুজ বল্লী॥
কোষ নিবদ্ধ রবে খর অসি
যখন বিলাঞ্ছিত ভারতবাসী।
(সাজ সাজ সকলে রণ ইত্যাদি)
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠ
শত্রু করে কভু হ'ব না বন্দী
ডরি না থাকে যা'ই অদৃষ্টে
অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি
রব না রব না ফিরিঙ্গী ভৃত্য
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু
(সাজ সাজ সকলে ইত্যাদি)
ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে
শত্রু সেনাদল করিব বিভিন্ন
পুণ্য সনাতন আর্যাবর্তে
রাখিব না কভু অরাতি চিহ্ন

শত্রু রক্তে করিব স্নান
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
(সাজ সাজ সকলে ইত্যাদি)

সময়টা যেন টগবগিয়ে ছুটে চলেছে বুনো ঘোড়ার পিঠে চেপে। যত শেষ হয়, ততই যেন উত্তাল হয়ে ওঠে উনিশ শো সাত।

'যুগান্তর'-এর উপর ক্রমাগত চলেছে পুলিসী জুলুম। আজ এসে নিয়ে গেল ছাপানো ফর্মা। কাল ৪-৫ মণ টাইপ, ব্লক। পরশু এজেন্ট আর গ্রাহকদের খাতা, চাঁদার বই।

এদিকে পাশ করা হয়েছে News paper Act, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোর দাঁত ভেঙে বোবা বানাবার জন্যে।

ওদিকে পাশ হয়েছে Seditious Meetig Bill, দমন করতে হবে সরকার-বিরোধী সভা-সমিতি।

অরবিন্দ চেয়েছিলেন—'আরো অত্যাচার'।

Wanted more repression,

সরকার তার যোগ্য উত্তর যুগিয়ে চলেছেন।

১৯০৭। ২১শে অক্টোবর।

ভারতসচিব মিঃ মর্লি আরব্রোথে এক বক্তৃতা দিলেন। বিষয়, ভারতবর্ষের সমস্যা। ভারতবর্ষে চরমপন্থীরা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। মিঃ মর্লি বললেন—ওতো আকাশের চাঁদ। আমার হাতে নেই। আর থাকলেও দেবো না। "I have, got no moon, and if I had, I would not give them the moon." ভারতবর্ষ আর কি চায়?

অন্ততপক্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন। এটা নরমপন্থীদের দাবী। কিন্তু ভারতবর্ষতো কানাডা নয়। কানাডা শীতের দেশ। সেখানে 'ফার' কোট শোভা পায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে 'ফার' কোট অসহ্য।

এ ছাড়া মাঝে মাঝে ভারতবাসীরা বলে থাকে Quit India.

ইংরেজদের পক্ষে এটা একেবারেই অসম্ভব। ভারতবাসীদের ব্যাপারে ইংরেজদের একটা গভীর দায়িত্ব আছে। আজ যদি ইংরেজেরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসে, কালই সেখানে শুরু হয়ে যাবে মারামারি, কাটাকাটি। ঘরে ঘরে বেজে উঠবে করুণ কান্না। সুতরাং ইংরেজজাতির বিবেক এটা অনুমোদন করতে পারে না।

চরমপন্থীরা আর একটা জিনিষ চেয়েছেন। More repression. আরো অত্যাচার। এটা কিন্তু আমরা অনায়াসে মঞ্জুর করতে পারি। "The Government have been obliged to take measures of repression, they may be obliged to take more."

তাঁর আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় অরবিন্দ হয়তো খুশী। কিন্তু নরমপন্থীরা গুনলেন প্রমাদ। এইভাবে যদি সভা-সমিতি সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, দেশের জাগ্রত তরুণ প্রাণগুলি ঝুঁকবে সন্ত্রাসবাদের দিকে। সুতরাং 'মোর রিপ্রেশন' তো চরমপন্থীদের কাছে শাপে বর।

অরবিন্দের মাথায় বিচারের খাঁড়া ঝুলছে। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সরকার পক্ষে হিসেবী মাথাগুলো। তবু কিছুতেই প্রমাণ করতে পারছে না যে অরবিন্দই 'বন্দেমাতরম্'-এর আসল মাথা। কিছুতেই পারছে না 'বন্দেমাতরম্'-এর অগ্নিস্রাবী লেখাগুলোকে টুঁটি টিপে মারতে।

শেষ পর্যন্ত অরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

যুগান্তর-এর আড্ডা ছিল চাঁপাতলায়। একদিন হঠাৎ সেটা চলে গেল মুরারীপুকুরে। সেখানে কি ?

সেইখানেই অগ্নিযুগের নব-উদ্বোধন।

আর কথা নয়। কাজ। সরাসরি সংগ্রাম। "Battle for the Motherland." ২৮শে নভেম্বর। একদল নতুন উৎসাহী-

উদ্যোগী যুবকগোষ্ঠীর হাতে 'যুগান্তর' কাগজের যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দিয়ে বারীন্দ্র চললেন মুরারীপুকুরের বাগানে। আর অপেক্ষা নয়। আর শক্তিক্ষয় নয়। এবার নেমে পড়তে হবে আমরণ-রণে।

'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় সেই সময়ের ছবি ফুটিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ। "এই সময় হইতে দেশে রাজদ্রোহের মামলার ধুম লাগিয়া গেল। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই যুগান্তরের উপর আবার মামলা সুরু হইল এবং যুগান্তরের প্রিণ্টার বসন্তকুমারকে জেলে যাইতে হইল।

একে একে এরূপ অনেকগুলি ছেলে জেলে যাইতে লাগিল। তখন বারীন্দ্র বলিল, এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে ধরাশায়ী করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। এই সংকল্প হইতেই মানিকতলার বাগানের সৃষ্টি।

মানিকতলায় বারীন্দ্রের একটা বাগান ছিল। স্থির হইল যে, একটা নূতন দলের উপর যুগান্তরের ভার দিয়া যুগান্তর অফিসের জনকতক বাছাই ছেলে লইয়া ঐ বাগানে একটা নূতন আড্ডা গড়িতে হইবে।

মানিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল তখন সেখানে চার-পাঁচজনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই···ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ২০ জন ছেলে আসিয়া জুটিল।···বাগানের কাজকর্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম।··· প্রথমেই গিয়া এলাহাবাদে একটা প্রকাণ্ড ধর্মশালায় দুই চারিদিন পড়িয়া রহিলাম।···প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়া এক ধর্ম-শালায় কিছুদিন পড়িয়া রহিলাম।···বারিনের চিঠি আসিল-'শীঘ্র

ফিরিয়া এসো।...বারীনের চিঠি পাইয়াই তল্পি-তল্পা গুছাইয়া রওনা হইলাম। বাগানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম একেবারে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। যে সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে, উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে একজন।...সে-সময়ে কিংসফোর্ড সাহেব একে একে সব স্বদেশী কাগজওয়ালাদের জেলে পুরিতেছেন। পুলিসের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—'না, এ আর চলে না। ক' বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।'

তথাস্তু।"

সেদিন ছিল বিপিন পালের বিচারের দিন। আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। পুলিস সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত লাঠি চালাতে লাগল। মাত্র ১৪ বছরের ছেলে সুশীল সেন। তার পিঠে পড়ল লাঠির মার। কিল খেয়ে কিল হজম না করে সুশীল পুলিস ইন্‌সপেক্টার হেনরী সাহেবের মুখে বসিয়ে দিলে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা সটান ঘুষি। হেনরীর হেনস্থা। অবশেষে সেই ক্ষমাহীন অপরাধের বিচার বসল দয়াহীন বিচারক কিংসফোর্ডের দরবারে। শাস্তি ১৫ ঘা নির্মম বেত্রাঘাত। তাতে যদি কোমল চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরে, ঝরুক।

মার খাওয়ার পর সেই সুশীল গেল কোথায়? তাকে দেখা গেল মুরারীপুকুরে।

হেমচন্দ্র কানুনগো কয়েকটা তাজা ছেলে চায়। তাদের হাতে তুলে দেবে তাজা বোমা। শয়তান শাসকদের কি ভাবে হত্যা করতে হয়, শেখাবে হাতে-কলমে।

বারীন্দ্র বললেন,—এই নাও, এক সুযোগ্য সৈনিক। সুশীল সেন।

হত্যা করবে কাকে?

কিংসফোর্ডকে।

কার নির্দেশ ?

বারীন্দ্র-র নিজের ভাষায়—সেজদা (অরবিন্দ), রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারুচন্দ্র দত্ত এই তিনজনে কিংসফোর্ড বধের আদেশ দিয়েছিলেন।

রিভলভার তো নয়, যেন হাতে স্বর্গ পেল সুশীল। স্বর্গাদপি গরীয়সীর জন্যে প্রাণ দিতে হবে, এতো পুণ্য ব্রত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বদল ঘটল হত্যাকারীর। সুশীলের বদলে নির্বাচিত হয়েছিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী।

সে কাহিনী আরও পরের। ১৯০৮-এর।

১৯০৭ শেষ হতে চলেছে।

আগস্ট মাসে নিবেদিতা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেছেন ইংল্যাণ্ডে।

১৯০৭-এর একেবারে শেষে, ডিসেম্বরে, সুরাট কংগ্রেস। তার আগে মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন। অরবিন্দ মেদিনীপুর সম্মেলনে বসে খড়সা করছেন সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীদের কর্মসূচী।

বারীন্দ্রও মেদিনীপুরে। তাঁর হাতে ফ্রেজার-বধের পরিকল্পনা।

হেমচন্দ্র লিখেছেন—"কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার লাট ফ্রেজার সাহেবের বাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল—আমারই বাড়ির কাছে। তাই বম্বেতে এই খবর পেয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলাম। মেদিনীপুরের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ শুনলাম। বারীনের এও একটা honest attempt. 'রণনীতি'র ধারা অনুযায়ী জান্রেলের নাকি রণক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘটনাস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ ; তাই বুঝি বারীন খড়্গাপুর থেকে শ্রীমান বিভূতিকে খড়্গাপুরের প্রায় দশ কি বার মাইল দূরে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত একটা নির্জন স্থানে রেল লাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল। লাট সাহেবের গাড়িটা নাকি জখম হয়েছিল। যাই

হোক, এই অপরাধের অপরাধীকে ধরে দিতে পারলে সরকার থেকে এক হাজার আর বি. এন. রেল কোম্পানী থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।”

বোমা ফেটেছিল। ফ্রেজার মরে নি। বেঁকে গিয়েছিল রেলের লাইন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই থেকে আবেদন-নিবেদনের সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা লাইনে চলার গতিবেগ বাড়তে শুরু করল।

এবার সুরাট কংগ্রেস। নরমপন্থী, চরমপন্থী দুদলই প্রস্তুত যে-যার কব্জির জোর দেখাতে।

কলকাতা ছেড়ে সুরাট যাত্রার আগেই দু-দলে সংঘাত। নরমপন্থীরা জানালে এবারের কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ। চরমপন্থীরা তা মানতে রাজী নয়। আগে ঠিক করা ছিল তিলকের নাম। কিন্তু সেই সময়েই নির্বাসন দণ্ড থেকে সদ্য মুক্তিলাভ করেছেন লালা লাজপত রায়। অরবিন্দ প্রমুখ প্রস্তাব করলেন তাঁর নাম।

লাজপৎ দেখলেন নিজেদের মধ্যেই ভেদ-বিভেদ। তিনি জানালেন, সভাপতি হতে আমি নারাজ।

২১শে ডিসেম্বর অরবিন্দ পা বাড়ালেন সুরাটের পথে। এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রের বর্ণনা।

“আমি অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর বাবুর সহিত সুরাট যাত্রা করিলাম। বোম্বে মেল খড়্গপুরে আসিয়া থামিল। এমন সময় অরবিন্দ তাঁহার গাড়ীতে আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, গিয়া দেখি সেটাও তৃতীয় শ্রেণী, ভিতরে নরক গুলজার। প্রতি স্টেশনে ফুলের মালা, লুচি-মণ্ডা-মেঠাই ও চা! অনেক স্টেশনে বহুলোক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, অরবিন্দের সাক্ষাৎ প্রাণ ভরিয়া বড় একটা কেহই পায় নাই। কারণ সবারই ধারণা ছিল যে, দেশের একটা এতবড় গন্যমান্য মানুষ নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীতেই, অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিতেছেন। কাজেই প্রথম শ্রেণী হইতে খুঁজিতে

খুঁজিতে এই ক্ষীণজীবি নিরীহ মানুষটিকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে করিতে এদিকে ট্রেন আবার ছাড়িবার সময় হইয়া যায়। আমাদের তো রাত্রে নিদ্রা নাই. পেটে স্থান নাই, সেজদার গলার মালায় গাড়ী বোঝাই।……বোধহয় নাগপুর আর অমরাবতীতে কয়েকঘন্টার জন্য নামিতে হইয়াছিল। সেখানে অরবিন্দের বক্তৃতা হইল. কিন্তু বক্তৃতাস্থানে লোকসমুদ্র ঠেলিয়া যায় কাহার সাধ্য।…সেজদাকে ধরিয়া যেখানে বসাইয়া দেয়, নীরব মানুষটি সেখানেই বসিয়া থাকেন, আর সবাই নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। অতবড় জনসঙ্ঘে তাঁর বক্তৃতা বড় বেশী দূর শোনা যায় না, তবুও সহস্র সহস্র মানুষ ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।… তাহার পর সুরাট। সে এক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড! নবজাগ্রত ভারতের সেসকল স্বপ্নচ্ছবি ভুলিবার নয়।"

স্টেশনের কাছেই তাঁবু। সাহেবী ঢঙে সাজানো। আরামের যাবতীয় উপকরণে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে সব তাঁবুতে চরমপন্থীদের ঠাঁই নেই। তাঁদের জন্যে একটা সেকেলে ভাঙা দেবমন্দির। সেখানেই তিলক ও অরবিন্দদের আশ্রয়। বারীন্দ্রের ভাষায়—

"সেখানে তিলক ও অরবিন্দ বসিয়া আপনাদের কাজকর্ম করেন। আর সহস্র সহস্র জনস্রোত সকাল হইতে রাত একটা অবধি, এক সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া শুধু দর্শন করিয়া অপর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়। একদিন আহারে বসিতে গিয়া দেখিলাম, তিলকের পাশে এক পঙ্‌তিতে বসিয়াছেন চিদম্বরম্ পিলে, হায়দর রেজা, অরবিন্দ আরও কে। ভারতের এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার হিন্দু-মুসলমান সে পঙ্‌তিতে নাই।…অরবিন্দ, তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জি প্রভৃতি নেতাদের ভিতরে ভিতরে কী পরামর্শ হইত আমি জানিতাম না, কারণ আমি থাকিতাম আপনার তালে।…আমাদের গুপ্তচক্র বসাইবার সব বন্দোবস্তই করিয়া তুলিলাম।"

অধিবেশন শুরু হবার আগে চরমপন্থীরা সভা ডেকে জানিয়ে

দিলে যে যদি কলকাতা-কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির প্রতি এবারের কংগ্রেস সমর্থনা জানায়, তাহলে তারা সভাপতি নির্বাচনে বাধা দেবে।

লাজপৎ রায় এসে দু-দলে একটা মিটমাটের চেষ্টা করলেন। হল না। অধিবেশন শুরু হল। প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে পড়ল বাধা। সভাপতি ত্রিভুবন দাস মালবী ভাষণ দিতে উঠে সাত কাহণ পেড়ে বসলেন। আজ যেখানে কংগ্রেসের মঞ্চ তৈরী হয়েছে, এই মাটিতেই একদিন ছিল মোগল, মারাঠা ও ফরাসীদের কুঠি, ফ্যাক্টরী। মোগল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর থেকে এই প্রাচীন শহরে ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকেরা কিভাবে ক্রমাগত ব্যবসা বানিজ্য বিস্তার করে জাঁকিয়ে উঠেছিল তারই লম্বা-চওড়া ইতিহাস।

শ্রোতারা অতসব ধান ভানতে শিবের গীত শুনতে ইচ্ছুক নয়। তারা বাধা দিতে লাগল। বিদেশী সাংবাদিক নেভিনসন উপস্থিত ছিলেন সেদিনকার সভায়। তাঁর মত—People do not want to hear history when they are making it.

তারপর সভাপতি নির্বাচন। সুরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন প্রস্তাবক হিসেবে। সবেমাত্র তিনি রাসবিহারী ঘোষের নামটুকু উচ্চারণ করেছেন, পড়ল মৌচাকে ঢিল। জাতীয়তাবাদী দলের লোকেরা উঠল চেঁচিয়ে—Remember Midnapur, Remember Nagpur. তখনকার মত সভাপতি ত্রিভুবন দাস ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছেন গোলমাল থামানোর জন্যে। কাকস্য পরিবেদনা! কে শোনে কার কথা। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হল সেখানেই।

পরের দিন আবার যথাসময়ে সবাই হাজির। অধিবেশন শুরু হল। মডারেটরা ধরেই নিয়েছে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেছেন। সুতরাং রাসবিহারী ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন

মঞ্চে। বলতে শুরু করলেন—Brother delegates, ladies and gentelmen. ব্যাস, ঐ পর্যন্ত, আর বলতে হোলনা। তিলক মঞ্চে এগিয়ে এলেন কিছু বলার জন্যে। মালবী উঠলেন চীৎকার করে—

"You cannot move an adjournment of the Congress."

তিলক উঠলেন চীৎকার করে—

"I declare you out of order. I wish to move an amendment to the election of President, and you are not in the chair."

চীৎকার করে উঠলেন রাসবিহারী ঘোষ—

"I declare you out of order."

উত্তর দিলেন তিলক—

"You have not been elected. I appeal to the delegates."

তারপরেই তাণ্ডব।

একজন গুজরাটী ডেলিগেট চেয়ার তুলে ছুটে এল তিলককে আঘাত করতে। ওদিক থেকে ছুটে এল একটা মারাঠী চটি। সুরেন্দ্রনাথের ঘাড়ের উপর পড়ে সেটা আছড়ে পড়ল ফিরোজ শা মেহতার গায়ে। অরবিন্দের ইঙ্গিতে মারাঠী ডেলিগেটরা চড়াও হল মঞ্চের উপর। প্রাণভয়ে নেতারা একে একে প্রস্থান করলেন মঞ্চ ছেড়ে সুরাট কংগ্রেস পালার এখানেই ইতি।

কংগ্রেস ভাঙল। কিন্তু সুরাটে দুপক্ষই আলাদা করে সভা করলে। লাজপৎ রায় যোগ দিলেন নরমপন্থীদের সভায়।

ওদিকে বারীন্দ্র তখন সুরাটে থেকে আয়োজন করছিলেন একটা গুপ্তচক্রের। শেষপর্যন্ত সেটাও ব্যর্থ হল। তাঁর নিজের ভাষায়—

"ইত্যবসরে আমি অনুরোধ-উপরোধ করিয়া কয়েকজন মারাঠী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বাঙালী বিপ্লবপন্থী নেতাকে একটি গুপ্তচক্রে

আহ্বান করিলাম। ···তিলককেও ডাকিয়াছিলাম, তিনি এ-দলের নন বলিয়া আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন : আমি বুড়া হইয়াছি, আমি চিরদিন আমার কর্মের বাঁধা-সড়কেই চলি, তোমরা তরুণেরা যাহা পার কর। তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, দুই চারিটা পাগল জুটিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। সর্দার অজিত সিং-ও আসিলেন না; শুনিলাম পাঞ্জাবের যে একজন মুসলমান নেতাকে আমি ভ্রমক্রমে ডাকিয়াছি তিনি নাকি গোয়েন্দা।

গুটি কয়েক বাঙ্গালী, গুটি কয়েক মারাঠী, ও সেই পাঞ্জাবী দু-মুখো সর্পকে লইয়া অগত্যা একটা যা-হোক গতিকের চক্র বসিল। কথায়-বার্তায় বুঝিলাম মারাঠীরা বাক্যেই কাজ সারেন ও অতিমাত্র সাবধানী চালে চলিতে গিয়া তাঁহাদের চলাটাই থাকিয়া যায় উহ্য, সাবধানতা জুড়িয়া বসে প্রায় সবখানি আসর। অগত্যা ভারত-ব্যাপী বিপ্লবের স্বপ্ন মনে মনে ধামা চাপা দিয়া সে রাত্রের মতো উঠিয়া পড়িলাম। মনে মনে বলিলাম—কুছ পরোয়া নেই, ও মন একলা চলো রে।”

সুরাট কংগ্রেস ব্যর্থ হল, জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি পর্বে এসে। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখলেন—

“এবারকার কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই। তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুইদলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত রহিয়াছে। ···এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিনপক্ষ দাঁড়াইয়াছে। চরমপন্থী, নরমপন্থী, এবং মুসলমান—তৃতীয় পক্ষটি গভর্নমেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য অন্য কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয়, কিচেনারেরও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব।”

সুরাট কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল ১৯০৭। বুঝি বা শেষ

হল মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা-ফাটানো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দিন। বাজল দিন বদলের দামামা। বইল নতুন ঝোড়ো যুগের হাওয়া।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলন, সেই স্বদেশী আন্দোলনেরই গোত্রান্তর ঘটা শুরু হল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।



॥ ফুলারের ফণায় নীল বিষ ॥



হিন্দু অ্যাজিটেটার নন। খাস ইংরেজ। পদস্থ রাজকর্মচারী। গোড়ার দিকে তিনিও ছিলেন আন্দোলনের পক্ষে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধাচারী।

কিন্তু কৃতকার্যতার সিংহাসনই যাদের কাছে চরম মোক্ষ, সত্যের সম্মান তাদের কাছে মূল্যহীন। মিথ্যায় যদি মিষ্টি মোয়া মেলে, সত্যকে নিম পাতার মতো তেতো বলতে তাঁদের এক পলক দেরি হবার কথা নয়। মুখ থেকে মুখোশ খুলতে শুধু যেটুকু সময়।

বাংলা দু-টুক্‌রো হয়ে গেল। নবগঠিত পূর্ববাংলার ছোটলাটের পদমর্যাদা লাভ করলেন ফুলার, স্যার ব্যামফীল্ড ফুলার। সঙ্গে সঙ্গে মুখে উঠল নতুন মুখোশ। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে যেন সিংহবিক্রমে তিনি লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিলেন হিন্দু বিদ্বেষের বিস্ফোরণে। ফুলারের ফণায় ফুটে বেরুল নীল বিষ।

মুসলমানদের স্নেহ, মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতেই তিনি যেন আবির্ভূত হয়েছেন এক স্বর্গীয় দেবদূত। মুসলমান সমাজে তিনি প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন এক অভিনব রূপকথা। তাঁর দুই বিয়ে। একজন সুয়োরাণী, আরেকজন দুয়ো। সুয়োরাণীই তাঁর প্রিয়রাণী। দুয়ো ভূয়ো। বলাবাহুল্য তাঁর সেই সুয়োরাণী হল নবগঠিত বাংলার মুসলমান সমাজ। বুক উজাড় করা যত ভালবাসা সব তাদের জন্যেই। আর বুক থেকে ভালবাসার সবটুকু

উজাড় হয়ে গেলে কি থাকে সেখানে? থাকে ঘৃণা, থাকে ক্রোধ, থাকে নির্মম হৃদয়হীনতা, থাকে বিবেকহীন বিবেচনাহীন ক্রূরতার বিকট বিষদাঁত। সেটাই বরাদ্দ ছিল হিন্দুদের জন্যে, না, হিন্দুদের জন্যে নয়, স্বদেশপ্রেমিকদের জন্যে, যারা দেশকে চেয়েছিল অখণ্ড, ভ্রাতৃত্বকে চেয়েছিল অক্ষয়।

ফুলারের কীর্তি-কাহিনীর বিবরণ ফুলস্কেপ কাগজের দু-দশ পাতায় লিখে শেষ করার নয়। সে এক কথা-সরিৎ-সাগর। সেই সাগর মন্থন করে সামান্য কিছু তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হল, যা তাঁর শাসনকালের হিংস্র-কুটিল বর্বরতার আভাসটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারবে মাত্র। সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, যা প্রতিদিনের রক্তপাতের অশ্রুপাতের অক্ষর দিয়ে লেখা।

নীচের বিবরণ দুটি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচনা থেকে সংগৃহীত।

১। "আদালতের বিচারে উদয় পাটনী নামক এক ব্যক্তির ফাঁসীর আদেশ হয়। সে দয়াপ্রার্থী হইলে ফুলার তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল।

নিয়ম এই যে, এরূপ ব্যাপারে এমনভাবে ফাঁসীর দিন স্থির করিয়া ভারত সরকারকে জানাইতে হয় যে, ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে, ফাঁসী বন্ধ রাখিতে আদেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের ১ দিন পূর্বেই ফাঁসী বন্ধ রাখিতে ভারত সরকারের আদেশ পাওয়া যায়, তখন উদয়ের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। কারণ দিন স্থির করিবার সময় সেক্রেটারী নির্দিষ্টকালের পূর্বেই ফাঁসীর দিন স্থির করিয়াছিলেন। এই দারুণ ত্রুটি ফুলারের মতে 'arithmetical error' মাত্র।"

২। বরিশালের "অশ্বিনীকুমার দত্ত, বার লাইব্রেরীর ও পিপল্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীনবন্ধু মিত্র, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান রজনীকান্ত দাস, জমিদার কালীপ্রসন্ন সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন এই ৫ জন

স্বাক্ষর করিয়া বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী সম্বন্ধে এক অনুরোধপত্র প্রচার করেন। ফুলারের আদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে আসিতে বলায়, তাঁহারা (ছোটলাটের) জাহাজে আসিলে ফুলার তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন। ফুলার যাহা বলেন, তাহার স্থূল কথা এই, ঢাকার লোকের ব্যবহার এত রূঢ় যে, তাহাতে দেবতারও ধৈর্যচ্যুতি হয়। তিনি মানুষ, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না, কোন মানুষই পারে না।

লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা সহৃদয় কালেকটারকেও পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। লোকের এই ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করার জন্য তাঁহারা দায়ী।

যেমন করিয়াই হউক সরকার এই অবস্থার প্রতিকার করিবেন। সেজন্য গুর্খা সৈনিক আনা হইয়াছে এবং তাঁহারা রক্তপাতের জন্য দায়ী হইবেন।—বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইবে না।

হিন্দুরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে তিনি সেকালের শাসক শায়েস্তা খাঁ-র পথ অবলম্বন করিবেন। অনুরোধপত্রের শেষভাগে দেখা যায়, ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসীরা যেরূপ Committee of Public Safety গঠিত করিয়াছিল, নেতারা সেইরূপ সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যেন বিদেশী পণ্যের ব্যবহার না করা হয়। তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের অনুরোধপত্র প্রত্যাহার না করেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকে শান্তিরক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহার আদেশ শাসন বিষয়ক; হাইকোর্ট তাহা রদ করিতে পারিবে না।

অশ্বিনীবাবু বলিতে যাইতেছিলেন, ছোটলাট ভুল করিয়াছেন, কারণ কয় ছত্র পরেই নেতারা লিখিয়াছেন লোকে যেন বলপ্রকাশ না করে। কিন্তু তিনি কথা বলিবার পূর্বেই ফুলার বলিলেন, চুপ করুন। আমি যুক্তি বা উত্তর শুনিতে চাহি না, এ আদালত নহে।

ফুলার রজনীবাবুকে বলেন, তিনি ছোটলাট অভ্যর্থনার দিন স্টীমার ঘাটে উপস্থিত হয়েন নাই ; তাহা রূঢ়তার পরিচায়ক। তিনি প্রথমে বলেন, বেলা ৩টার মধ্যে অনুরোধপত্র প্রত্যাহার করিতে হইবে। পরে বলেন, আপনারা পত্র প্রত্যাহার করিবেন কিনা ? উপায়ান্তরবিহীন হইয়া নেতারা পত্র প্রত্যাহারে সম্মত হইলে তিনি বলেন, বেলা ৯টার মধ্যে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। এই কথা বলিয়া সহসা তিনি আসন ত্যাগ করেন। কাগজ গুটাইয়া উঠিতে অশ্বিনীবাবুর আধ মিনিট বিলম্ব হওয়ায় ফুলার বলেন, 'উঠিয়া দাঁড়ান, আপনি আবার অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন।"

ফুলারের যেন আঙুল ফুলে কলাগাছ। গদীর সঙ্গে হাতে পেয়েছেন একটা গদা। ভেবেছেন ঐ গদার আস্ফালনেই বুঝি ঠাণ্ডা করে দেবেন দেশের উত্তপ্ত আলোড়নকে।

অশ্বিনীকুমারের হাতে গড়া চেলা মুকুন্দ দাস। পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় স্বদেশী যাত্রা গেয়ে। তার বজ্রকণ্ঠের গানে মানুষের চোখের ঘুম যায় মুছে। বুকের রক্ত ওঠে দুলে। মরা হাড়ে, ভাঙা পাঁজরে জেগে ওঠে জীবন, বাঁচার নেশা, সংগ্রামের পণ। সেই মুকুন্দ দাস অত্যাচারী ফুলারকে নিয়ে বাঁধলে একটা দুঃসাহসিক গান। ক্ষমতামত্ত ফুলারের কাছে প্রাণোন্মত্ত বরিশালের জবাব—

"ফুলার, আর কী দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধবে পা বাঁধবে,
ধরে না হয় ফাঁসী দেবে,
মনকে বাঁধতে পার তোমার এমন শক্তি নয়—
ফুলার, এমন শক্তি নয়।"

অশ্বিনীকুমার নিজেও লিখেছিলেন কিছু স্বদেশী গান।

অগ্নিময়ী মা গো আজি ডাকি সকলে মা !
জগৎজোড়া ঐ যে আগুন এক ফিন্‌কি দে তার মা !

ঐ আগুনের একটু পেলে,
এই মরা প্রাণ উঠবে জ্বলে,
রুদ্র দীপ্ত তোজোহনলে
পুড়ে হব সোনা।
বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ
ঐ আগুনে মা করব ধ্বংস
পাষণ্ড অসুর হীন নৃশংস
ধরায় রাখবো না!
ওগো মা! মা! মা!

গানের পাষণ্ড অসুরটি যে কাকে মনে রেখে লেখা তা আর ভেঙে বলার প্রয়োজন নেই।

অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিচয়নে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ফুলার আসিয়া বরিশালের নিরীহ নগর বাসীগণের প্রতি গুর্খা সৈন্য লেলাইয়া দিল। মুক্ত তরবারী হস্তে বরিশালের রাস্তা দিয়া আগে আগে চলিলেন গুর্খাদের শ্বেতাঙ্গ পরিচালক, ব্রিটিশ কাপ্তেন। পশ্চাতে চলিল অস্ত্রপাণি, প্রভুর আদেশ নির্বিচারে প্রতিপালনে অভ্যস্ত, নিরক্ষর, নির্মম, নির্ভীক, হিমালয়ের পার্বত্য সৈনিকের দল। রাস্তার লোকের মাথা ফাটিল, বিপণির পর বিপণি লুণ্ঠিত হইল, রমণীর সম্মানও অক্ষুণ্ণ রহিল না। কিন্তু এত অত্যাচারেও বরিশালের বাজারে বিলাতী কাপড়ের, বিলাতী লবণের ক্রেতা বা বিক্রেতা জুটিল না। অশ্বিনীকুমার পরিচালিত বরিশাল লাঞ্ছিত হইল, কিন্তু স্বদেশী সাধনায় সমান অটল রহিল; প্রেতের ভ্রূকুটি তাহার শব-সাধনা ভঙ্গ করিতে পারিল না।"

সরলা দেবীর 'ভারতী'তে ফুলারকে নিয়ে কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে। খুবই উপভোগ্য।

ফুলার চাঁদ।

সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখছি। দেখতে দেখতে

মনে হল, আজকের এই চাঁদ যদি ফুলার সাহেব দেখে, তবে বোধ হয় সে পূর্ববঙ্গে অত্যাচার কম করে। কারণ, দেখ, সূর্য বেচারী আলো দেয়, তাই চাঁদ আলো পায়। অথচ লোকে সূর্য অপেক্ষা চাঁদকে বেশী ভালবাসে, আদর করে। সেরূপ কর্জন সূর্যের তাপে তপ্ত ও আলোকিত ফুলারও তো লোকের সহিত ভাল ব্যবহার করে চাঁদের মতো হতে পারে।

ফুলার বদ্যি

রোগ যত পুরাতন হয়, ততই দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য হইতে থাকে। তখন সামান্য ডাক্তার বদ্যি কিংবা কবিরাজে সেই রোগ অপনোদন করা দূরে থাকুক, কি রোগ তাহাই নির্ণয় করিতে পারে না। দু-একজনে আন্দাজী মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে; তাহাতে কোনই ফল হয় না। কিন্তু কোন পাকা বদ্যির হাতে পড়লে, বদ্যি বুঝেন, রোগ যত কঠিন, ঔষধও তদনুপাতে কড়া হওয়া চাই। যে গরল এক ফোঁটা মাত্র শরীরে যাইলেই মুহূর্ত মধ্যে প্রাণ বিনাশ হয়, রোগ বিশেষে তাহাই অমৃতের কার্য করে।

বাঙালী অনেকদিন যাবৎ গোলামী রোগে ভুগিতেছিল। রোগের যাতনায় তাহারা ক্রমশই জ্ঞান হারাইতেছিল এবং মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় কার্জনের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু সার্জন কার্জন রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াও তদুপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিল না। তাহার সার্জারী-জ্ঞান চেরাচিরির বেশী কুলায় নাই; তাহাতে বড় বেশী ফল লাভও হয় নাই।

শেষে উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করিয়া কার্জনকে বিদায় লইতে হইল। এবার সাকরেদ ওস্তাদকে পরাস্ত করিয়াছে। ধন্বন্তরীর বরপুত্র ফুলার-বদ্যি চিকিৎসার ভার লইয়াই রোগ ঠিক করিয়া ফেলিল। আর কথা কি, যেমন রোগ নির্ণয় করা, অমনি ঔষধের ব্যবস্থা। ধন্বন্তরীর অমোঘ পাঁচন—গুর্খাসেনা,

পিউনিটিভ পুলিস, স্পেশেল কনস্টেবল, সাকুর্লার, ও রেগুলেশন লাঠি প্রযুক্ত হইল। ফল হাতে হাতেই। প্রয়োগ মাত্রেই মোহ নিদ্রা অপনোদন এবং সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ।

পটভূমি আসাম। সিরাজগঞ্জ। ফুলার চলেছেন রাজ্য-দর্শনে। ডিসেম্বরের চার, পাঁচ, ছয়। পুলিস বাহিনী হয়ে উঠল কর্তব্য-পরায়ণ, শহরের মোড়ে মোড়ে, বাঁকে বাঁকে। পথচারীমাত্রকেই শুরু হল কোমরের বেল্টের মার। দোষ থাক, না থাক সে-সব বিচারের কোন দায় নেই।

নাগরিকবৃন্দের প্রতিবাদ এসে পৌঁছল জেলা শাসকের দরবারে। সরকারী উকীলরাও রয়েছে তার মধ্যে। জেলাশাসক বললেন—আমি খবর পেয়েছি, বেশ বিশ্বস্তসূত্রেই, পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযান আক্রমণ চালানোর জন্যে সংগ্রহ করা হচ্ছে লাঠিয়ালদের।

নাগরিকবৃন্দের জবাব—আপনি যা শুনেছেন সেটা মিথ্যা। এরকম কোন চেষ্টা শহরের কোথাও হচ্ছে না। শান্তি রক্ষার ভার নিচ্ছি আমরা। পুলিসকে থামান।

কিন্তু থামল না। পুলিস নিয়োগ করা হল বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আলাদা আলাদাভাবে ধরপাকড়ের। তারপর আবার সেই কনস্টেবলদের কোমরের বেল্টের মার।

এই বিবরণ একজন বৈদেশিক সাংবাদিকের। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের এইখানেই শেষ নয়। লিখছেন—

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও, যাঁরা নিজেদের কাজে চলেছেন পথ দিয়ে, তাঁদের ওপর চলতো ঐ একই ব্যবহার। এসব দেখে সন্দেহ হয় যে দেশের ঘটনা আলোচনা করা হচ্ছে সেটা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ না জারের রাশিয়া।

মর্মান্তিক অত্যাচার উৎপীড়ন চলুক। কিন্তু সে সংবাদ যেন দেশবাসীর মর্মে না পৌঁছয়। টেলিগ্রাম আপিসে সরকারী নিষেধ। প্রহৃতদের সংবাদ পেলেই করবে প্রত্যাহৃত।

সাংবাদিক নেভিনসনের কাছে কলকাতার 'টেলিগ্রাফ আপিসের কর্তৃপক্ষ এ সত্য অস্বীকার করতে পারে নি। তবুও সংবাদ প্রচারিত প্রকাশিত হয়ে যেত নাম করা জার্নালের মধ্যে দিয়ে। তা দেখে রাগে ফোঁস ফাঁস করতেন ফুলার সাহেব। ঘৃণ্য শাসক হিসেবে ফুলার দিনে দিনে খ্যাতিমান হয়ে উঠতে লাগলেন যেমন এদেশে তেমনি স্বদেশে। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখলে— "It is doubtful if Russia can afford a Parallel to this petty-flogging tyranny"

কার্জন বিদায় নিয়েছেন। ব্যর্থ-শাসক ফিরে গেছেন আপন ঘরে। তাঁর পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসেছেন লর্ড মিণ্টো। ভারত-সচিব হয়েছেন লর্ড মর্লি। রাজত্বের দিকে তাকিয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন এই যে রাজ্য জুড়ে জেগে উঠেছে গুপ্তঘাতী সন্ত্রাসবাদের আখড়া। নিরস্ত্র বয়কট আন্দোলন এই যে নতুন বাঁক নিতে চলেছে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে, যে গলা এতদিন শুধু গেয়েছে বন্দেমাতরম্ আজ তা যে এগিয়ে আসছে ফাঁসীর দড়িতে গলা বাড়িয়ে দিতে, একদিন যে হাতের হাড় ভেঙেছে লাঠির ঘাড়ে, আজ যে সেই হাত বানাতে বসেছে হাত-বোমা, ধরতে শিখছে পিস্তল, এই সবই ফুলারের হিংস্র অমানবিক অমানুষিক বর্বর শাসনের পরিণাম। ফুলার রোপিত বিষবৃক্ষের ফল।

ফুলারের কাছে একদিন এসে পৌঁছল বড়লাট মর্লির একরাশ প্রশ্ন। উত্তর চাই অবিলম্বে। উত্তর এল। উৎসাহিত হবার মতো নয়। মর্লি জানালেন ফুলারের নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকদের মতে ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। এক শাসকের দ্বারা আর এক শাসক অপমানিত, কঠোর সমালোচিত। ভারত সচিব মিণ্টোও মর্লির সঙ্গে একমত। ফুলারী-শাসন দেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। কিন্তু তাড়াতে চাইলেও তৎক্ষণাৎ তা সম্ভব নয়। গদীচ্যুত করলেই

চৌদিকের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ, সরকারী পদস্থ রাজকর্মচারীরা তুলবেন চীৎকার। অগত্যা রয়ে-সয়ে সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সুযোগ এনে দিলেন ফুলার সাহেব নিজেই। অতি বাড়ন্ত হলে গাছ ভাঙে ঝড়ে। ফুলারের অতি বাড়ন্ত উদ্ধত্য তেমনি এগিয়ে নিয়ে এল তাঁর ভূলুণ্ঠিত পতনের দিন।

দুটো স্কুলের ছাত্ররা বড় বেপরোয়া। ফুলারের নামে তাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপে না। গুর্খা সৈন্যের গর্জমান বিভীষিকাতেও তারা অবিচল। এর পিছনে নিশ্চয়ই রয়েছে শিক্ষকদের গোপন সমর্থন, কর্তৃপক্ষের সহযোগ। বিব্রত ফুলার অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায়ই খুঁজে পেলেন স্কুল দুটিকে শায়েস্তা করার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি পাঠালেন নোট, এই দুটি স্কুলের অনুমোদন কেড়ে নেওয়া হোক।

মিণ্টো বুঝলেন এজাতীয় নির্বোধজনোচিত প্রস্তাবে সম্মতিদান অসম্ভব। ফুলারকে জানালেন তা প্রত্যাহারের জন্যে। ফুলার জানালেন—প্রত্যাহারে তিনি অক্ষম। যেটা পারেন, সেটা নিজের চাকরিতে ইস্তফা দিতে। তাই দিলেন। কিন্তু মদমত্ত শাসক তখনো স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তাঁর সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে তৎক্ষণাৎ। ভেবেছিলেন আসবে অনেক অনুনয়-অনুরোধ। গোসা ভাঙাবার সুশীতল আপ্যায়ন। চলবে মান-ভঞ্জনের পালা। তার বদলে এযে নিদারুণ অপমান। ইজ্জতের ইমারতকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়ানো।

মিণ্টো গ্রহণ করলেন ফুলারের পদত্যাগ পত্র। নীচে স্বাক্ষর করলেন মর্লি। "Evidently both were relieved at getting rid of the obnoxious man in a decent manner."

দেশজুড়ে সেদিন দারুণ উল্লাস, উরুভাঙা দুঃশাসনের পতনে। ফুলারের ফোঁস-ফাঁস গেল। কিন্তু ফিস-ফাস গেল না। চলে যাবার

আগে অশ্বিনীকুমারকে লিখলেন এক পত্র। ওঝার কানে ফুসমন্ত্র দেওয়ার চেষ্টা। শিলং-এর গবর্নমেন্ট হাউস থেকে লেখা সে চিঠির মর্মকথা এই—

ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার আগে আপনাকে চিঠি লিখছি। আমার পদত্যাগ আপনাদের কাছে যে সুযোগ এনে দিচ্ছে, আপনাদের তা গ্রহণ করা উচিত। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপনাদের আন্দোলন এইবার প্রত্যাহার করে নিন। না নেওয়ার পরিণাম হবে বিষময়। খুবই দুঃখের বিষয় যে আপনার মতো লোকের পূর্ণ ও প্রবল সমর্থন ও অংশগ্রহণ রয়েছে সরকার বিরোধী আন্দোলনে, যে সরকার জনসাধারণের সহযোগিতা পেলে দেশের প্রভূত মঙ্গল করতে পারতো। আমি গোড়া থেকেই আশা করে আসছি, আপনি নিশ্চয়ই আপনার ভূমিকা পরিবর্তন করবেন। কারণ আপনি এমন একজন লোক, যিনি শুধু ঠোঁট-নাড়া দেশ-প্রেমিক নন। শিক্ষার জন্যে আপনার কর্মনিষ্ঠা ও উদ্যম অতুলনীয়। কাজের মধ্যে দিয়ে আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আপনার ধ্যানকে। আপনি নিশ্চয়ই আজকের এই অবস্থা বিবেচনা করবেন, যার বিষক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করছে ও করবে এদেশের যুব-সমাজের, যারা অংশ নিচ্ছে আজকের বিরোধে-বিক্ষোভে। আপনার সুবিবেচনায় মঙ্গল হবে তাদেরই, যাদের স্বার্থ নিয়েই আপনাদের হৃদয় আলোড়িত।

অশ্বিনীকুমারকে ফুলার সাহেব কি ভেবেছিলেন তা জানা নেই। তবে ফুলার সম্পর্কে অশ্বিনীকুমার যা ভেবেছিলেন ফুলার তার চেয়ে এক তিলও বড়ো নয়।

আবার সেই 'ভারতী'তে ফিরে যাওয়া, ফুলার সম্পর্কে মনোরম টিপ্পনীর লোভে।

ফুলারের পদত্যাগ

পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লাট অদ্বিতীয় শায়েস্তা খাঁ সার বামফীল্ড ফুলার পদত্যাগ করিয়াছিল, একথা নতুন নহে। কিন্তু

এই পদত্যাগ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এরূপ পদত্যাগের ব্যাপার নতুন। কোটি কোটি প্রজার অভিশাপভাজন হইয়া লাটগিরি চাকরি করা কিরূপ বিড়ম্বনাজনক তাহা পক্ককেশ ঝুনো সিভিলিয়ান সার বামফীল্ড ফুলার এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। অত্যাচারের প্রতিবিধানে অসমর্থ দুর্বল প্রজার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে সফল হয়, ফুলারের পদত্যাগ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ফুলারের পদত্যাগ রহস্যটি প্রহেলিকাপূর্ণ। তাঁহাকে যে পদত্যাগ করিতে হইবে তাহা তিনি অল্পদিন পূর্বেও জানিতেন না। অল্পদিন পূর্বেও তিনি ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়া কোন স্থানীয় জমিদারকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আগামী শীতকালে আবার ময়মনসিংহের ভূমি পবিত্র করিবেন। পদত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে তিনি রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন; মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য তিনি খুব সমারোহে একটা বোর্ডিং খুলিবেন। কিন্তু সকল আশা বিফল হইল। চারি মাস পূর্বে তিনি দুই একটি স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আবদার করেন, ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁহার সে আবদার পূর্ণ করেন নাই, অতএব তিনি চাকরি ত্যাগ করিলেন; এইরূপ একটা কৈফিয়ত দিয়া তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। ইহাই যদি পদত্যাগের কারণ হয়, তাহা হইলে তিনি এতদিন চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এখন ইস্তফাপত্র দাখিল করিলেন কেন? মিঃ মরলির নিকট তিনি প্রকাশ্যভাবে যে তিরস্কার লাভ করিয়াছেন, এ পর্যন্ত কোন সিভিলিয়ানকে সেরূপ তিরস্কার ভাজন হইতে হয় নাই। এত তিরস্কার সহ্য করিয়া চাকরি করা বিড়ম্বনা—সার বামফীল্ড ফুলার যদি এরূপ কৈফিয়ত দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সত্যানুরাগ প্রকাশিত হইত।

ফুলারের অভিনন্দন! পূজারী ঢাকার নবাব

ফুলারের বিদায়ে কাহারও কাহারও চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া

উঠিয়াছে; কেহ কেহ ফুলারের বিদায়াভিনন্দনের আয়োজন করিতেছেন, ঢাকার নবাব তাহার প্রধান। যখন লাটপদে অবস্থান করিয়াও তিনি মফঃস্বলের জেলা হইতে পাত্থার্ঘ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তখন অস্তমিত তপনের পদে ঢাকার নবাব কোন্ আশায় অর্ঘ্য দান করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। বোধহয় ফুলারের এইরূপ দু-চারখানি অভিনন্দনের আবশ্যকতা হইয়াছে। তিনি স্বদেশে ফিরিবেন—তাঁহার স্বদেশীয় সদাশয় লোকে তাঁহার প্রতি অঙ্গুলী করিয়া দেখাইবে ঐ স্যার বামফীল্ড ফুলার—প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া অন্যায় জুলুমে ভারত গবর্নমেন্টের সহায়তা বা সহানুভূতি না পাইয়া চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তখন ফুলার এইরূপ দু-চারখানি অভিনন্দন দেখাইতে পারিলে, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টাও করিতে পারেন। অভিনন্দনে একথা লিখিলে সত্যের একটু মর্যাদা রক্ষা হইত পারে—সে কথাটি এই, স্যার বামফীল্ড ফুলারের পীড়নের কল্যাণে আমাদের মৃতপ্রায় দেহে শক্তির সঞ্চার হইতেছে।

ফুলারের বহু-আকাঙ্খিত পদত্যাগ শুধু রাজনীতিকদেরই সেদিন উল্লসিত করেনি, উৎসাহিত করেছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে। আপদ বিদায় হল, এবার নিশ্চিন্তি; এই রকম একটা স্বস্তির ভাব সর্বত্র।

ব্যঙ্গ-কাব্যে সিদ্ধহস্ত কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার ফুলারের পদ-ত্যাগ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবাসীর পাতায় লিখলেন-'লাট বিদায়'। কবিতার দুটো ভাগ। প্রথম ভাগ,—'গুণস্তুতি'।

সামনীতিতে সমতল তিব্বতে পর্বত;
দানের পুণ্যে উড়ে গেল দেশের সম্পদ;
ভেদ নীতিতে করে খেদ মূর্খগুলো বঙ্গে;
দণ্ডনীতির গণ্ডগোল জঙ্গী লাটের সঙ্গে।
কে যে বড় কে যে ছোট কেমন করে বুঝি;

উনিশ বিশ নাহি মানি, তুল্যরূপে পূজি।
চারি নীতির উপরেতে ত্রিনিটির খেলা ;
রাইট হ্যাণ্ডে উপযুক্ত লেফট্‌নেণ্ট চেলা।

*

পবিত্র আত্মার ঘুঘু ভিটেয় করি পেশ ;
উদ্ধারেণ ছোটকর্তা আমাদের দেশ।
গুপ্তদেবের ভাষাতত্ত্বে কূল নাহি পাই ;
শাল্‌গিরামের শোয়া বসা, দুঃখ কিছু নাই।

এবার দ্বিতীয় ভাগ। 'এড্‌রেশ্‌'।

কত্তা তুমি চল্লে ঘরে নেহাল করি দেশ ;
রচি কীর্তিকল্পে কাব্যে এড্‌রেশ্‌।
জঙ্গী বেটার সঙ্গে যুঝি কর্ম হল ঠাণ্ডা ;
নইলে সবাই বুঝত তুমি কত বড় বান্দা!
গরগরিয়ে রাগের চোটে ইস্তাফাটি পেশ্‌ ;
রইলে কিন্তু আস্ত সেই কেশী-নরের কেশ।
জবরদস্তের সংগে নাহি উঠতে পার এঁটে ;
নরম কাঠের ছুতোর তুমি গেলে বঙ্গে কেটে।
কলেজ বয়ের ভয়ে তোমার ইস্তাহারের ধুম ;
রজনীতে ক'দিন ভায়া হয় নি তোমার ঘুম ?
ঘরে গিয়ে পরের ভাবনা কোরো নাকো আর ;
রেখে গেলে যতটুকু এই ত চমৎকার।



সুরাট কংগ্রেস শেষ। অরবিন্দ চলে এলেন তাঁর পুরনো বরোদায়। চিরকালই অরবিন্দের মধ্যে দুটি বিপরীত ধারার সমন্বয়। একদিকে রাজনীতি, আর একদিকে ধর্ম। চেতনার একটা স্তরে তিনি কবি, আরেকটা স্তরে কর্মী।

বরোদা যাত্রার পথে তিনি অনুভব করলেন একজন গুরুর সান্নিধ্যে আসা প্রয়োজন। যিনি তাঁকে সাধনমার্গের পথ দেখিয়ে দেবেন। বারীন্দ্রকে জানালেন সে অভিলাষ। বারীন্দ্র চিনতেন একজন প্রসিদ্ধ যোগীকে। নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে। গোয়ালিয়রের মারাঠী ব্রাহ্মণ। লেলে ঠিক আশ্রমিক সন্ন্যাসী নন। গৃহস্থ যোগী। ঘরে আছে বিয়ে করা বৌ। বারীন্দ্র অরবিন্দের অভিলাষ পুরণের জন্যে লেলেকেই স্থির করলেন গুরু। বারীন্দ্রের নিজস্ব বর্ণনায় সেই সময়ের ইতিহাস—

"সুরাট হইতে অরবিন্দ আসিলেন গায়কোবাড়ের রাজধানী বরোদায়। অরবিন্দ আসিয়াছেন শুনিয়া বরোদা কলেজের প্রিন্সিপাল আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কোন ছাত্র যেন তাঁর অভ্যর্থনায় না যায়। স্টেশন হইতে কলেজ গেটের পাশ দিয়াই পথ। আমাদের গাড়ি ঐ অবধি আসিবামাত্র সমস্ত কলেজ ভাঙিয়া ছাত্র বাহির হইয়া আসিল ও ঘোড়া খুলিয়া বন্দেমাতরম রবে গাড়ি টানিতে লাগিয়া গেল। কলেজ শূন্য, ক্লাসে প্রফেসারেরা একা

বসিয়া কড়িকাঠ গুণিতে গুণিতে প্রহর অতীত করিলেন। বরোদা যাত্রার পূর্বেই আমি লেলেকে 'তার' করি যে, অরবিন্দ তাঁর দর্শনাভিলাষী। বেলা ৮-৯টায় লেলে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাতে ও অরবিন্দে একান্তে আধঘণ্টা আলাপ হইল, আমরা তখন স্থার সুবা খাসিরাও যাদবের বাড়িতে। লেলের সহিত সেই প্রথম আলাপের পর বরোদায় তিনটি সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন, একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহার পর আর কেহ অরবিন্দকে পায় নাই। তখন দেশময় তাঁহাকে চায়। বরোদার কত মানুষ তাঁহাকে দেখিতে উন্মুখ। লেলে কিন্তু বলিলেন,—আমার সাধনা তোমায় দেব, কিন্তু একান্তে সাতদিন আমার সঙ্গে থাক। অরবিন্দ বলিলেন,—কোথায়? লেলে,—আমি এক গোপন স্থানের ব্যবস্থা করবো।...তাহাই হইল। হঠাৎ অরবিন্দ উধাও হইলেন। চারিদিকে পাগলের মতো শহরসমেত মানুষ যাঁহাকে খুঁজিতেছে, তিনি কোথাও নাই। যেখানে লেলের নির্দেশে আমরা গেলাম, সে এক বিরাট জনহীন পুরী। সেখানে লেলের স্ত্রী রাঁধেন, অরবিন্দ, লেলে ও আমি খাই। তাঁহারা দুজনেই দিবারাত্র মুখোমুখী ধ্যানে কাটান। আমায়ও লেলে বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আমি মাঝে মাঝে বসি বটে কিন্তু মাথায় তখন বিপ্লবের পোকা গজ গজ করিতেছে; তাহারা আমায় স্থির হইয়া বসিতে দিবে কেন? কাজেই কোন গতিকে ফাঁক পাইলেই আমি সরিয়া পড়ি এবং একটি তালা-ঢালাইয়ের কারখানায় বসিয়া ঢালাইয়ের কাজ দেখি ও শিখি। বোমার বারুদের জন্য পিতলের বা কাঁসার আধার ঢালাই করিতে হইবে, কোথায় তাহা শিখিব তখন আমার কেবল সেই চেষ্টা। ভগবানকে ঠিক তখনই সদ্য সদ্য না পাইলেও আমার চলে, তবে তিনি যদি বোমার কারখানায় মিস্ত্রী বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভরা লোহার সিন্দুক হইয়া আসিতেন তাহাতে আমার বড় আপত্তি ছিল না।"

বরোদায় যখন অরবিন্দ লেলের কাছে যোগ সাধনায় মগ্ন, ঠিক সেই সময় প্যারিস থেকে ভারতবর্ষে ফিরলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। হেমচন্দ্র ছিলেন অরবিন্দের গুপ্তসমিতির প্রথম শিষ্য। প্যারিসে গিছলেন বিজ্ঞান শিখতে। সেটা বাইরের ঠাট। তলায় তলায় যেটা সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য, তা হল বোমা তৈরির ফরমুলা আর গুপ্তসমিতির নিয়মকানুন শিখে আসা। ১৯০৮-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জাহাজ থেকে বোম্বেয় নামলেন হেমচন্দ্র। কলকাতায় আসার আগে সেখানেই কাটাতে চাইলেন কিছুদিন। বোম্বের নাসিক আর পুনাতে আছে মারাঠাদের গুপ্তসমিতি। তার কাজকর্ম কিভাবে এগোচ্ছে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে। কিন্তু দেখতে গিয়ে মন ভরে গেল হতাশায়। তাঁর নিজের বর্ণনায়—

"বাংলাদেশে যেদিন থেকে গুপ্তসমিতির পত্তন হয়েছিল, সেদিন থেকে অর্থাৎ পাঁচ কি ছয় বছর ধরে মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির বিশাল অনুষ্ঠান আয়োজনের গালভরা গল্পই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন বাঙ্গালীকে বিপ্লববাদীতে পরিণত করবার সম্মোহন মন্ত্র। সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক সমিতির কাজকর্মের মোটামুটি একটা সঠিক বিবরণ জানতে পেরে তেমনিই এতকালের সঞ্চিত আশা একদম হতাশায় পরিণত হয়েছিল।"

হেমচন্দ্র ফিরে এলেন কলকাতায়। মনে হতাশা। হাতে মারাঠাদের দেওয়া উপহার একটা ফটো। র‍্যাণ্ড অ্যাণ্ড আয়ার্স্ট হত্যাকারী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ছবি।

দেখা হতেই বারীন্দ্র বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন দেখলে? হেমচন্দ্র হয়তো জবাব দিয়েছিলেন—ফাঁপা, ফাঁকা। তাই শুনে বারীন্দ্রও তখুনি উঠলেন উত্তেজিত চীৎকার করে—

'চোর, বেটারা চোর।'

উপেন্দ্রনাথ লিখছেন—"সমস্বরে আমরা সকলেই ধ্বনি করিয়া উঠিলাম—কেন, কেন, কেন?"

বারীন্দ্র বলিল—"এতদিন সাঙাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত, শুধু বাংলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না সব ঢুঢু। কোথাও কিছু নেই, শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। দু-একটা ছেলে একটু-আধটু করবার চেষ্টা করছে, তা-ও কর্তাদের লুকিয়ে। খুব কষে বেটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি বর্গীরা একেবারে খাপ খুলিয়া বসিয়াছেন আর আজ এইসব ফক্কিকারের কথা শুনিয়া মনটা বেশ খানিকটা দমিয়া গেল। কিন্তু বারীন বলিল,—কুচ পরোয়া নেই, ওরা যদি সঙ্গে এল তো এল, আর তা যদি না হয়তো একলা চলো রে। আমরা বাংলাদেশ থেকেই পাঁচ বছরের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেব। লেগে যাও সব আজ থেকে ছেলে যোগাড় করতে।"

ছেলে তো যোগাড় করতেই হবে, কিন্তু হয় কি করে? ওরে তোকে মরতে হবে বললেই কি কেউ কখনো ছুটে আসে। এদিকে ছেলের দরকার খুব। কারণ একটা কিছু করতেই হবে। নিজেদের মধ্যে তো তাড়া আছেই। তা ছাড়া যারা বোমা তৈরির জন্যে হাজার হাজার টাকা দিয়েছে গোপনে, তারা যদি বোমা ফাটানোর আওয়াজ শুনতে না পায়, তখন কপাল ফাটবে।

খুব হয়েছে দেশোদ্ধার। ওহে ছোকরা যে টাকাটা নিয়েছ, সোজা ফেরত দিয়ে যাও তো।

বারীন্দ্র ভাবতে লাগলেন, কি করা যায় তাহলে। আচ্ছা একটা কাজ করে দেখা যাক। ডেকে পাঠানো যাক লেলে মহারাজকে। তাঁর অলৌকিক শক্তির টানে যদি ছেলে-ছোকরারা ভিড় জমায়।

একদিন সত্যি সত্যিই বারীন্দ্র আহ্বান জানিয়ে বসলেন লেলেকে। নিজের জবানীতে বলছেন—

"১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে লেলে বাঙলায় আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি আমার সেজদা অরবিন্দের স্কটস্ লেনের বাসায় ছিলেন। একদিন স্কটস্ লেনস্থ সেজদার বাড়িতে লেলেকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা দুয়ার ঠেলিয়া দেখি তিনি চক্ষু মুদিয়া মৃতের মতো পড়িয়া আছেন। আর তাঁহার একজন মারাঠী শিষ্য তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কলিকাতায় আসিয়া লেলে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

—এখন তুমি কি কি সাধনা কর?

অর—কিছুই করিনে।

লে—সে কি?

অর—সব ছেড়ে দিয়েছি। যিনি আমার মাঝে মন্ত্র তুলেছিলেন তাঁর ওপর নির্ভর করার পর বাণী এসেছে। এই বাণীই এখন আমার পথপ্রদর্শক, তাঁরই ইঙ্গিতে আমি সকল সাধনা ছেড়ে দিয়েছি।

লে—ওহ! তোমায় শয়তান পথ ভোলাচ্ছে—Oh! the devil has got hold of you.

...তখন বাগানের কাজ জোর কদমে চলিয়াছে, বৈদ্যনাথ জংসনের আড্ডাও দুই-একমাস হইল আরম্ভ হইয়াছে। লেলেকে বাগানে আনিয়াছিলাম, তাঁহাকে ভিতরের খবর কিছুই দিই নাই বটে, কিন্তু তিনি সবই টের পাইয়াছিলেন।

লেলে বলিলেন,—

দেখো, তোমরা এপথ কিসের জোরে ধরেছ? ভারত স্বাধীন একদিন হবেই। কিন্তু এ পথে নয়।

আমি। তবে কোন পথে?

লে। দেশকে মানুষকে মুক্ত করতে হলেই কি তা রক্তারক্তি ছাড়া হয় না? ভারত বিনা রক্তপাতেই মুক্ত হবে।

আমি। কি করে?

লে। কি করে, তাই-ই যদি দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।

একটা নির্জন পার্বত্য গুহায় আমি তোমায় বসিয়ে দেব, ছয় মাস সেখানে সাধনা কর। আমি বলছি, ভগবানের আদেশ পাবে।

আমি। তা কি করে হয়? আমি কত মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়েছি; গীতা ও অসি ছুঁয়ে শপথ করেছি, যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ততদিন আমার এই ব্রত। আমি ছয় মাসের জন্যে কী করে কাজ ছাড়তে পারি?

লে। শীঘ্রই তোমাদের সামনে ভীষণ বিপদ আসছে।

আমি। কি? মৃত্যু? না হয় ধরে ঝুলিয়ে দেবে, তার জন্যে তো প্রস্তুত হয়েই একাজ করতে নামা।

লে। সে বিপদ মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ।

লেলে যাইবার সময় আমাকে ও উপেনকে না পাইয়া প্রফুল্ল চাকীকে লইয়া চলিলেন। আমি আপত্তি করি নাই, কিন্তু উপেন তাঁহাকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া আধপথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। অগত্যা লেলে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।"

আবার নতুন উদ্যম। মুরারীপুকুরে আবার শুরু হল বোমা বানানোর দারুণ তোড়জোড়। মুরারীপুকুর শুধু বোমা বানাল না। বানাল বাংলাদেশের জন্যে একটা নতুন ইতিহাসের অধ্যায়, রক্ত আলোর মদে তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত মাতাল।

সেই নতুন রক্তরাঙা ইতিহাসের পথ দিয়ে যাত্রা শুরু হল ১৯০৮ এর।

পথের দুধারে জেলখানার গরাদ, হাতকড়ি, ফাঁসীর মঞ্চ, নির্বাসন। পথের দুধারে বোমার গর্জন, বন্দুকের শব্দ, নির্ভয়-প্রাণের জয়োল্লাস।

সুরাট কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে, পর্বতের মুষিক প্রসবে। তারপর পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। ১৯০৮এর ফেব্রুয়ারী মাস।

আবার রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল রাজনীতির আসরে। এবারের

সম্মেলনের সভাপতি তিনিই। এই দায়িত্ব গ্রহণের পিছনে তাঁর প্রসন্নচিত্তের সমর্থন ছিল কম। তবুও যে তিনি এগিয়ে এলেন, ভয় দেখানো বেনামী চিঠির চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে, সেটা হল কোন বিশেষ মত, বিশেষ দলের গণ্ডীকাটা সীমার বাইরে থেকে সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতির আলোড়িত সত্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আপন ঐকান্তিক দায়। যখন সভাপতি হতে চলেছেন, মনের মধ্যে তখনো সংশয়ের কাঁটার খোঁচা—"সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে।"

কিন্তু সভাপতি হবার পর রবীন্দ্রনাথ পাবনা কনফারেন্সে একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। তা হল বাংলা ভাষায় ভাষণ পাঠ। এর আগে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের মতোই প্রাদেশিক সম্মেলনেরও কথা বলার ভাষা ছিল ইংরেজী। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের নিয়ম ভাঙলেন। বহুদিন থেকেই এই ভাঙার আর্তি তাঁর মনের মধ্যে ঘূর্ণি হাওয়ার মাতন তুলেছিল। এর আগে ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষণের সারকথা তিনিই অনুবাদ করে দিয়েছিলেন বাংলায়। তারও আগে সেই ৩০শে আশ্বিনের প্রবল উৎসবের দিনে বৃদ্ধ আনন্দ-মোহনের ইংরেজী ভাষাকে শত শত ইংরেজী-না-জানা জনসাধারণের মনে বাংলায় রূপান্তরিত করে পরিবেশন করেছিলেন তিনি।

তারও আগে আরেকবার। বাংলা ১৩০৪ সাল। সেটাও ছিল এমনি এক প্রাদেশিক সম্মেলন। স্থান রাজসাহী জেলার নাটোর শহর। সম্মেলনের আহ্বায়ক নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। তাই আমন্ত্রিতের তালিকায় আছেন ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ।

তাদের সেবারকার নাটোর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দেওয়া।

'ঘরোয়া'য় রয়েছে তাঁদের সেই বিজয়যাত্রার বিবরণ।

"আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প—সেই প্রথম স্বদেশী যুগের সময়কার, কী করে আমরা বাংলা ভাষার প্রচলন করলুম। ভূমিকম্পের বছর সেটা, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স হবে নাটোরে। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ ছিলেন রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমরা তাঁকে শুধু 'নাটোর' বলেই সম্ভাষণ করতুম। নাটোর নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বাড়ির সবাইকে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আমাদের কাউকে ছাড়বেন না—দীপুদা, আমরা বাড়ির অন্য সব ছেলেরা, সবাই তৈরী হলুম, রবিকাকা তো ছিলেনই।...নাটোরে তো পৌঁছনো গেল।

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসল। গোল হয়ে সবাই বসেছি। মেজো জ্যাঠামশায় প্রিসাইড করবেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল রিপোর্ট লিখছেন আর কলম ঝাড়ছেন। তাঁর পাশে বসেছিলেন নাটোরের ছোটো তরফের রাজা, মাথায় জরির তাজ, ঢাকাই মসলিন চাপকান পরে। ন-পিসেমশাই কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁর সেই সাজ কালো বুটিদার করে দিলেন।

আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে। আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এ-জন্য। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি এখানেও হবে সব কিছু ইংরেজীতে। অনেক তর্কাতর্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে। আর একদল

বলবে ইংরেজীতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে। বসেছি সব, কনফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজীতে হতে পারে না, বাংলা গানই হল। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধ হয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল,—রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

এখন, প্রেসিডেণ্ট উঠছেন স্পীচ দিতে; ইংরেজীতে যেই না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজীতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি—বাংলা, বাংলা। মহামুশকিল। কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ঐ চেঁচামিচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজী-দুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজীতে কেউ বলতে পারত না, তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টারী বক্তা—তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন, যেমন পারতেন তিনি ইংরেজীতে বলতে তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করতেন। আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কন্‌ফারেন্সে বাংলা ভাষা চলিত হল। সেই প্রথম আমরা পাবলিক্‌লি বাংলা ভাষার জন্যে লড়লুম।"

এই লড়াইয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বইতে হয়েছিল বেশ কিছুটা অপমানের বোঝা। নেতারা হয়েছিলেন ক্রুদ্ধ। উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সোজাসুজি বলেছিলেন, ইংরেজী জানে না বলেই রবীন্দ্রনাথের এত বাংলা-প্রেম।

সেবারের সম্মেলনের রিসেপশন কমিটির সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সম্মেলনের শেষে স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ দিতে ওঠার সময় তিনি ভেবে রেখেছিলেন এই অপমানের শোধ তিনি নেবেন কড়ায় গণ্ডায়। কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। তার

আগেই ভূমিকম্প এসে সমস্ত সম্মেলনকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবার, এতদিন পরে, নিজে সভাপতি। নিজেই সার্থক করলেন নিজের বহুদিনের স্বপ্নকে, পাবনায়।

চারিদিকে গুমোট আবহাওয়া। থেকে থেকে এখানে ওখানে মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের আগুনে ঝলসানি। বাতাসে বাতাসে অবিশ্রান্ত ফিসফাস, হত্যার, ষড়যন্ত্রের। যেখানে অন্ধকার, তার আশেপাশে কারা হাতের শক্ত মুঠোয় কিছু একটা ধরে আছে। কি ওটা? বজ্র? না-বোমা? বাংলাদেশের মাটির তলায়, মাটির উপরে, গোপন ল্যাবরেটরীতে, জেলখানায়, রেললাইনের ধারে ধারে তখন বিরাট প্রস্তুতি চলেছে সন্ত্রাসবাদের। যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের কাছে অনাচারী ইংরেজ জাতটাকে নিঃশেষ করার ঐটেই একমাত্র পথ। ঠিক সেই মহাদুর্যোগের পূর্বমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাবনার ভাষণে বাংলার যুব সমাজকে শোনালেন আত্মবিকাশের ও জাতিগঠনের অন্য এক মন্ত্র।

"তোমরা যে পার, এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর, শিক্ষা দাও, কৃষি-শিক্ষা ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নতুন চেষ্টা প্রবর্তিত কর, গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।

বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোটবাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, organisation. সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের

মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে, গ্রামগুলিতে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।...আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতঃই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।"

ফেব্রুয়ারীর পর মার্চ।

১০ই মার্চ বিপিনচন্দ্র বক্‌সার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এলেন। লক্ষাধিক জনতা সেদিন হাওড়া স্টেশনে সমবেত হয়েছিল তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। অবশ্য নরমপন্থীরা সকলেই ছিলেন অনুপস্থিত। মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল বিপিন পালের সম্বর্ধনা সভা। সেই সভাতেও মডারেটদের অনুপস্থিতিকে ধিক্কার হানলেন বক্তা সুরেশ সমাজপতি।

ওদিকে মাদ্রাজে, তখন আর এক কাণ্ডকারখানা। চিদম্বরম্ পিলে এক বক্তৃতায় বলে বসলেন, বিপিন পাল হলেন 'স্বরাজ-সিংহ'। যেই না একথা ঢুকলো সরকারী কানে, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পড়ল পিলে মহাশয়ের হাতে। আবার যেই না এই গ্রেপ্তারের খবর ছড়ালো হাওয়ায়, অমনি সারা টিনাভেলীতে শুরু হয়ে গেল প্রতিবাদের পালা। প্রতিবাদ অবশেষে রূপ নিল প্রলয়ের, দাঙ্গা খুনখারাপীর মধ্যে দিয়ে। মাদ্রাজের 'স্বরাজ' পত্রিকা যখন তাদের কাগজে এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামার পিছনে সরকারী প্ররোচনার কথা লিখলে, তখুনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছোবল তোলা সাপের মতো ছুটে এল 'স্বরাজ'-এর দিকে।

তারপর মে মাস। ১লা মে শুক্রবার।

বন্দেমাতরম-এর আপিসে বসে আছেন অরবিন্দ। এমন সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী একটা টেলিগ্রাম এনে ধরলেন তাঁর সামনে।

কি ব্যাপার! এমন সময় টেলিগ্রাম কিসের! অরবিন্দের

উদ্গ্রীব দৃষ্টি টেলিগ্রামের কালো অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে। পড়তে গিয়ে বুঝতে পারলেন কালো হরফগুলির তলায় তলায় রক্তের দাগ। শুনতে পেলেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম প্রবল পদধ্বনি।

সেদিনের টেলিগ্রামে সংবাদ ছিল—মজঃফরপুরে ফেটেছে বোমা। নিহত হয়েছে দুটি ইউরোপীয়ান মহিলা।

ঐদিন সন্ধ্যেবেলা বেরুল 'এম্পায়ার' পত্রিকা। তাতে সংবাদ "৩০শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার সময় মিসেস এবং মিস কেনেডী, মজঃফরপুরের জজ মিঃ কিংসফোর্ডের বাড়ির গেটে ঢুকতে বোমার দ্বারা নিহত হয়েছেন।"

সেই সঙ্গে পুলিস কমিশনারের বিবৃতি—আমরা জানি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কারা লিপ্ত। তাদের গ্রেপ্তার করতে বেশী সময় লাগবে না।

অরবিন্দ তখন শুধু সংবাদ-পাঠকমাত্র। তিনি নিজেই তখন জানেন না যে সরকারী হিসেবে তিনিই এই হত্যা-সংবাদের প্রধান স্রজক। তাঁর নিজের ভাষায়—"জানিতাম না তখন যে, আমি এই সন্দেহের লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্তনেতা।"

ওদিকে বারীন্দ্র হয়েছিলেন উৎকণ্ঠিত।

"প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর পাঠাইয়া আমি দিন গনিতে ছিলাম। প্রতিদিন এম্পায়ার কাগজ কিনিয়া দেখিতাম কার্যোদ্ধার হইল কি না।" এম্পায়ার বলে দিল, কার্যোদ্ধার হয় নি। হত্যাকারীদের লক্ষ্য ছিল কিংসফোর্ড। কলকাতার দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড যেদিন কলকাতা থেকে বদলী হলেন মজঃফরপুরে, সেদিন থেকেই মুরারীপুকুরের বিপ্লবীদের মন প্রাণ চোখ সব পড়ে ছিল সেইখানে। তার আগে কলকাতাতেই একবার চেষ্টা করা হয়েছিল তাঁর প্রাণনাশের।

কিংসফোর্ড থাকেন তখন তাঁর টালীগঞ্জের বাড়িতে। একদিন পড়ার টেবিলে আবিষ্কার করলেন একটা বিরাট বই। কিংসফোর্ড ভাবলেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে পড়তে নিয়ে যাওয়া বইই পাঠিয়েছেন ফেরত। সুতরাং তিনি খুললেন না। খুললে ? খুললে সেইদিনই সেইখানেই স্বর্গলাভ ঘটতো তাঁর নিমেষে।

সেটা ছিল কিংসফোর্ড হত্যার প্রথম উদ্যোগ। ভার পড়েছিল পরেশ মৌলিকের ওপর। 'যুগান্তর' কাগজের অন্যতম স্তম্ভ, আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'শহীদযুগল' বইয়ের ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন সেই গোপন কাহিনী।

"কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রথম চেষ্টা এই পরেশের দ্বারাই করানো হয়। সে আরদালীর বেশে একটা খুব মোটা আইন বইএর মধ্যে একটি বোমা নিয়ে কিংসফোর্ডের চাপরাসীর কাছে খুব চতুরতার সঙ্গে দিয়ে আসে। চাপরাসীর সঙ্গে ভাবটাব করে নানা গল্প-গুজব ও পান বিড়ি খাইয়ে তার হাতে বইটা দিয়ে কিংসফোর্ডের পড়ার টেবিলের ওপর রাখবার ব্যবস্থা করে। বইটার প্যাকিংএর ওপর যথারীতি কিংসফোর্ডের নাম লেখা ছিল। বইটার কভার না কেটে ভেতরটা কেটে তার মধ্যে বোমা স্থাপন করে ভালভাবে প্যাক করা হয়। বোমার সঙ্গে একটি স্প্রীং দিয়ে কভারের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। কভারের বাঁধন খোলা মাত্র স্প্রীং-এর জোরে কতকটা ত্রিং করে লাফিয়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটার বিস্ফোরণ ঘটবে।

বইটা নিয়ে যাওয়ার কালে চাপরাসী বলে—বহুত ভারী হ্যায়। পরেশ হাসতে হাসতে বলে—এসব বাবা বড়লোকের বই, আমরা ওসবের কি বুঝি। বইটা বহুদিন যাবৎ অ-খোলা অবস্থায়েই পড়ে থাকে। যখন খোলা হয় তখন উহার মধ্যে বোমা পাওয়া যায়, কিন্তু স্প্রীংটা জং ধরে ও বাঁধনের চাপে কার্যকরী হয় নি।

সিডিশান কমিটির রিপোর্টে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে।"

তারপর মজঃফরপুর।

সেদিন ছিল ঘোর অমাবস্যার রাত। পৃথিবী যেন অনাগত এক মহাদুর্দৈবের আশঙ্কায় মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে দুটি কিশোর-প্রাণ অতি সতর্কপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সামনের একটা ইউরোপীয়ান ক্লাবের দিকে। তাদের হাতে রিভলভার, বন্দুক, বোমা। তাদের বুকে নির্ভয় যৌবন। মনে আত্মোৎসর্গের মৃত্যুহীন মন্ত্র।

ঘড়িতে বাজল আটটা। ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। এইতো সুযোগ। শত্রু সন্নিকট। আর কি ভয়! মহোল্লাসে গর্জন করে উঠল তাদের বোমা। তার সঙ্গে বুঝি দুটি সকরুণ আর্তনাদ। কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি, মাটির উপরের অন্ধকার, অন্ধকারের ভিতরের স্তব্ধতা। গাড়ির ভিতরে লুটিয়ে পড়ল রক্তাপ্লুত দুটি নিরপরাধ নারীর মৃতদেহ।

আততায়ী দুটি কিশোর তখন অন্ধকারে ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে আত্মরক্ষার তাগিদে। তাদের বোমার আঘাতে কে মরেছে সেটুকু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখারও বুঝি তাদের অবকাশ নেই।

রাত পোহাবার আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল পুলিসের সতর্ক সন্ধানী অভিযান। সারা শহরে ঢোল-শোহরত করে দেওয়া হল হত্যাকারীদের সন্ধান বা ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার পুরস্কার দেবে সাহায্যকারীকে। ছদ্মবেশী পুলিশের বাঘের থাবা পাতা রইল স্টেশনে, ট্রেনে ট্রেনে। পরের দিন শুক্রবার বেলা ১টার সময় মজঃফরপুরের ২৪ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনি স্টেশন থেকে খবর এল ধরা পড়েছে একজন আততায়ী, নাম ক্ষুদিরাম।

শিবপ্রসাদ মিশ্র আর ফতে সিং এই দুই কনেস্টবল পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নির্দেশে রাত্রির ট্রেনেই ছুটে যায় ওয়াইনি স্টেশনে। রাত পোহাল। সকাল ৮টা কি ৯টা। একটা মুদির

দোকানে তারা দেখতে পেল একটি বালককে জল খেতে। সন্দেহ হল। আততায়ীর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলে মনে হল তাদের। কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল-কোথায় যাবে ?

ক্ষুদিরামের তেজোদৃপ্ত উত্তর,—তেজপুর।

কনেস্টবল এই সময় তাকে ধরতে গেল। পালাবার চেষ্টা করলে ক্ষুদিরাম। কিন্তু পারলে না। ধরা পড়ল বামাল সমেত। তার বাঁ বগলে জামার মধ্যে জড়ানো একটা পিস্তল। পকেটে ছিল ৩২টা টোটা। ৩টে দশ টাকার নোট। কিছু খুচরো টাকা। রেলওয়ে টাইমটেবলের কিছু ছেঁড়া পাতা।

আততায়ী ধৃত এই সংবাদ পেয়েই পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছুটলেন ওয়াইনি স্টেশনে। স্টেশনের বাইরে ফিটন গাড়ি প্রস্তুত ছিল। সেই গাড়িতে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। তখন সন্ধ্যে। গাড়িতে ওঠার আগে ক্ষুদিরাম একবার শুধু প্রাণভরে উচ্চারণ করলে—বন্দেমাতরম্।

ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে এসে থামল গাড়ি। তাপর শুরু হল প্রশ্নোত্তর।

তখনও নিঃশঙ্ক ক্ষুদিরামের নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর—

"আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাড়ি—মেদিনীপুর। এনট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম। আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় উৎপীড়ক আর ভারতবর্ষে কেহ নাই। তাঁহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে যে হত্যা করিয়াছি, এজন্য আমার মর্মান্তিক যাতনা হইতেছে। আমি মেদিনীপুর হইতে এখানে আসিয়াছি। হাওড়ায় আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয়। দীনেশের সঙ্গে একটি বোমা ছিল। দীনেশ বোমা তৈয়ার করিতে পারিত। আমার সঙ্গে ২টা রিভলভার ও কতকগুলি গুলি ছিল। আমি উহা কলিকাতায়

কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭-৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুরে পঁহুছিয়া ধর্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ধর্মশালার নিকট কিশোরী-বাবুর অফিস ছিল। আমাদিগকে কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত যে, আমরা কোথায় থাকি, আমরা বলিতাম কিশোরীবাবুর বাসায় থাকি।

আমরা সর্বদা মিঃ কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম মিঃ কিংসফোর্ড কুঠী হইতে কয়েক গজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণে যখন মনে হইল, অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে তখন ক্ষান্ত হইলাম।"

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. উড্‌ম্যান ক্ষুদিরামের এই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করলেন। তার বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হল নরহত্যার অভিযোগ।

ওদিকে বীর-মহিমার আর এক ভিন্ন ইতিহাস। সেটা ক্ষুদিরাম কথিত দীনেশের। দীনেশ প্রফুল্ল চাকীর গুপ্তনাম। ক্ষুদিরামের কাছে প্রফুল্ল চাকী দীনেশরঞ্জন রায়। প্রফুল্ল চাকীর কাছে ক্ষুদিরাম বসু হরেন সরকার। কেন?

বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"আমাদের নিয়ম ছিল কোন কাজের সংস্পর্শে এলে যেটুকু জানা দরকার তার বেশী কাহাকেও জানতে হবে না। কর্মীরা সকলে সকলকে জানতে পারত না। ভিন্ন ভিন্ন কর্মীদের বিভিন্ন স্থানে রাখা হত। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পূর্বে কেউ কাউকে চেনে নাই। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হতে আনিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়ে বলে দেওয়া হয়, এর নাম দীনেশরঞ্জন রায়, বাঁকুড়ার একজন কর্মী। আর ক্ষুদিরামকে হরেন সরকার বলে প্রফুল্লকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

সাবধানতার জন্যই এরূপ করা হয়। যদি কোন কাজে কেউ ধরা পড়ে সে প্রকৃত কথা বলতে পারবে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও হত।"

হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল অন্ধকার অজানা পথে ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মজঃফরপুর থেকে চব্বিশ মাইল দূরের এক আমবাগানে। দেহ অবসন্ন। পাকস্থলী শূন্য। সকাল হতেই প্রফুল্ল তাই ক্ষুদিরামকে পাঠিয়েছিল খাবারের যোগাড় করতে।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। ক্ষুধার্ত প্রফুল্ল আর এক তিল অপেক্ষা না করে তখুনি হাঁটা শুরু করে দিলে সেই আমবাগানের ভিতর দিয়ে সমস্তিপুরের দিকে। মজঃফরপুর থেকে সমস্তিপুর বত্রিশ মাইল।

বেলা দ্বিপ্রহর। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, ক্ষুধিত প্রফুল্ল হেঁটে চলেছে রেল-কর্মচারীদের বাসভবনের সামনে দিয়ে। প্রফুল্লর শুকনো মুখ, উস্কখুস্ক চুল, ময়লা পোষাক দেখে একজন রেল-কর্মচারীর মনে সন্দেহ হল—এ নিশ্চয়ই বিপ্লবী। তাকে ডেকে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। দিলে স্নানের জল। খাবার ভাত। পরার জন্যে নতুন জামা জুতো কাপড়। তারপর কেটে দিলে রাত্রির ট্রেনের একটা ইণ্টার ক্লাসের টিকিট।

গাড়ির যে কামরায় চলেছে প্রফুল্ল, সেই কামরাতেই চলেছেন নন্দলাল ব্যানার্জী। পুলিস সাব-ইনস্পেকটর। প্রফুল্লর চালচলন হাবভাব দেখে সন্দেহ হল নন্দলালের। কথায় বার্তায় তিনি এমন ভাব প্রকাশ করে চললেন যেন তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক। প্রফুল্লও তাঁকে সেই ভেবে কিছুটা অন্তরঙ্গ হল।

গাড়ি এসে থামল মোকামা ঘাটে। প্রফুল্লই বয়ে নিয়ে চলল নন্দলালের বাকস-বিছানা।

নদী পেরিয়ে আবার রেলগাড়ি। স্টেশনে অপেক্ষা করছে

প্রফুল্ল। নন্দলাল কিছুক্ষণের জন্যে চলে গেলেন চোখের আড়ালে। কোথায়?

"সমস্তিপুর হইতে গাড়ি ছাড়িবার পূর্বে আমি আমার মাতামহ মজঃফরপুরের সিনিয়র গবর্নমেন্ট প্লীডার শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে টেলিগ্রাম করিয়া জানাই যে, একজন লোকের উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ তিনি যেন পুলিস সাহেবের নিকট হইতে লইয়া পাঠান। ২রা মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামাঘাট স্টেশনে আমি টেলিগ্রামের জবাব পাই।"

তারপরেই আক্রমণ। দুজন কনেস্টবল স্টেশন থেকে যোগাড় করে নন্দলাল এগিয়ে এলেন প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে। প্রফুল্ল শত্রু পরিবৃত। তবু পরাভূত নয়। লুকনো জায়গা থেকে টেনে বার করলে টোটা ভরা রিভলভার। চোখে ঝলসে উঠল ঘৃণার বিদ্যুৎ। মুখে ভীষণ ধিক্কার।

"তুমি বাঙালী হয়ে এই কাজ করলে। আচ্ছা, নাও তবে—"

গর্জে উঠল বন্দুক, নন্দলালের দিকে। মাথা নীচু করে নন্দলাল প্রাণ বাঁচালে। কনস্টেবলেরা তখন তাকে ঘিরে ফেলেছে। আর কোন উপায় নেই আত্মরক্ষার। প্রফুল্ল অকম্পিত হাতে বন্দুকের মুখটাকে ঘুরিয়ে নিলে নিজের দিকে। পর পর দুটো গুলির শব্দ। একটা বিঁধল তার কপালে। আরেকটা বুকে। প্ল্যাটফর্মের পাথুরে জমির উপরে লুটিয়ে পড়ল আত্মঘাতী প্রফুল্লর বীরদেহ, আত্মবিনাশের অবিনাশী মহিমায়। উপেন্দ্রনাথ সেন ক্ষুদিরাম মামলার উকিল কালিদাস বসুর সহযোগী। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার মজঃফরপুরের নিজস্ব সংবাদদাতা। তাঁর আবেগাপ্লুত বর্ণনা—

"বাংলার এই প্রথম বীর পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিল। পুলিস মৃত প্রফুল্লর ফোটো তুলিয়া

লইল। শুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্নমুণ্ড মজঃফরপুরে লইয়া আসিয়াছিল। বিচারকালে প্রফুল্লর সেই অবস্থার ফোটো আমি দেখিয়াছি। কপালের উর্ধ্ব দিকে একটি ও বাঁ দিকের বুকের উপর দিকে একটি গুলি-প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, কি অমিতবীর্য ও মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের শরীরে দুইবার গুলি লাগাইতে পারে!

কি প্রশান্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লর! আর বক্ষদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত! বাঙালী হইয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙালী বীরের প্রকৃত মূর্তি।"

প্রফুল্ল জাতীয় আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের বন্দনায় বারীন্দ্র লিখেছেন—

"ওরা দুজনে এক বৃন্তে দুইটি যুগ্ম পদ্ম—দেশজননীর চরণে অর্পিত পূজার ফুল, নিবেদিত অর্ঘ্য, একই আত্মদান রূপ পুণ্য ব্রতে ব্রতী। তাই ক্ষুদিরামের নাম করতে গেলে এক নিশ্বাসে প্রফুল্ল চাকীর নামও যে উচ্চারণ না করে উপায় নাই। আত্মদান তারা দুজনে একসঙ্গে করেছিল বটে, কিন্তু বন্ধনপীড়িতা দেশলক্ষ্মীর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবার গৌরব যে প্রফুল্ল আগে অর্জন করেছে, তাই প্রথম শহীদের স্বর্ণমুকুট তাহারই আগে প্রাপ্য—সে দিক দিয়ে সে-ই অগ্রজ।"

রুদ্র রৌদ্রের আগে এই হল বাংলার বিপ্লবী আন্দেলনের রক্তবর্ণ প্রত্যুষ।

মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া এরপর আর শুধু সেইখানেই আটকে রইল না। পুলিসী-হায়নার হানা ছুটে এল কলকাতায়।

হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ ডেকে পাঠালেন বারীন্দ্রকে।

দাও, এখুনি আড্ডার সকলকে খবরটা জানিয়ে দাও। কেউ যেন আর ওখানে না থাকে।

হেমচন্দ্রের সাক্ষ্য—"কোন আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোন খবর না দিয়ে মানিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলবার, গুলি, সেল আদি পুঁতে ফেলতে সে হুকুম দিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী রাত ১২টা পর্যন্ত ঐ সকল জিনিসের ওপর দুটি দুটি মাটি ঢাকা দেওয়া হয়েছিল, ঐ সময় নাকি পুলিশের কে একজন এসে এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিল, 'সকালে অনেক পুলিস আসবে, সাবধান!' একথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে নি। ওদিকে হ্যারিসন রোডের উক্ত মালপত্রগুলোও সরানো হল না। আমিও রাত ১২টা পর্যন্ত কোন খবর না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত হলাম।"

কোনমতে রাতটা কেটেছে কি কাটে নি। ২রা মে ভোর রাত্রি থেকে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক খানাতল্লাসী, ধরপাকড়। মুরারী-পুকুরের বাগানে পুলিস খুঁজে পেলে নিষিদ্ধ বোমা-বারুদের কারখানা। একে একে ধরা পড়ল বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি নেতারা। অন্যান্য আরো নানা জায়গা থেকে দলের ছেলেরা। যেখানে যত কাগজপত্র সব হস্তগত করল পুলিস। কাগজপত্রে যেখানে যার নাম চোখে পড়ল, তার ভালমন্দের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার না করে সকলের হাতেই পুলিস পরালে হাতকড়া।

ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন। নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। পুলিস তাঁকেও জেলে পুরে দিলে। একজন ব্রাহ্মণ প্রহরী তাঁকে এনে দেয় গঙ্গাজল আর বেলপাতা। তর্করত্ন সেইটুকু খেয়ে জেলে দিন কাটান। তাঁর হাজতবাস কেন?

গুপ্তসমিতির কাগজপত্রের কোন একটিতে তাঁর নাম পাওয়া গেছে। শেষ পর্যন্ত প্রমাণের অভাবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল, যথেষ্ট লাঞ্ছনার পর।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এক সময় ছিলেন বটে বাংলাদেশের গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বারীন্দ্রর সঙ্গে ঝগড়া করে সে সব করে দিয়েছেন ছেড়ে। জনতা ছেড়ে নির্জন পার্বত্য-প্রদেশে এখন তাঁর সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন। নাম নিরালম্ব স্বামী। তাঁকেও টেনে আনা হল বিচারের অজুহাতে, আসামী করে। আবার ছেড়েও দেওয়া হল। চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানাই-লাল দত্তের শিক্ষক। সুতরাং বিপ্লবী না হয়ে যান না। কাগজ-পত্রে নাম পাওয়া গেছে একজন চারুচন্দ্র রায়চৌধুরীর। তাহলে ইনিই যে তিনি তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হল যে তিনি নিতান্তই নির্দোষ ব্যক্তি। তা ছাড়া তিনি আদপেই নন চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি শুধুমাত্র চারুচন্দ্র রায়।

তারপর অরবিন্দ!

আগে থাকতেন স্কট লেনে। কিছুদিন হল এসে উঠে এসেছেন গ্রে স্ট্রীটে, 'নবশক্তি' কাগজের আপিসের দোতলার ঘরে। সঙ্গে আছেন বোন সরোজিনী দেবী ও স্ত্রী মৃণালিনী দেবী।

নিজের বন্দীত্বের বিবরণ নিজেই লিখেছেন তাঁর 'কারা কাহিনী'তে।

"শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোর প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগনার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টার, লালপাগড়ী, গোয়েন্দা খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ

আমার ভগ্নিনীর বুকের ওপর পিস্তল ধরে; তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি। তখনও অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থা। ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন—অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি? আমি বললাম—আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে একজন পুলিসকে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্-বিতণ্ডা হইল। আমি খানা-তল্লাসীর ওয়ারেন্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেন্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না—আমার বাড়িতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই body warrant-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনেস্টবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে। তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইন-ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদবাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি. এ. পাস করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মতো শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?"

আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতোই থাকি।"

সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?"

দেশ-হিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্য ব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূল-বুদ্ধি ইংরাজকে বোঝানো দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরো, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না।

খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এই ঘৃণিত কার্যে যোগদান করিতে হইবে।...খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নতুন ভয়ঙ্কর তেজোবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠানো অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন তৎপর মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর

একতলায় পুলিস মহাত্মাদের আবির্ভাব। একতলায় বসিয়া ক্রেগান চা পান করেন, আমি এক পেয়ালা কোকো ও রুটি খাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনৈতিক মতগুলি যুক্তিতর্ক দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—আমি অবিচলিতচিত্তে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলাম। তবে জিজ্ঞাসা করি, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা কি unwritten law-এর চতুঃসীমার মধ্যে আসে?—

নীচের ঘরগুলি ও 'নবশক্তি' অফিসের খানাতল্লাসীর পর পুলিস 'নবশক্তির' একটি লোহার সিন্ধুক খুলিতে আবার দোতলায় যায়। আধ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটি দ্বিচক্রযান আবিষ্কার করেন; তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্টিয়ার নাম ছিল। অমনি কুষ্টিয়ায় সাহেবকে যে গুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসোমহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। মেসোমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?" আমি বলিলাম—"আমি কিছুই জানি না, ইহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বডি ওয়ারেন্ট দেখান নাই।" মেসোমহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদবাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমিই সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া লইলাম।"

ভূপেনবাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা করায় গুপ্তমহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেনবাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোন কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম, আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে স্ট্রীটে আসিয়া খানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।"

বাড়ি থেকে থানা। থানায় স্নানাহার সেরে লালবাজার। লালবাজার থেকে রয়ড স্ট্রীটে। সেইখানেই আলাপ বিখ্যাত শামসুল আলমের সঙ্গে। ইনি একাধারে মৌলভী এবং ডিকেটটিভ। মুখে ধর্মের পাঁচ কথা। পেটে জিলেপীর প্যাঁচ। ধর্মালোচনার ফাঁকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন—

"আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।"

অরবিন্দ হেসে উত্তর দেন—

"মহাশয় বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের। আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন।"

মৌলভী অমনি আমতা-আমতা করে চুপ। এই করে সন্ধ্যে কাটল। উঠল ঝড় বৃষ্টি। সেই সময় এলেন রামসদয়বাবু। তাঁর কল্যাণে এল আহার ও শয্যার সুযোগ। তারই কিছুক্ষণ পরে আবার এল লালবাজারের ডাক। লালবাজারে এনে ভরা হল দোতলার একটা ঘরে। সঙ্গে সঙ্গী শৈলেন্দ্র। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকলেন পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব। তাঁর নির্দেশে শৈলেন্দ্রকে সরিয়ে দেওয়া হল অন্য ঘরে। ফাঁকা হাজতখানায় দুজনে মুখোমুখি, বন্দী এবং বন্ধনদাতা। হ্যালিডে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—"এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?"

অরবিন্দের অবিচলিত উত্তর—"আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?"

হ্যালিডের তখনো উগ্রমূর্তি। "আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।"

অরবিন্দ পূর্ববৎই প্রশান্ত। "কি জানেন বা না জানেন আপনারই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।"

হ্যালিডের হুমকি থামল।

পুরো রবিবার কাটল হাজতে। পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিল সাহেবের কোর্টে। থর্নহিল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু ধৃত আসামীদের আড়ত হল মুরারিপুকুর, সেটা ২৪ পরগনার জেলা সদর আলিপুর কোর্টের এলাকা। সুতরাং থর্নহিলের এক্তিয়ার থেকে মামলা এবং মামলার অন্যতম প্রধান আসামীকে চালান করা হল আলিপুরে। তারপরেই শুভ উদ্বোধন ঘটল সুবিখ্যাত আলিপুর মামলার।

অরবিন্দকে ভরা হল আলিপুর জেলে। শাস্তি নির্জন কারবাস।

তাঁর নিজস্ব বিবরণ—

"থর্নহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ি করিয়া লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম, একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়িতে উঠি। কে তখন জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। আলিপুরে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হুকুম লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাড়িতে উঠিলাম।

তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কর্মচারীগণের হাতে সমর্পিত হই। জেলে ঢুকিবার আগে আমাদের স্নান করায়, জেলের পোষাক পরাইয়া পিরান, ধুতি, জামা সংশোধিত করিবার

জন্য লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়, আমিও আমার নির্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।

আমার নির্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ-ছয় ফুট প্রস্থ ছিল; ইহার জানালা নাই; সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে সান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর। বিচারপতি বা জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাহাদের নির্জন কারাবাসের দণ্ড নির্ধারিত হয়, তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়।"

শুরু হল আলিপুরের মামলা। বন্দীর সংখ্যা অগণিত।

মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে বোমার কারখানা আবিষ্কারের সঙ্গে তৎপর পুলিসবাহিনীর বেড়াজাল ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। গভীর জলের তলা থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলে নিয়ে এল বিপ্লবীদের। কলকাতায় যাঁদের হাতে লোহার শিকল পড়ল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস বা কানুনগো, ইন্দুভূষণ রায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, পরেশ মৌলিক, বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি। এছাড়া বন্দী আছেন মেদিনীপুরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর ছোট ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বসু,

উপেন্দ্রনাথ ঘোষের ছেলে যোগজীবন ঘোষ, হারাধন মল্লিকের জমিদার বাড়ির গৃহশিক্ষক শরৎচন্দ্র সিংহ।

খুলনা থেকে গ্রেপ্তার হলেন সুধীর সরকার। শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচং থেকে বীরেন সেন ও তাঁর ছোট ভাই সুশীল সেন। সব মিলিয়ে ৩৭ জন। আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির এজলাসে আরম্ভ হল মামলার প্রাথমিক তদন্ত। সেদিন ছিল ১৯০৮-এর ১৯শে মে।

বন্দীদের বিরুদ্ধে বহুতর অভিযোগ, গুরুতর অপরাধের। ১২১-এর ক ধারা অনুযায়ী তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সম্রাটের বিরুদ্ধে। তারপর ৩০২ ধারায় নরহত্যা। ১২৪ এর ক ধারায় রাজদ্রোহ। বিনা লাইসেন্সে বে-আইনী বন্দুক বোমা রাখা, ষড়যন্ত্র পাকানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

মামলা যখন জমেছে, তখন চলবে কিছু দিন। তার জন্যে টাকা চাই। কে দেবে ? অরবিন্দের বোন সরোজিনী দেবী জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানালেন। সাধারণের দানে ভরে উঠল টাকার ঝাঁপি। শেষ পর্যন্ত উঠল প্রায় ২০ হাজার টাকা।

আসামীপক্ষের মামলা পরিচালনার সবচেয়ে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণকুমার। সেই মহাদুর্যোগের দিনে কৃষ্ণকুমারের অন্তহীন উৎসাহ উদ্দীপনায় বিবরণ পাই তাঁরই 'আত্মচরিতে'।

"মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী সে সময়ে উগ্রপন্থীদলের একজন নেতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি বিনা পয়সাতেই মোকদ্দমা করিতে স্বীকার করিবেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমি টাকা চাই না, কিন্তু আমার সহকারী ব্যারিস্টারদিগকে টাকা দিতে হইবে।' তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, ১১,০০০ টাকা দিলে হাইকোর্ট পর্যন্ত আর কিছু দিতে হইবে না। তিনি তাঁহার জামাতা মিঃ বি. কে. লাহিড়ী প্রভৃতি চারিজন জুনিয়র ব্যারিস্টারকে তাঁহার সহকারী পদে বরণ করিলেন।

আলিপুরে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। তিনি কিংবা তাঁহার কোন সহকারী কেহই উপস্থিত হইলেন না। ১১,০০০ হাজার টাকা দেওয়ার পর হাতে আর কিছুই ছিল না। অপর কাহাকে নিযুক্ত না করিলে আসামীদের কষ্টের সীমা থাকিবে না, ইহা মনে করিয়া আমি আলিপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বিশ্বাসের বাড়ি যাইয়া তাঁহাকে এই মোকদ্দমা লইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আলিপুরের গবর্নমেন্ট-উকিল ছিলেন। আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাকে গবর্নমেন্ট এই মোকদ্দমা পরিচালনের ভার অর্পণ করেন নাই; সুতরাং তিনি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মত হইবেন ইহাই মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, গবর্নমেন্টকে না জানাইয়া এই মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য হইবে না। গবর্নমেন্ট পক্ষে যদি তাঁহাকে নিযুক্ত না করা হয়, তিনি নিশ্চয়ই আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিবেন। কয়েকদিন পর আশুবাবু আমাকে বলিলেন গবর্নমেন্ট পক্ষে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। হাতে টাকা ছিল না, বিনা পয়সায় কোন ব্যারিস্টার কি কোন উকিলকে পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া আলিপুর ফৌজদারী আদালতের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত নীলকান্তবাবুকে প্রতিদিন কুড়ি টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলাম। তিনি অন্য সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ মোকদ্দমা পরিচালনে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। তিনি অতিশয় সততা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কর্তব্যকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন আলিপুরের মোক্তারদের লাইব্রেরীতে যাইয়া সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতাম এবং মোকদ্দমার সমস্ত খবর লইতাম, কিন্তু কোন দিনই কোর্টে যাই নাই।

আসামীদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেবল নরেন্দ্র গোস্বামীর পিতা দেবেন্দ্র গোস্বমী ব্যতীত কেহই মোকদ্দমার খবর লইতেন না। নরেন গোসাঁই সিটি স্কুলে পড়িত। আমি তাহাকে পড়াশুনায়

অমনোযোগী বলিয়া ভৎর্সনা করিতাম। দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী কলেজ স্কোয়ারের সন্নিকটবর্তী পটুয়াটোলা লেনে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার পুত্রের খবর লইবার জন্য প্রায়ই সিটি স্কুলে যাইতেন, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি মোকদ্দমার সম্বন্ধে আমার সহিত প্রায় প্রতিদিনই পরামর্শ করিতেন। কয়দিন পরে দেখিলাম তিনি আর নিয়মিতরূপে আদালতে উপস্থিত হন না। আমার সঙ্গে দেখা হইলেও কথা বলেন না। কেহ কেহ আমাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে তাঁহার পুত্র রাজসাক্ষী হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সত্য সত্যই নরেন্দ্র গোসাঁই রাজসাক্ষী হইয়াছিল।...একমাত্র আমি মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিতেছিলাম, হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে পুলিস আসিয়া আমার বাসা তল্লাস করিল। মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য কে কত টাকা দিয়াছে, আমার বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা, ইহার সন্ধান করিবার জন্যই পুলিস আসিয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাইল না। কিন্তু পুলিস খাতাপত্র সব লইয়া গেল। আমি নানক চরিত লিখিতেছিলাম তাহার হস্তলিপি লইয়া গেল। পুলিস সে খাতাপত্র ও নানকচরিত আর ফিরাইয়া দেয় নাই। কিন্তু খাতাপত্র দেখিয়া বুঝিয়াছিল কোন বড়লোক এই মোকদ্দমায় সাহায্য করেন নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই যে দুই চারি টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতেই প্রায় ১১,০০০ টাকা হইয়াছিল।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গের জন্য আমার প্রাণে এমন ব্যথা হইয়াছিল যে আমি অধিকাংশ সময় বঙ্গদেশকে একত্র করিবার জন্য পরিশ্রম করিতাম। অরবিন্দদের সহায় আর কেহ ছিল না। অরবিন্দের শ্বশুর ভূপালচন্দ্র বসু মহাশয় গবর্নমেণ্টের চাকুরী করিতেন। চাকুরী ত্যাগ করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমি

রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন আমিও বিপ্লবী দলভুক্ত।

৮ই ডিসেম্বর আমি ধৃত হই। আমি বুঝিয়াছিলাম ভাল ব্যারিস্টারের অভাবে অরবিন্দের মোকদ্দমা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে না। ৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টের অ্যাটর্নি আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ধন্নূলাল আগরওয়ালার আপিসে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ধন্নূলাল ইতঃপূর্বেই এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত অনেক কাজ করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম, অরবিন্দের পক্ষে ভাল সমর্থন হইতেছে না। একজন ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিতেই হইবে। চিত্তরঞ্জন দাশ ভাল ব্যারিস্টার বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি অরবিন্দকে খুব শ্রদ্ধা করেন। এখন এমন ব্যারিস্টারই চাই যিনি উৎসাহের সহিত এই মোকদ্দমা পরিচালনের ভার লইতে পারেন।

সরোজিনীর হাতে এখন ৬,০০০ টাকা আছে। এই টাকা লইয়া চিত্তরঞ্জন দাশ শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন কিনা তাহা জানিয়া আইস। তৎক্ষণাৎ হাইকোর্টে যাইয়া চিত্তরঞ্জনের সাক্ষাৎ করিয়া ধন্নূলাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চিত্তরঞ্জন ৬,০০০ হাজার টাকা লইয়াই মোকদ্দমা চালাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত ভবিষ্যতে যে টাকা সংগৃহীত হইবে তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে।

আমি তাহাতেই রাজি হইলাম। সেই দিনই চিত্তরঞ্জনকে ৬,০০০ টাকা দেওয়া হইল। পরদিনই আমার নির্বাসন দণ্ড হয়। পরে ভাবিয়াছিলাম যদি ৭ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশকে নিযুক্ত করা না হইত, তবে আমার অভাবে অরবিন্দের বোধহয় মুক্তি হইত না।

চিত্তরঞ্জন দাশ এই মোকদ্দমা করিয়াই যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনিও যশস্বী হইতে পারিতেন না, এবং বাঙলার এক রাজনৈতিক দলের নেতা হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না।”

কৃষ্ণকুমার কথিত কাহিনীর সবটাই হয়তো অভ্রান্ত নয়। যে

বয়সে তিনি নিজের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে এ কাহিনী তাঁর মেয়েকে মুখে মুখে বলেছিলেন, তাতে তথ্যের কিছু অসঙ্গতি থেকে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। একথা বলা এই জন্যে যে আলিপুর মামলায় চিত্তরঞ্জনের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমরা অন্যত্র যে বিবরণ পাই তা অন্যরকম। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' আমাদের যে তথ্য পরিবেশন করে তাতে জানা যায়, চিত্তরঞ্জনই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন এই মামলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে। তখন ওরিজিন্যাল বিভাগে তাঁর পসার বেশ জাঁকালো। মফঃস্বলে না গিয়েও শুধু কলকাতায় বসে মাসে ৫,০০০ হাজার টাকা রোজগার করছেন। এই মোকদ্দমায় মাথা গলালে এতে তাঁর ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তবুও তিনি পরাঙ্মুখ নন। কারণ অরবিন্দ তাঁর দলের লোক। তার উপর অরবিন্দের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা। এই প্রসঙ্গে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সাক্ষ্য—

"অরবিন্দবাবুকে চিত্তই বারোদা পরিত্যাগ করিয়া বাঙলার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এবং এই মোকদ্দমা করিবারও চিত্তের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তবে অরবিন্দবাবুর শ্বশুর ভূপালবাবু তাঁহার বন্ধু ব্যোমকেশবাবুকে নিযুক্ত করিবারই বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন। চিত্তের কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"I should not commit the charge of the case of my son-in-law to a younger counsel." কিন্তু কিছুদিন পরে যখন চক্রবর্তী আসিলেন না, তখন ভূপালবাবু ও কৃষ্ণবাবু উভয়ে আমাকেই অনুরোধ করেন 'এইবার চিত্তবাবুকেই ধরা যাক।' আমি অতঃপর চিত্তের কাছে গিয়া বলিবামাত্রই তিনি সানন্দে এই মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করেন।"

যেদিন থেকে মামলার মধ্যে জড়ালেন নিজেকে, সেদিন থেকে এই মামলাই হয়ে উঠল চিত্তরঞ্জনের ধ্যানজ্ঞান। বিরামহীন ব্রত যেন।

জজ বীচক্রফ্‌ট ক্রিকেট খেলতে আসতেন 'নাটোরের রাজবাড়ীতে, জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। আলিপুর মামলার সময় প্রায়ই দেরি হত তাঁর আসতে। জগদীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করতেন, এতো দেরি কেন? বীচক্রফ্‌ট হেসে বলতেন, 'একথা তোমাদের চিত্তকে বল, দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সে আর উঠতে দেয় কই?' অরবিন্দ আজীবন মিতভাষী। চিত্তরঞ্জনের এই নিরতিশয় নিষ্ঠা ও শ্রমে অভিভূত হয়ে একদা অরবিন্দ বলেছিলেন—"আমার উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

৪ঠা মে। সোমবার। আলিপুরে অস্থায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির এজলাসে স্বীকারোক্তি দেবার সময় বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলেন। বিস্মিত হল সবাই এই অভাবিত ঘটনায়। স্বীকারোক্তি দেবার আগে দু-পক্ষে টানাটনি কানাকানির অন্ত ছিল না। একদিকে পুলিস, তারা চায় বিপ্লবীদের পেট থেকে সমস্ত কথা টেনে বার করতে। আর একদিকে বিপ্লবীদের কেউ কেউ, তারা চাইছে সরকার যেন ছিঁটে ফোঁটাও জানতে না পারে তাদের গুপ্তসমিতির কথা। দুই পক্ষের হাতে দুটি অস্ত্র। পুলিসের হাতে মাদুলি। বিপ্লবীর হাতে টোটকা চিকিৎসা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকেই সেই উপভোগ্য কাহিনী শোনা যাক্।

উপেন্দ্রনাথ লিখছেন—"ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রামসদয়বাবু আমাদিগকে দিদি-শাশুড়ীর মতো আদরযত্ন করিয়া তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের মতো মাদুলি বাহির করিয়া বলিলেন যে, তিনি খ্যাতনামা সাধক কমলাকান্তের বংশধর; আর ঐ মাদুলির মধ্যে কমলাকান্তের সর্ববিঘ্ন-বিনাশন পদধূলি বিদ্যমান। আমাদের মাথায় সেই মাদুলিটি ঠেকাইয়া আশীর্বাদ করিয়া কখনও বা কাঁদিয়া কমলাকান্তের বংশধরটি আমাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মতো সুহৃদ আমাদের আর ত্রিভুবনে

নাই। তিনি নিজে আমাদের কাজকর্মের সহিত গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন। তবে কি করেন, পেটের দায় ইত্যাদি।…”

এই হল মাতুলি-অস্ত্রের মহিমা। এবার দেখা যাক উল্টো দিকের টোটকা চিকিৎসা। হেমচন্দ্র লিখছেন—“আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হয়েছিল কি করে বারীন্দ্রকে দেশের এ হেন উৎকট মঙ্গল করবার ব্যাধি হতে মুক্ত করা যেতে পারে। যে এক টোটকা ব্যবস্থা করেছিলাম তা একেবারে ব্যর্থ হল।

কিন্তু তার সেজদার নাম করে কিছু বললে তা রাখতে পারে, এই আশায় তার বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম—অরবিন্দবাবুর সহিত আমাদের পাঁচজনের দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে যারা confession দিয়েছে তাদের বিশেষতঃ বারীনের সঙ্গে দেখা হলে যেন বলে দি, তারা যা-কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে তা যেন প্রত্যাহার (retract) করে। কারণ উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে আসামীর পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও উচিত নয়।…Retract করলে স্বীকারোক্তির দোষ খণ্ডে যায়। এতেও বারীন ভিজল না। তখন বলেছিলাম, বিবেচনা করে দেখা উচিত, তার এ-রকম স্বীকারোক্তি দেশদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে পারে কি না।

এই না শুনে বারীন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যা বলেছিল, তার মর্ম হচ্ছে—সে এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করছে তা বোঝবার ক্ষমতা সেজদা বা উকিলের নাই। আমরা সব ভীরু কাপুরুষ। ‘অরবিন্দ এসব কি বোঝে ?’ এই রকম অনেক কিছু শোনবার পর বারীন অন্যের নাম প্রকাশ করল কেন, তা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, সে মিথ্যে কথা বলতে আমাদের মতো অভ্যস্ত নয়।”

বারীন্দ্রর স্বীকারোক্তির পিছনে প্রধানত দুটি কারণ, তা তিনি নিজেই বলেছেন। এক, “আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া অপরাধ

স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে।"

দুই, "আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।"

স্বীকারোক্তি দেবার সময় বারীন্দ্র নরেন গোসাঁই-এর নাম বলেছিলেন। নরেনকেও জেলে ভরা হল। ঘটনা হিসেবে সামান্য। কিন্তু শুধু এই নরেন গোসাঁইকে ধরিয়ে দেওয়ার ফলে, যা হতে পারতো ঈষৎ আলোড়ন, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তাইই হয়ে উঠল বিশাল বিস্ফোরণ। নরেন গোসাঁই গুপ্ত সমিতির মরা আগুনকে জাগিয়ে দিয়ে গেল সন্ত্রাসবাদের মারমুখো অগ্নিকাণ্ডে।

নরেন শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জমিদার পরিবারের ছেলে। বিলাস-ব্যসনে লালিত। অসংযমী, উচ্ছৃঙ্খল। হঠাৎ-জাগা ভাবের ঘোরে দেশপ্রেমিক বা বিপ্লবী হতে গিয়েছিল। জেলখানায় এসে, বনের পাখি খাঁচার মধ্যে যেমন করে, তেমনি উড়ে যাবার জন্যে অবিশ্রান্ত তার ডানা ঝাপটানি।

যে কোন উপায়ে উদ্ধার তাকে পেতেই হবে, এই গারদখানার আবদ্ধ জীবন থেকে। প্রমাণ করবে যে স্বীকারোক্তিতে সে যা বলেছে তা মিথ্যে, পুলিস নির্যাতন করে তাকে দিয়ে এই সব বলিয়েছে। ওদিকে নরেন্দ্রের বাবা প্রায়ই আসেন জেলখানায়। সঙ্গে একজন মোক্তার। কি ব্যাপার? না মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় করে নরেন্দ্রকে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে।

বেশ তো, নরেন যদি বাঁচে তো বাঁচুক না, কার আপত্তি। দলের অন্যান্যরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। দিন যায়। আর ক্রমশ দলের লোকদের চোখে পড়ে নরেন মাঝে মাঝেই গোপনে কি সব কথাবার্তা বলে ঐ বদমায়েস ডিটেকটিভ শামসুল আলমের সঙ্গে। তারপর দেখা গেল নরেন মাঝে মাঝেই দলের লোকের কাছে

নানারকম গোপন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। কারা কারা গুপ্ত সমিতিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে? বাইরে কোথায় কোথায় দলের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে? সমিতির সঙ্গে বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কারা কারা জড়িয়ে আছে? ইত্যাদি। কেন, নরেনের হঠাৎ এমন জ্ঞান পিপাসা জেগে উঠল কেন? তা ছাড়া রোজই শামসুল আলমের সঙ্গেই বা এত কিসের প্রেমালাপ?

দলের লোকেরা একদিন সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, কি ব্যাপার হে, রাজার চরের সঙ্গে দিনরাত অত খাতির কিসের?

নরেন স্বীকার করলে, রাজার চরেরা তাকে রাজসাক্ষী বানাতে চাইছে।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি উত্তর দিলেন?

নরেন বললে, কি বলবো! আমি গুপ্ত সমিতির কি জানি যে ওদের মনের মতো উত্তর দেব।

অরবিন্দের 'কারাকাহিনী'তে রয়েছে এই ঘটনার ক্রমবিকাশের বৃত্তান্ত।

"তাহার কিয়ৎদিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম, ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে Identification Parade-এর সময় আমার পার্শ্বে গোসাঁই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, "পুলিস কেবলই আমার নিকটে আসেন।" আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, "আপনি এই কথা বলুন না কেন যে স্যার আন্দ্রু ফ্রেজার গুপ্তসমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

গোসাঁই বলিলেন, "সেই ধরনের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আমাদের head এবং তাঁহাকে একবার বোমা দেখাইয়াছি।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?" গোসাঁই বলিলেন, "আমি—দের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। এই ধরনের

আরও অনেক খবর দিয়াছি। ব্যাটারা Corroboration খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরুক। কে জানে এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইতেও পারে।" ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "এই নষ্টামি ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকি করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।"...তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোসাঁই পুলিসের বশ হইয়া সত্যমিথ্যা তাহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন। একটা নীচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুষ্কর্মের দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মতো অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম গোসাঁইয়ের মন কিরূপ বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তারও পরিবর্তন হইতেছে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সর্বনাশ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন তাহার সমর্থন জন্য ক্রমে ক্রমে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting pshycological study প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না।"

এইভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন জেলখানার নিয়ম গেল বদলে। প্রত্যেক আসামীকে আলাদা আলাদা নির্জন কারাকক্ষ থেকে সরিয়ে এনে সকলকে এক সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করা হল। প্রতিদিনের অন্তরঙ্গ মেলামেশায় নরেনের গোপন চক্রান্ত একটু একটু করে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এমনকি নরেন সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে কোনদিন কি বলবে, তাও পর্যন্ত জানতে পারল তার সঙ্গীরা। এখন উপায়?

উপায় আবিষ্কার করলে কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বসু। তারা বললে, আমাদের দুটো রিভলভার দাও। আমরা ওর রাজসাক্ষী সাজার দফা রফা করে দি। সেটা কি ভাবে সম্ভব? কেন, আমরা ওকে গিয়ে বলবো, দেখ ভাই আমাদের আর এই নরক-যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমরাও রাজসাক্ষী হব। তুমি

শামসুল আলমকে বলে আমাদের খালাসের ব্যবস্থা কর। তার ফলে নরেন ভাববে আমরা তার আপনজন। অবাধে মেলামেশা করবে আমাদের সঙ্গে। তারপর একদিন কেল্লা ফতে।

গোপনে জেলখানার মধ্যেই রিভলভার যোগাড় করা হল। এরপর একদিন বানানো অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল কানাই। তাকে ভর্তি করা হল জেল হাসপাতালে। কদিন পরে সত্যেনও অসুস্থ হল। দুজনে মিলল পাশাপাশি বেডে। কানাই নরেন্দ্রকে জানাল যে সে অসুস্থ। কিন্তু নরেন্দ্রকে তার অনেক গোপন কথা বলার আছে। একবার যেন দেখা করে। পরবর্তী কাহিনী হেমচন্দ্রের কাছ থেকে শোনা যাক্।

"পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মতো তার শরীররক্ষক দু'জন য়ুরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির পাশে ডিসপেনসারীতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলভারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, সেজন্য নাকি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই নাকি নরেনকে তাক করে মারে। খট্ করে শব্দ হল, কিন্তু কার্তুজ আগুন দিলে না। সত্যেন পরমুহূর্তে জামার ভিতর থেকে রিভলভার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেন বোথাম নামক পূর্বোক্ত একজন য়ুরেশিয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডার রিভলভারটা ধরে টানাটানি করাতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জিটা ভেঙে যায়, কাজেই রিভলভার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোসাঁই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলি চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান করে ডিসপেন-সারীতে সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল। যাই হোক্ গুলি সামান্যভাবে পায়ের কোন স্থানে লেগেছিল। তাই সিঁড়ি নেবে হাসপাতালের ফটক পার হয়ে, দুপাশে দেয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভিতরে গিয়ে পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া

করেছিল। সত্যেন ডিসপেনসারী থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদীকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করছিল, নরেন কোথায় গেল? আঙুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিলে। সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে যোগ দেয়। দুজনেই গুলি চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলিতে কানাইয়ের গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছল। এ থেকে বোঝা যায়, সত্যেন যখন সেখানে যায়, তখনও নরেন জমি ধরে নি।

নরেন নাকি দু'একবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল। তারপর যথারীতি পাগলাঘন্টি, ভোম্বা, কর্মচারীদের লুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাই গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালাবন্ধ, খানাতল্লাসী ইত্যাদি সবই হয়েছিল।"

উপেন্দ্রনাথ লিখছেন—

"একটা পুরনো চোর ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সংবাদ দিল—

—নরেন গোসাঁই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি রে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু, কানাইবাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

ঐ দেখুন গে না, কারখানার সমুখে সে একদম লম্বা হয়ে পড়েছে। আর জেলার বাবুও আর একটু হলে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে খুব প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।"

হাতে পায়ে পড়ল লোহার শিকল সত্যেন ও কানাইয়ের। তারপর চলল হত্যাকাণ্ডের বিচার। বিচারে দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড।

মৃত্যুর কথা শুনেও মুখে একটা মৃদু রেখার কাঁপুনিও জাগলো না কারো। মরণ যেন তাদের শ্যাম। যেন মহাখুশীর ব্যাপার। এত খুশীর যে ফাঁসীর আগে ১৬ পাউণ্ড ওজন বেড়ে গেল কানাইয়ের। ফাঁসীর দিন সকালে তাকে যখন প্রহরীরা বধ্যমঞ্চে

নিয়ে যেতে এল, তখন দেখা গেল কানাই ঘুমে অচেতন। প্রশান্ত তার মুখশ্রী। কোথাও চিহ্নমাত্র নেই আতঙ্ক-উদ্বেগের। ফাঁসীর আগের দিন সন্ধ্যেয় জেলের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে চিরবিদায় চেয়ে নিয়েছে স্মিত হাস্যে। ফাঁসীর মঞ্চে এসে কানাই নিজের হাতে দড়ি পরীক্ষা করে বলেছিলেন, দড়িটা বড় কশা, এটাকে একটু মেজে দিতে পারলে ভাল হয়।

১৯০৮-এর ১০ই নভেম্বর। বাংলা ১৩১৫-র ২৫শে কার্তিক। আলীপুরের প্রেসিডেন্সী জেলে ফাঁসী হয়ে গেল কানাইলালের।

তারপর জেলখানা থেকে কালীঘাটের শ্মশান পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ, শুধু বুকের গভীর শোক থেকে উচ্চারিত মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্', শুধু পুষ্পবৃষ্টি, চন্দনকাঠের গন্ধ, শুধু আগুনের শিখা, চিতাভস্মের কণিকা সংগ্রহের জন্যে কাড়াকাড়ি, শুধু মানুষ আর মানুষ, মানুষের শোকের কান্না, কান্নার ভিতরে চিতার আগুনের শিখা।

সহযোগী কানাইলালের প্রতি উপেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলী—

"জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি; কানাই-এর মতো এমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মতো তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে।…প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসীর আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়েছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে, যাহা পতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়া যান নাই।

তারপর একদিন কানাইলালের ফাঁসী হইয়া গেল। ইংরাজ শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হইবারই কথা। কিন্তু ফাঁসীর সময় তাহার নির্ভীক প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষেরা বেশ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন।

তাহার গলায় ফাঁসীর দড়ি ঠিকমতো দেওয়া হয় নাই। এ জন্য প্রহরীকে ডাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি আসিয়া বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের হাতে এ-রকম ছেলে আর কতগুলি আছে।'

যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।"

এক শোক জুড়োতে না জুড়োতে আর এক শোক। বুকের মধ্যে আবার সেই জ্বলজ্বলে চিতার আগুন।

২১শে নভেম্বর। বাংলার ৬ই অগ্রহায়ণ। ফাঁসী হয়ে গেল সত্যেন্দ্রর। মৃত্যুর আগে সত্যেন্দ্র আহ্বান জানিয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীকে। তাঁর মুখ থেকে শাস্ত্রবচন শুনবে বলে। শিবনাথ তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন নি। সত্যেনের ফাঁসীর পর সরকার আইন করে মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা করা বন্ধ করে দিলে। সত্যেন্দ্র-অনুরাগীরা শয়ে শয়ে জেলখানায় জড়ো হয়েছিল তবু। তারা শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রর কুশপুত্তলিকা কাঁধে বহন করে নিয়ে এল পুণ্য গঙ্গাতীরে, শেষকৃত্যের জন্যে।

দুটি বীর জীবনের মহাপ্রস্থান।

বার বার বিচারক প্রশ্ন করেছিলেন কানাইলালকে, রিভলভার তুমি কোথায় পেলে?

কানাইলালের প্রত্যেকবারই একটি উত্তর।

"The spirit of Khudiram supplied me with the revolvers."

ক্ষুদিরামের আত্মাই আমার হাতে তুলে দিয়েছে মারণাস্ত্র।

মজঃফরপুরের আদালতে বিচারক প্রশ্ন করেছিলেন ক্ষুদিরামকে, 'তোমার মনে কোনরূপ ভয় আছে কি?'

ক্ষুদিরামের নির্ভয় উত্তর, 'কেন ভয় করিব?

'তুমি গীতা পড়িয়াছ?'

'হ্যাঁ, পড়িয়াছি।'

এই তো সেই কানাইলাল কথিত ক্ষুদিরামের আত্মা, যা মৃত্যুর চেয়ে অনেক মহীয়ান।

সেদিন তারিখটা ছিল ১১ আগস্ট। মজঃফরপুরের জেলখানায় সেদিন যে মৃত্যুহীন নাটকের একটি দৃশ্য অভিনীত হল, একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উপেন্দ্রনাথ সেনের বিবরণ—

"আমরা জেলের আঙিনার প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডান দিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসীর মঞ্চ। দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড বা আড় দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহার শেষ প্রান্তে একটা ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিস। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া কারাবরণকালীন বর্ধিত চুলগুলি আঙুল দিয়া বিন্যাস করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের দিকে আর একটিবার চাহিল। তারপর দৃঢ় পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসী লাগাইয়া দেওয়া হইল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ওদিক একটুও নড়িল না। উড্‌ম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নিচের দিকে

অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক মিনিট ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।"

না, তারপর সব স্থির নয়। তারপরেই তো প্রাণের স্পন্দন। মৃত্যুপণ রেখে দুঃসাহসীদের দুরন্ত অভিযান। তারপরেই তো কানাই-সত্যেনের শঙ্কাহীন আত্মদান।

চারিদিকের এই হত্যা, রক্ত, ফাঁসীর মঞ্চ বাংলার বাতাসে যখন একটা উদ্দাম ঝড়ের প্রস্তুতি করে চলেছে গোপনে, আলীপুরের আদালতে তখন চলেছে ঝড়-জাগানিয়াদের বিচার পর্ব। সেই বিচার পর্বে পা বাড়াবার আগে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বোমার মামলায় অরবিন্দ প্রভৃতিদের যেদিন জেলখানায় এনে ভরা হল, তারই কদিন পরে তিলকের কাগজ 'কেশরী'তে বেরুল দুটি প্রবন্ধ। 'The country's Misfortune' বা 'দেশের দুর্ভাগ্য' ১২ই মে'তে। 'These Remedies are not lasting' বা 'এই সব প্রতিকার স্থায়ী নয়' ৯ই জুনে। দুটি প্রবন্ধেই বৈদেশিক স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের পিঠে যেন বেতের চাবুক। 'কেশরী' সোজাসুজি বললে অপরিসীম রাজ-অত্যাচারই অনিবার্য রাজদ্রোহের মূল কারণ। রাজদ্রোহমূলক রচনার অপরাধে ২৪শে জুন তিলকের হাতে পড়ল হাতকড়ি। বিচারে ৬ বছরের কারাদণ্ড।

১৯০৮-এর ২৫শে মে। চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ পড়লেন তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ 'পথ ও পাথেয়'। কবি বললেন—

"আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, 'আমি ইহার মধ্যে নাই। এ কেবল অমুক দলের কীর্তি; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এসব ভাল হইতেছে না; আমি ত জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে।'

কোন আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে মনে হয়।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা।...বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালী জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমানমোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালীর মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া পারে নাই।

যাই হোক, যেমন করিয়াই হোক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুকরণে সঙ্কীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিতেছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।...এ পর্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয়ত

আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা হইতে কোন শুভফল প্রত্যাশা করিবার নাই ?

নাই এমন কথা আমি কখনই মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কি করিতে হইবে ? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে। যে পরিমাণ মদে ক্ষণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে, তাহার চেয়ে বেশী মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াই দেয়; যে সকল সত্যকর্মে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয়, এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ জিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মতো কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।"

ক্ষণকালের কাছে কবি সেদিন তুলে ধরেছিলেন চিরকালের দাবি। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর অরবিন্দও শুনিয়েছিলেন এমনি সাবধান বাণী। বলেছিলেন, সভ্যতা বিকাশের পথে ক্রূরতা একান্ত প্রবল অন্তরায়। নির্জন কারাবাস অরবিন্দকে যুগিয়েছিল সত্যদর্শনের অফুরন্ত সুযোগ। জেলখানা সেই কারণে তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল উপাসনার বেদী।

অরবিন্দের উপর সরকারী অভিযোগ, তিনি ষড়যন্ত্রকারী। নরেন

গোসাঁই তার সাক্ষ্যদানকালে অরবিন্দকে মুরারিপুকুরের গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে জুড়ে দেয়। তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী তরফের আক্রোশটা আরও উগ্রচণ্ডী হয়ে ওঠে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ছাড়া, সরকারী কৌঁসুলী মিঃ নর্টন অরবিন্দকে বোমা বানানো রাজদ্রোহীদের পাণ্ডা প্রমাণ করার জন্যে যে সব কাগজপত্রের উপর নির্ভর করেছিলেন; তাকে মোটামুটি ছ'ভাগে ভাগ করা যায়।

১। স্ত্রীকে লেখা চিঠি।

২। অন্যদেরকে লেখা চিঠি।

৩। বক্তৃতার রিপোর্ট।

৪। বন্দেমাতরমে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

৫। খানাতল্লাসীর সময় পাওয়া কাগজপত্র।

৬। মিঠাইয়ের চিঠি।

এর মধ্যে 'মিঠাইয়ের চিঠি'র উপরেই মিঃ নর্টন জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। ভরসা ছিল এতেই অরবিন্দকে ষড়যন্ত্রের সাত পাকে জড়াবেন। চিত্তরঞ্জন সে-ভরসার ভরাডুবি ঘটালেন।

'মিঠাইয়ের চিঠি' অরবিন্দকে লেখা বারীন্দ্রর একটা ইংরেজী চিঠি। লেখা ছিল—

প্রিয় দাদা, এখনই সময়। হঠাৎ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্যে আমাদের ভারতের সর্বত্র মিঠাই প্রস্তুত রাখিতে হবে। আমাদের কনফারেন্সের জন্য ব্যবস্থা যাতে হয় তা দেখো। আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমার স্নেহের

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

মিঃ নর্টন বললেন,—মিঠাই মানে বোমা। কনফারেন্স মানে সুরাট কনফারেন্সের সময় বারীন্দ্র সেখানে গুপ্তসমিতির যে সভা ডেকেছিল গোপনে, সেটাই। বারীন্দ্রর সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ মানেই তাহলে অরবিন্দ বোমার দলের যুক্ত।

এই চিঠিকে জাল প্রমাণ করার জন্যে চিত্তরঞ্জনকে প্রায় আহার-নিদ্রা ছাড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সার্থক হল তাঁর শ্রম। চিত্তরঞ্জন ১১টি যুক্তি উপস্থিত করলেন আদালতে।

১। চিঠিখানা যে সময়ে লেখা, তখন দুই ভাই স্থরাটে। তাহলে চিঠি লেখার কি প্রয়োজন ছিল?

২। বারীন্দ্র যে সুরাটে গিয়াছিল তার কোন প্রমাণ কেউ দেন নি।

৩। বারীন্দ্র অরবিন্দকে সব সময়ের ডাকেন 'সেজদা'। এখানে Dear Brother লিখবে কেন?

৪। চিঠিতে পুরো বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লেখা কেন? বারীন্দ্র লিখলে হয় লিখতেন বারীন কিংবা বারী।

৫। এমন একটা চিঠি অরবিন্দ নষ্ট না করে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মেনে নেওয়া অসম্ভব।

৬। বারীন্দ্রর মতো শিক্ষিত ব্যক্তি কখনো 'এমার্জেন্সী' বানান ভুল লিখতে পারে না।

৭। চিঠিখানির প্রাপ্তি সম্বন্ধে যত সাক্ষী, তত মত।

৮। খানাতল্লাসীর সাক্ষী অমরনাথ পুলিসের গোয়েন্দা।

৯। সাক্ষ্যদানের জন্যে তাকে ডাকা হয় নি কেন?

১০। প্রয়োজনে পুলিস-গোয়েন্দারা এ রকম জাল চিঠি তৈরি করে থাকে।

১১। এই জাল করার কাজ শরৎ গোয়েন্দার।

স্ত্রীর চিঠিতে অরবিন্দ লিখেছিলেন—'মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হলে ছেলে কি করে?

মিঃ নর্টনের মত, এই তো ষড়যন্ত্রের গন্ধ।

চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যা, অরবিন্দ শুধু উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন পরাধীনতা কতটা দুর্বিষহ।

বন্দেমাতরম্-এর প্রবন্ধগুলো রাজদ্রোহকর। প্রমাণ করার জন্যে

কোমর বাঁধলেন নর্টন। চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করলেন অরবিন্দ Passive Resistance-এর প্রচার ছাড়া ঐসব প্রবন্ধে আর কিছুই বলেন নি।

এইভাবে একে একে সরকারী পক্ষের সমস্ত অভিযোগ তীব্র ভাষা, তীক্ষ্ণ যুক্তির ধারে টুকরো টুকরো করলেন চিত্তরঞ্জন। যখন সব কথা বলা হয়ে গেল তখন উপসংহারে বিচারক ও এসেসারদ্বয়ের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন তাঁর অবিস্মরণীয় আবেদন।

—এবার আপনারা দেখুন অরবিন্দের বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ।

"This is the evidence of the toy revolution by which a brilliant mind of so great intellectual powers wanted to subvert British Government."

"এখন আপনাদের সমক্ষে আমার নিবেদন এই, যে অপরাধে এই ব্যক্তি অভিযুক্ত, মনে করিবেন না যে তিনি কেবল আপনাদের সম্মুখেই এই আদালতে অভিযুক্ত, মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণেও তাঁহার বিচারভার নির্দিষ্ট আছে। আপনাদের বিচার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বাদবিসম্বাদ নীরব হইবার অনেক পরে, এই উদ্বেলতা ও সংক্ষুব্ধ আন্দোলন থামিবার অনেক পরে, মহাকাল আসিয়া ইহার স্থূলদেহ ধ্বংস করিবার পরেও, লোকে তাঁহাকে স্বদেশ প্রেমের কবি, মহামানবপ্রেমিক ও জাতীয়তা উদ্বোধনের গুরুরূপে পূজা করিবে। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পরে, বহুপরেও তাঁহার বাণী কেবল ভারতে নহে, সুদূর মহাসাগরের পরপারেও ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে। তাই আমি বলি এই আদালতেই তাঁহার বিচার হইতেছে না, স্বাধীনতার ইতিহাসের উচ্চতম ধর্মাধিকরণও একদিন ইহার ন্যায় বিচার করিবেই করিবে। এইবার আপনার বিচারাদেশ বিবেচনা করিবার ও (এসেসারদ্বয়ের প্রতি) আপনাদের মতামত প্রদানের মুহূর্ত সমাগত। বিচারপতি, ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে সর্বোজ্জ্বল অধ্যায়টি ইংরাজ বিচারকগণের ন্যায়পরায়ণতায়

অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার দোহাই দিয়া, মহত্বের শাশ্বত আদর্শের দিকে চাহিয়া, ইংরাজের বিচারক সংসদ হইতে যে সমস্ত শত সহস্র সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম নীতিসূত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদের নামে, যে সমস্ত বিচারক পণ্ডিতগণ অপরাধীর বিচার বিধানে ও ন্যায়ের ব্যবস্থাপনে দণ্ড নির্দেশ করিয়াই কেবল ক্ষ্যান্ত থাকেন নাই, পরন্তু জনসাধারণের শ্রদ্ধাও অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামে নিবেদন করিতেছি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক মহিমান্বিত কথা স্মরণ করাইয়া নিবেদন করিতেছি যে এ কথা যেন ভবিষ্যতে কেহ না বলিতে পারে যে এই বিচারের সময় একজন ইংরাজ বিচারক ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। আর আপনাদের (এসেসারদ্বয়ের প্রতি) কাছেও আমার নিবেদন যে অরবিন্দ যে আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিয়াছে, তাহার নামে, আমার মাতৃভূমির শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনীতির ধারার কথা স্মরণ করাইয়া আমি নিবেদন করিতেছি যে, ভবিষ্যতে এমন কোন সমালোচনায় যেন আমাদের ইতিহাস কলঙ্কিত না হয় যে দুইজন স্বদেশবাসী ভ্রান্ত সংস্কার ও পক্ষপাতিত্বের প্রভাবে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আপনাদের বিচারবুদ্ধির অবমাননা করিয়াছিল।"

এই আবেদনের প্রায় একমাস পরে ১৯০৯-এর ৬ই মে বিচারপতি মিঃ বীচক্রফ্‌ট রায় দিলেন—

"Taking all the evidence together I am of opinion that it falls short of such proof as would justify me in finding him guilty of so serious a charge." অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, মিঃ নর্টনের নাগপাশ থেকে। নর্টনের অভাবিত পরাজয়ে সেদিন উল্লসিত হয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু কেউ যদি ব্যথিত হয়ে থাকে সে একজনই। এবং তাঁর নাম অরবিন্দ। 'কারাকাহিনী'তে রয়েছে নর্টন-চরিত্রের বহুপৃষ্ঠাব্যাপী রসসমৃদ্ধ বিবরণ-বিশ্লেষণ।

"কৌন্সিলী নর্টন মাদ্রাজী সাহেব, সেই জন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিস্টারমণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেইজন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচারণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে হিংস্রস্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কিনা বলিতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন—সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পরিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায় সাক্ষী ও জুনিয়ার ব্যারিস্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত।…সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। এই অর্থ ব্যয় বৃথা হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি যাহাতে না হয়, নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছেন।—

হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্সপীয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপীয়র ছিলেন নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপীয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপীয়র সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, নর্টন সাহেব ভালমন্দ সত্যমিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অনো অনীয়ান্, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর Suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর Plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপীয়র, ডেফো

ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন।

নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise lost-এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের Plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man. আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পিতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, —অরবিন্দ ঘোষ।

তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।…

সেসন আদালতে আমি নির্দোষী প্রমাণিত হইলে নর্টন কৃত Plot-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিলেন।"

বীচক্রফ্‌ট-এর রায়ে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের উপর ঘোষিত হল মৃত্যুদণ্ড। অরবিন্দ তখন আসামীর ডকে দাঁড়িয়ে, যখন রায় পড়ে শোনান হচ্ছে। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। দু চোখে তখন অবিরল অশ্রুধারা।

এগিয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন। শোকের ক্ষতে দিলেন সান্ত্বনার প্রলেপ।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বারীন্দ্রকে আমি খালাস করিয়া উহাকে খুব ভাল কাজে লাগাইব।'

চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সত্যিই রদ হল তাঁদের মৃত্যুদণ্ড। তার বদলে নির্বাসন। জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন অরবিন্দ।

বাংলাদেশ তখন নেতৃশূন্য। বিপিন পাল চলে গেছেন বিলেতে। বাংলাদেশের ন'জন নেতাকে বিনা বিচারে বিনা অপরাধে বন্দী করে পাঠানো হয়েছে নির্বাসনে। এই ন' জনের মধ্যে আছেন বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের তরুণ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, ঢাকার কর্মী ভূপেশচন্দ্র নাগ, নবশক্তির সম্পাদক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, 'বন্দেমাতরমে'র অন্যতম সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ছাত্র-নেতা শচীন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাস।

ওদিকে তিলক মান্দালয় জেলে অন্তরীণ।

চারিদিকে ঘন গাঢ় স্তব্ধতা। নরমপন্থীরা প্রায় নিশ্চুপ। চরম-পন্থীরা বিচ্ছিন্ন। নেতৃত্বহীন যুবশক্তি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে নিজেদের বিদ্রোহ ঘোষণার ভার। গোপন পথে তারা সংগ্রহ করে বোমা বারুদ, বন্দুক রিভলভার। তারপর তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, রুদ্ধ বেদনা খুঁজে খুঁজে বেড়ায় কে কোথায় গুপ্তচর, কে কোথায় দেশপ্রেমিকের শত্রু, কে কোথায় বুনছে মৃত্যুর ফাঁদ মৃত্যুঞ্জয়ীদের গলায় পরাবে বলে। যখন খুঁজে পায় কাউকে, তখন জীবন তুচ্ছ, মৃত্যুই মহোত্তম শান্তি। যখন খুঁজে পায় তখন তাদের মুঠোয় ঝলসে ওঠে ইন্দ্রের বজ্র।

১৯০৮-এর ৭ই নভেম্বর। কলকাতার ওভারটুন হলে জনসভা। বক্তা ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার। ফ্রেজার যখন বক্তৃতায় বাঙ্ময়, ঠিক সময়ে জিতেন্দ্রনাথ রায় হাত দিলেন তাঁর রিভলভারের ঘোড়ায়। প্রবল পরাক্রান্ত রাজকর্মচারীদের হত্যা করতে হবে, এই ছিল সেদিন যাঁদের মৃত্যু-পণ, কলেজের ছাত্র জিতেন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম সঙ্গী। কিন্তু সেদিন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল দুর্ভাগ্য।

তাই তিন তিন বার ট্রিগার টানা সত্ত্বেও রিভলভারের মুখ দিয়ে আগুন বেরোল না। মঞ্চে ছোটলাটের পাশে বসেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব। তিনি দেখতে পেলেন ফ্রেজার হত্যায় উদ্যত জিতেন্দ্রনাথকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেষ্টায় ধরা পড়লেন জিতেন্দ্রনাথ। বিচারে দশ বছরের দ্বীপান্তর।

১৯০৯-এর ফেব্রুয়ারী। আলিপুর কোর্ট থেকে ফিরছেন নিজের বাড়িতে পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাস। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি ছিলেন কুখ্যাত নর্টনের সহকারী। বাড়ি ফেরার পথে অকস্মাৎ আততায়ীর বন্দুকের গুলি এসে বিঁধল তাঁর পাঁজরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। সেই সঙ্গে ধরা পড়লেন হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসু। হাওড়ার হিতবাদী প্রেসের কর্মী। রোগা দড়ি পাকানো চেহারা। ডান হাতটা ভাঙা। সেই ভাঙা হাতের সঙ্গে বন্দুকটা ছিল শক্ত করে বাঁধা। ট্রিগার টেনেছিল বাঁ হাতে। বিচারের দিন আদালতে দাঁড়িয়ে বললে,—এত বিচার করার কি আছে। পারলে আজ না হয় কাল আমার ফাঁসী দেওয়া হোক। এতো জানা কথাই যে আশু বিশ্বাস আমার হাতে মরবে। আর আমার ফাঁসী হবে। বিচারে ফাঁসীই হল তার।

১৯১০-এর ২৪শে জানুয়ারী। গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস ইনস্‌পেকটার ডাক্‌সাইটে শামসুল আলম্ আলিপুর বোমার মামলায় নিজের পারদর্শিতা দেখিয়ে হয়েছেন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট। হাইকোর্টের কাজ সেরে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। হাতে ফাইলপত্র। পিছনে দেহরক্ষী কনস্টেবল। এই সময় এক যুবক তাঁর মুখের সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে,—Are you Shamsul Alam ?

উত্তর এল,—yes.

সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির হাতের বন্দুক উঠল গর্জে। নিমেষেই শামসুল আলমের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল আদালতের সিঁড়িতে।

১৯ বছরের সেই যুবকটির নাম বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল হেস্টিংস ষ্ট্রীটে অশ্বারোহী পুলিসের হাতে। বিচারে সেই একই শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুর দিনেও তার মুখে অমলিন হাসি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,—কি খেতে চাও। মৃত্যুপথযাত্রী তার উত্তরে বলেছিল,—কচুরী, সন্দেশ আর রসগোল্লা। বীরেন্দ্রই বটে এরা সব!

বীরেন্দ্রর বিচারকালে এই হত্যার সঙ্গে সংস্রব রয়েছে বলে গ্রেপ্তার করা হল যতীন মুখোপাধ্যায়কে। বাংলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী স্যার হেনরী হুইলরের স্টেনোগ্রাফার। পুলিস চেষ্টার কোন কসুর করে নি তাঁকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়াতে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে জাল্ কেটে বেরিয়ে গেলেন যতীন্দ্র।

এই সেই যতীন্দ্র, পরবর্তীকালে বুড়িবালামের তীরে ইংরেজের বিরুদ্ধে যিনি ঘোষণা করেছিলেন সশস্ত্র সংগ্রাম। বাঙালীর 'বাঘা যতীন'।

সন্ত্রাসবাদের এই বিস্ফোরণ শুধু বাংলাদেশের মাটিতেই আটকে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে, উড়িষ্যায়, রাজস্থানে, মাদ্রাজে, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। কোথাও তা ক্ষুদ্র, কোথাও রুদ্র। কিন্তু আলোড়ন সর্বত্র। সর্বত্রই কে আগে মাতৃভূমিকে উৎসর্গ করবে তার আপন জীবন তারই প্রাণপণ প্রয়াস, গোপন প্রস্তুতি।

এই প্রস্তুতি শুধু ভারতবর্ষের মাটিতেই আটকে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে ইংরেজের আপনদেশেও। এর প্রথম প্রধান উদ্যোক্তা শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা। 'র‍্যাণ্ড অ্যাণ্ড আয়ার্স্ট' হত্যাকাণ্ডের ফলে বোম্বাই যখন বিপন্ন, শ্যামজী সেই সময় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে। ১৯০৫-এ তিনি ইংল্যাণ্ডে বসেই ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে ঘোষণা করলেন ৬টি স্কলারশিপ। যারা ইংল্যাণ্ডে এসে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্যে। বছরে পাবে ১০০০ টাকা।

এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। একদল শিক্ষিত উচ্চচিন্তা-সম্পন্ন যুবকদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তোলা, যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে প্রচার ও আন্দোলন। প্রচারের জন্যে তিনি বের করলেন একটা কাগজ। নাম 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট'। আন্দোলনের জন্যে গড়লেন একটা সমিতি। নাম 'ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি।' শ্যামজীর দলে প্রথম যিনি ভর্তি হলেন তাঁর নাম বিনায়ক সাভারকার। তিলকের চিঠি নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে তিনি পৌঁছলেন ইংল্যাণ্ডে।

দিনের পর দিন 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' কাগজে যে সব মারাত্মক লেখা বেরুত সেগুলো রাজদ্রোহমূলক, বিপজ্জনক এই ভেবে ভারতসরকার তার ডাক-বিভাগকে জানিয়ে দিলে ঐ কাগজের প্রত্যেকটি সংখ্যাকে যেন নষ্ট করে ফেলা হয়। শ্যামজী তখন কাগজের চেহারাটাকে পাল্‌টে দিলেন। কাগজ ছাপা হতে লাগল চিঠির আকারে। দেখতে দেখতে টনক নড়ল ইংল্যাণ্ডের হাউস অব কমন্‌স-এরও। সেখানে প্রস্তাব উঠল, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা নামের লোকটা যে দিনের পর দিন ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তি গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামজী ইংল্যাণ্ডের পাততাড়ি গুটিয়ে প্রস্থান করলেন প্যারিসে। সাভারকার তখনও ইংল্যাণ্ডে। এবার তিনিই হলেন সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের নেতা। বই লিখলেন মাৎসিনীর ওপর একটা। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের ওপর আরেকটা। গড়লেন নিজের সমিতি—'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটি'।

তার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করতে হত এই বলে—"ঈশ্বরের নামে, ভারতমাতার নামে এবং পূর্বপুরুষগণের নামে শপথ গ্রহণ করছি। আমরা অনুভব করেছি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন আমাদের ভারতভূমি জগৎসভায় তার সম্মানের আসন ফিরে পাবে

না। আমরা আরও অনুভব করেছি, এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্তক্ষয়ী অন্দোলন ও ক্ষমাহীন সংগ্রাম ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভারতমাতার মস্তকে স্বরাজ-এর মুকুট পরিয়ে দেবার জন্যে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবো, এবং এই সমিতির প্রতি থাকবো অনুগত। যদি এই প্রতিজ্ঞার কোন একটি অংশ বা সবটার প্রতি আমি কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করি, আমার শাস্তি হবে মৃত্যু। বন্দেমাতরম্।"

প্যারিস থেকে সাভারকার বহু চেষ্টায় যোগাড় করলেন ২০টা ব্রাউনিং অটোমেটিক বন্দুক। পাঠালেন বোম্বাইয়ে, ভাই গণেশের কাছে, চোরা পথে। সেই বন্দুক হাতে পৌঁছবার আগেই বোম্বের পুলিস গ্রেপ্তার করলে গণেশকে। অভিযোগ 'উদ্দাম স্বদেশী কবিতা' রচনার। সেই সময়ে তাঁর ঘর তল্লাসী করে পাওয়া গেল ৬০ পাতার টাইপ করা কাগজ। কি করে বোমা বানাতে হয় তার বিস্তৃত বিবরণ এবং ৪৫টি স্কেচ রয়েছে সেই কাগজে। ঠিক এরই একটা কপি পাওয়া গিয়েছিল কলকাতার মুরারীপুকুরে।

বিচারে গণেশের শাস্তি হল নির্বাসন। সেদিন ছিল ১৯০৯-এর ৯ই জুন। এই নির্বাসনের সংবাদ এসে পৌঁছল ইংল্যাণ্ডে। আর ইংল্যাণ্ডবাসী ভারতীয় ছাত্র মদনলাল ধিংড়ার কানে। মদনলাল, সাভারকারের প্রিয় অনুগামী, সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলে এর প্রতিশোধ সে নেবে একজন ক্ষমতাবান রাজকর্মচারীকে বধ করে।

১৯০৯-এর ১লা জুলাই। ইংল্যাণ্ডবাসী ভারতীয় ছাত্র-যুবকদের উদ্যোগে ডাকা হয়েছিল 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' বাৎসরিক সভা। সেই সভাতেই অতর্কিতে মদনলালের গুলীতে নিহত হলেন স্যার কার্জন উইলী। ভারতসচিবের সহকারী। তাঁর কাজ ছিল ইংল্যাণ্ডবাসী ভারতীয় ছাত্ররা যাতে ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে না ওঠে, তার ওপর কড়া চোখের পাহারা দেওয়ার। ধরা পড়ার পর

বিচারের দিন আদালতে দাঁড়িয়ে ২২ বছরের যুবক মদনলাল দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালে—

"You can do whatever you like with me. I shan't mind. I told yot before when you asked the question, you are all-powerful now, you white people, and can do whatever you like. But remember, we shall have our time in time to come."

বিচারক যেদিন তাঁর মৃত্যুদণ্ড পাঠ করে শোনাচ্ছেন, সেদিন মদনলালের মুখে প্রশান্ত স্মিত হাসি। বিচারকের উদ্দেশ্যে মদনলাল শুধু বললেন—

"Thank you, my Lord, for my country I thank you. I am proud to have the honour of laying my humble life for my country."

সাভারকার তাঁর প্রচারপত্র 'বন্দেমাতরম'এ মদনলালের দুঃসাহসিকতাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন—"Young India has once more shown her hand and the world is lost in wonder and admiration The scene of action is transferred from Bengal to England." বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডুর ভাই। বিলেতে বেরোয় তাঁর নিজের কাগজ। নাম 'তলোয়ার'। সেই কাগজে ছেপে বেরোল মদনলালের ছবি। ঠিক যেমন মদনলালের বাবা মা ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মদনলালের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ঘোষণা করলে বীরেন্দ্রর পরিবারবর্গ।

১৯১০-এ গ্রেপ্তার হলেন সাভারকার। অভিযোগ একাধিক। প্রথমত নিষিদ্ধ পিস্তল ও প্রচারপত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোককে পাঠানো। দ্বিতীয়ত ইণ্ডিয়া হাউসের কয়েকজন লোকের সহ-যোগিতায় বোমার তৈরী প্রণালী টাইপ করিয়ে ভারতবর্ষে

পাঠানো। 'তৃতীয়ত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গুরুগোবিন্দ সিং-এর স্মৃতি সভায় উত্তেজিত ভাষণ যাতে শিখজাতিকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আহ্বান জানানো হয়।

এবং সর্বোপরি রয়েছে তাঁর 'বন্দেমাতরম্' প্রচারপত্র, যার প্রত্যেকটি পাতায়, প্রত্যেকটি অক্ষরে বিদ্রোহের আগুন।

বন্দী সাভারকারকে যখন ভারতবর্ষে নিয়ে আসা হচ্ছে, মার্সেলেসের কাছে জাহাজ থেকে পালাবার চেষ্টা করলেন তিনি। সাঁতরে ১০-১২ গজ পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়ে গেলেন। ওদিকে প্যারিসে তখন সাভারকারকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। এর উদ্যোক্তা হলেন দুজন ভারতীয়। একজন সেই শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা। আরেকজন মাদাম কামা́। ভারতীয় পার্শী মহিলা। আজীবন সুখে লালিতা। শিক্ষিতা, স্বামী সলিসিটার। জীবনে কোনদিন সন্ত্রাসবাদের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। কিন্তু প্যারিসে তিনিই এখন ভারতবর্ষের বিপ্লব-প্রচেষ্টার একজন সক্রিয় সমর্থক ও সংগঠক।

এ এক বিস্ময়কর কাল।

এর একদিকে সাম্রাজ্য শক্তির রোষকষায়িত দৃষ্টি। কোষ-নিষ্কাশিত তরবারি। অন্যদিকে নির্যাতীত প্রাণের অস্থি-মজ্জার ভিতরে রুদ্রের প্রচণ্ড আবির্ভাব। এ এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস।



'আলম চাচা, মাত্র তিনটে বোমা ফেটেছে। তাতেই মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। এ রকম অনেক ফাটবে, সাবধান।'

এই কথাটির বক্তা বারীন্দ্রকুমার। শ্রোতা কুখ্যাত গোয়েন্দা শামসুল আলম।

স্থান আলিপুর আদালত।

বারীন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে ধামা চাপা দেবার জন্যে ইংরেজ শাসকরা সেদিন একই সঙ্গে ছুটো মহৎ কাজে হাতে দিয়েছিলেন। তার প্রথমটা হল যাঁরাই নেতৃস্থানীয় তাঁদেরকেই নির্বাসনে পাঠানো। দেশ নেতাহীন হলে বিদ্রোহের আগুনে পড়বে ভাঁটা। শুকিয়ে যাবে যৌবন-জল-তরঙ্গের স্রোত।

দ্বিতীয়টা হল মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। এর ফলে ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যা কিছু বাড়ল। আর শুরু হল সম্প্রদায়গত নির্বাচনের ব্যবস্থা। নির্বাচকমণ্ডলীকে ভাগ করা হল চার ভাগে। সাধারণ মানুষ, জমিদার, মুসলমান ও বিশেষ শ্রেণী। যদি নামে কোথাও হিন্দু বা মুসলমান নেই, আসলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ-বিদ্বেষটাকে বাড়িয়ে তোলার এটা হল একটা ব্রহ্মাস্ত্র।

এ ছাড়াও আছে কিছু কিছু বদান্যতার দান, শাঁস খেয়ে আঁশ

দেওয়ার মতো। যেমন ১৯০৯-এ বড়লাটের শাসন পরিষদে গ্রহণ করা হল সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে। আর বিলেতের প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যপদ দেওয়া হল পাটনার ব্যারিস্টার সৈয়দ আমির আলিকে।

গোড়া যেমন কাটাই ছিল তেমনি রইল কাটা। মাঝে মাঝে চলল আগায় জল ছিটানো। এই করে ইংরেজ প্রভুরা ভাবলে এবার ওদের কপালের ঘাম শুকোবে, জুড়োবে হাড়মাসের জ্বালা।

কংগ্রেস করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো মর্লি-মিণ্টো সংস্কারকে। মদনলাল ধিংড়ার হত্যাকাণ্ডকে অর্বাচীনের কাণ্ড বলে নিন্দা করলেন গোখলে। তবু সন্ত্রাসবাদের আগুন নিভলো না।

সারা ভারতবর্ষে চলেছে রাজনৈতিক ডাকাতি, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এত নির্যাতন-নির্বাসনেও তাকে মারা যাচ্ছে না টুঁটি টিপে। এর কারণ কি? সুরেন্দ্রনাথ মডারেট। কিন্তু একেবারে শীতলরক্তের মানুষ নন। সরকারী নজরে বেশ কিছুটা বিপজ্জনক মডারেট। তাই হয়তো অনেকবারই তাঁকে নির্বাসনে পাঠানোর কথা ভাবতে হয়েছে সরকারকে। তিনি বললেন—"এর জন্যে দায়ী তোমাদের স্বৈরাচারী শাসন।"

"বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণের মনে অলক্ষ্যে বৈপ্লবিক ভাবের আবির্ভাব হয়েছিল। অরাজকতা কেউই পছন্দ করে না। হত্যা যে উদ্দেশ্যেই সাধিত হোক না কেন কিংবা যে নামেই অভিহিত হোক্ না কেন—সব সময়েই ইহা গুরুতর অপরাধ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সময়ে সরকারী দমননীতির ফলে দেশের তরুণ মনে যে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছিল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের তা ভুললে চলবে না।"

অরবিন্দ জেলে বসে শুনেছিলেন মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের কথা। জেল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জনসভায় তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে জানালেন যে চোদ্দ বছর বিলেতে বাস করে ইংরেজ চরিত্রের হাড়-হদ্দ তাঁর

চেনা। কোন খেলো জিনিস বাজারে চালাবার সময় ইংরেজেরা সেটাকে ঝকমকে মোড়কে মুড়ে দেয়।

১৯০৯-এর সেপ্টেম্বরে হুগলীতে প্রাদেশিক সম্মেলন। দুদিন ব্যাপী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় 'মর্লি-মিণ্টো সংস্কার' প্রস্তাব। মডারেটরা চায় এটাকে গ্রহণ করতে। জাতীয়তাবাদীদের নেতা অরবিন্দ চান এটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মত ছুঁড়ে দিতে। যদিও সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-কাহিনীতে স্বীকার করে গেছেন "মর্লি-মিণ্টো প্রবর্তিত শাসন সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্যমাত্র অগ্রগতি আনিয়াছিল। কেহই ইহাতে অসামান্য কিছু দেখে নাই; কারণ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে ইহা বেসরকারী সভ্যদের জনস্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা দিয়াছিল।"

তবুও সেদিনের সম্মেলনে মডারেটদের দাবি, প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু ভোটে জয় হল অরবিন্দ ও তাঁর সমর্থকদের, বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে। তখন মডাটেরা ভয় দেখালে এই প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তাহলে তারা কনফারেন্স ত্যাগ করবেন। অরবিন্দ তখন চাইছেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসে যা হয় হোক, প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যাতে সবাই কাজ করুক একযোগে। অরবিন্দ স্থির করলেন প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন প্রস্তাব উঠবে, তাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন না। তিনি প্রস্তাব গ্রহণের সময় সভা ত্যাগ করলেন। নীরবে তাঁকে অনুগমন করল তাঁর সমর্থকেরা। প্রস্তাব গৃহীত হল বটে, কিন্তু মডারেটদের অনেক পাকা মাথা অনেক মাথা চুলকেও বুঝতে পারলেন না প্রকাশ্য রাজনীতির জগতে নবাগত অরবিন্দের প্রভাব এতখানি প্রবল হল কি করে।

১৯০৯-এর বাংলায় অরবিন্দের প্রভাব সত্যিই প্রচণ্ড। তিনি তখন একাই একশো। এবং সেই হিসেবে ইংরেজ সরকারের এক নম্বর শত্রু।

তাই যখনই কোথাও একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে অমনি সরকার পক্ষ তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার প্যাঁচ কষতে থাকে।

লণ্ডনে ১৯০৯-এর ১লা জুলাই মদনলাল ধিংড়ার গুলীতে ভারতসচিবের সেক্রেটারী কার্জন উইলী নিহত হলেন। কলকাতায় ছোটলাট বেকার সাহেব চোখ রাঙালেন সমস্ত ভারতবাসীকে। এই খুনের জন্যে, তাঁর মতে, প্রত্যেকটি ভারতবাসীই দায়ী। এবং এর জন্যে তাদের প্রত্যেককে শাস্তি পেতে হবে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এই হত্যাকাণ্ডকে নিন্দা জানিয়ে সভা-সমিতি হয়। বেকার সাহেব তাতেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বললেন শুধু মৌখিক নিন্দা জানালে চলবে না। প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে হতে হবে সরকারের সহযোগী। নইলে দোষী-নির্দোষী নির্বিশেষে চলবে ভয়াবহ অত্যাচার।

প্রতিবাদ জানালেন অরবিন্দ, তীব্র ভাষায়।

যে দেশের আইন প্রণয়নে সে দেশের মতামত নেওয়া হয় না, যখন খুশী যে রকম খুশী আইন পাস করিয়ে নেয় নিজেদের স্বার্থে, দেশবাসীর কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্স কিভাবে খরচ হবে সে সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার যে-দেশবাসীর কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেখানে সরকার কোন সাহসে প্রত্যাশা করে যে দেশবাসী তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

ধিংড়া হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে জোরালো নিন্দা সেদিন যাঁর গলা থেকে বেরিয়েছিল, তিনি মহামতি গোখলে। পুণার বক্তৃতায় তিনি নিন্দাচ্ছলে আরও ঘোষণা করলেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতার প্রত্যাশা করা নিছক পাগলামি।

জেল থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ দুখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করেছিলেন। বাংলার নাম 'ধর্ম'। ইংরেজীর নাম 'কর্মযোগীন'।

কর্মযোগীনে গোখলেকে আক্রমণ করে অরবিন্দ লিখলেন এক ধারালো শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ। নাম Exit Vibhishan. সেই

প্রবন্ধের মর্মার্থ হল—"গোখলে হলেন ন্যায়পরায়ণ বিভীষণ। মাদ্রাজ ও এলাহাবাদের ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকেরা হলেন সুগ্রীব, অঙ্গদ আর হনুমান; ভারতসচিব লর্ড মর্লি (যিনি বিলাতের রাজনীতিতে চরম সংস্কারপন্থী কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক) হলেন রামের অবতার। ধর্মপরায়ণ বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; এবং রাম বিভীষণ অঙ্গদ, হনুমান মিলেছেন জাতীয়তাবাদী রাক্ষসদের নিধনের জন্যে।"

দুহাতে লেখা, আর পাঁচ মুখে বক্তৃতা এই সেদিন অরবিন্দের দিনরাতের কাজ। বক্তা ছিলেন না। নেতৃত্বহীন বাংলাদেশ তাঁকে বক্তা করে তুলল। আজ বিডন স্কোয়ারে, কাল কুমারটুলীতে। এ মাসে বরিশালের ঝালকাঠিতে ও মাসে হাওড়ায়।

এতদিন অরবিন্দ ছিলেন একা। জুলাইএর মাঝামাঝি নিবেদিতা আবার ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় ভারতবর্ষে, প্রাণের কলকাতায়। পাশ্চাত্য-বাসের কালেও তাঁর মন পড়েছিল ভারতের দিকে। নিবেদিতার জীবনীকার মুক্তিপ্রাণা লিখছেন—

"স্বদেশী আন্দোলনের দমননীতি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ঘটনার ফল কি হইবে তাহা সুদূর ইংলণ্ডে বসিয়াও তিনি কল্পনা করিতে পারিলেন। ইহার পর যখন সংবাদ আসিল, শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হইয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্বেগের সীমা রহিল না। দেশের মুক্তি সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের তদানীন্তন একনিষ্ঠ সাধনা শ্রীরবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় নিবেদিতারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে পূর্ব হইতেই ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যও স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নিবেদিতা অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত বসুর (জগদীশচন্দ্র) ইংল্যাণ্ডের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতার আহ্বান আসিতেছিল। নিবেদিতাও পূর্ব হইতে স্থির করিয়াছিলেন, ঐ সঙ্গে

আমেরিকায় গমন করিয়া পুনরায় তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন।...

আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা শেষ করিয়া শ্রীযুক্ত বসু সস্ত্রীক ইংলণ্ড ফিরিলেন মার্চ মাসে। মে মাসের শেষে তাঁহারা য়ুরোপ গমন করেন।...২রা জুলাই...তাঁহারা মার্সেলিস হইতে ভারতগামী জাহাজে উঠিলেন।

১লা জুলাই লণ্ডনে স্যার কার্জন ওয়াইলীকে এক পাঞ্জাবী যুবক হত্যা করে। এ হত্যার জন্যও কেহ কেহ নিবেদিতাকে প্রকারান্তরে দায়ী করিয়াছেন—অর্থাৎ পাশ্চাত্যে দুই বৎসর অবস্থানের সময় তিনি যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়াছেন, এ হত্যা তাহারই পরিণাম। এ সম্বন্ধেও কল্পনা ব্যতীত কোন প্রমাণ নাই। ভারত প্রত্যাবর্তনের পথে মিসর হইতে ৭ই জুলাই নিবেদিতা লেখেন, 'লণ্ডনে স্যার কার্জন ওয়াইলীর নিদারুণ হত্যার সংবাদে আমরা স্তম্ভিত। কাগজে লিখিয়াছে, ঐ ব্যক্তির সহিত হতভাগ্য বালকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল; সুতরাং হত্যার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত। আমাদের মার্সেলিস যাত্রার রাত্রেই ঘটনাটি ঘটিয়াছে। যাহা হউক সংবাদটি অত্যন্ত দুঃখের, এবং ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া আমরা যাত্রা করিতেছি।'

১৬ই জুলাই তাঁহারা বোম্বাই উপকূলে অবতরণ করিলেন। ১৮ই জুলাই দীর্ঘ দুই বৎসর পরে নিবেদিতা তাঁহার প্রিয় বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলেন।"

কলকাতায় ফিরেই নিবেদিতা বাঁধা পড়লেন কাজের বাঁধনে। নিজের হাতে গড়া স্কুলকে আবার খাড়া করে তুলতে হবে। তার ওপর লেখাজোখার কাজ প্রচুর। তিনখানা বই চলেছে লেখা। ১। The master as I saw him. ২। Foot falls of Indian history. ৩। Studies from an Eastern Home. এ ছাড়া আছে মর্ডান রিভিউ, স্টেটস্‌ম্যানের নিয়মিত প্রবন্ধ, আছে

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' নামে বাংলা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদের সংশোধন, আছে আনন্দমোহন বসুর জীবনীর সম্পাদনা। কাজের চাপে শরীর ভেঙে পড়ার উপক্রম করলে পুজোর ছুটিতে সেবার দার্জিলিং গেলেন অবসর যাপনে। সেইখানেই দেখা চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে। হাতের রাঙা গোলাপটি চিত্তরঞ্জনের কোটে লাগিয়ে দিয়ে নিবেদিতা তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন অরবিন্দের মুক্তির জন্যে তিনি যে অসম্ভব দায়ভাগ তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, তারই সম্মানে। বললেন—

'আমি আপনাকে মহৎ বলিয়াই জানতাম। কিন্তু আপনি এত মহৎ তাহা জানিতাম না।'

নিবেদিতাকে ফিরে পেয়ে অরবিন্দ যেন ফিরে পেলেন তাঁর চিন্তার জগতে একজন দোসর। নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আসা যাওয়া বাড়ল অরবিন্দের। বাড়ল ঘনিষ্ঠতা।

ওদিকে সরকারী গোয়েন্দাদের ধূর্ত চাউনীও বেড়ে চলেছে অরবিন্দের সমস্ত গতি-বিধির উপর।

'এই সাক্ষাৎকালেই একদিন তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে, সরকার আমাকে নির্বাসন দেওয়া স্থির করিয়াছেন।'

নিবেদিতার পরামর্শ, আপনি ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করুন।

অরবিন্দর উত্তর,—না। যাবো না। আমি দেশবাসীর সামনে আমার যা বলার তা বলবো একটা 'খোলা চিঠি'তে। গবর্নমেণ্ট তাতে বুঝবে যে আমাকে নির্বাসনে পাঠালেও দেশবাসীর কাছে থাকবে আমার দেওয়া কর্মসূচী। সেই অবস্থায় আমাকে বন্দী করলে সেটা গবর্নমেন্টের স্বার্থের প্রতিকূলেই যাবে। তখন ওরা নির্বাসন বাতিল করে দেবে।

তাই হল। ৩০শে জুলাইয়ের 'কর্মযোগীন'-এ অরবিন্দ প্রকাশ করলেন তাঁর খোলা চিঠি। বিশাল চিঠির উপসংহারে লিখলেন নিচের কর্মসূচী।

১। আইন অমান্য না করে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে স্বাবলম্বন-নীতি ও অহিংস বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিতে স্থির থাকা।

২। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না অসহযোগিতা তা নির্ণয় করার মূলনীতি হবে No Control, No Co-operation. অর্থাৎ সত্যিকারের অধিকার পাওয়া গেলে সহযোগিতা, আর যতদিন সত্যিকার পাওয়া যাবে না ততদিন অসহযোগিতা।

৩। জাতীয়তাবাদীদের নিজস্বনীতি বিসর্জন না দিয়ে যখনই সম্ভব হবে তখনই মডারেটদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা। দেশের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

৪। গভর্নমেন্টের উপর সত্যিকারের চাপ পড়ে, এবং গভর্নমেন্টের আর্থিক শোষণ যাতে অবাধ না হয় সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে বয়কট নিয়ন্ত্রিত করা।

৫। জাতীয় আদর্শ অনুসারে সমগ্র দেশকে বর্তমানে সম্ভব না হলেও অন্তত প্রদেশগুলিকে সুব্যবস্থিত করার চেষ্টা করা।

৬। সমিতিগুলি বে-আইনি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আইন বাঁচিয়ে কর্মীদের সংগঠনমূলক কাজ করে যাওয়া।

একবার নয়, আরও একবার লিখতে হল এ রকম খোলা চিঠি।

দ্বিতীয়বারের খোলা চিঠিতে ফুটে বেরুল তাঁর ক্ষোভ।

সারা দেশে গড়ে উঠেছে একটা ভীষণ পাপচক্র। সরকার চালিয়ে চলেছেন নির্যাতন। তার ফলে বিপ্লবীরা ছুঁড়ছে বোমা পিস্তল। তাদের বোমা ছুঁড়তে দেখে সরকারী নির্যাতন হয়ে উঠেছে আরও নির্দয়। তার প্রতিবাদে বিপ্লবীরা হয়ে উঠেছে আরও দুর্বার, দুর্দান্ত। এই পাপ কর্মের শেষ কোথায়, কিভাবে?

অরবিন্দ দু পক্ষকেই কিছুটা বিবেকবান হবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তখন একপক্ষ কানে দিয়েছে তুলো, কোন সৎ কথা শুনবে

না। আরেকপক্ষ পিঠে বেঁধেছে কুলো। যতই আক্রমণ নির্যাতন আসুক না কেন, তারা দুর্জয়।

১৯১০-এর গোড়ার দিকে আবার গুজব রটল অরবিন্দকে নির্বাসন দেওয়া হবে। অরবিন্দ তাঁর কর্মযোগীন-এ লিখলেন "আমাদের পুলিস বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে। এইবার নয় জন নহে, চব্বিশ জনকে। পুলিসের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখনো বুঝিতে পারি নাই, নির্বাসন এমন কি ভয়ংকর জিনিস যে লোকে নির্বাসনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য, কর্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিহারপূর্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে।…২৪ জনকে নির্বাসন করুন বা ১০০ জনকে নির্বাসন করুন; অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন বা সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে নির্বাসন করুন—কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

১৯১০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী। অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নির্বাসিত ৯ জন নেতাকে সরকার দিলে মুক্তি। তাঁরা ফিরে এলেন কলকাতায়। নিবেদিতা তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে নিজের স্কুলকে সাজালেন তোরণদ্বারে কলাগাছ, মঙ্গলঘাট বসিয়ে। স্কুলের মেয়েরা করলে মাঙ্গলিক উৎসব।

এরই কদিন পরে ঘটল শামসুল আলম্ হত্যাকাণ্ড। পুলিস ভাবলে অরবিন্দের সমর্থন রয়েছে এর পিছনে। সহযোগী রামচন্দ্র মজুমদার একদিন এসে অরবিন্দের কানে কানে বললেন,—দু-এক-দিনের মধ্যেই তল্লাসী শুরু হবে 'কর্মযোগীন'-এর আপিসে। সেই সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

তারপর মাত্র দশমিনিট সময় কেটেছিল সিদ্ধান্ত নিতে। দশ-মিনিটের মধ্যেই অরবিন্দ নিজের অন্তরের ভিতরে শুনতে পেলেন দৈবাদেশ—'চন্দননগরে যাও'। ঘাটে নৌকো তৈরী হয়েছিল।

অরবিন্দ চন্দননগরে চলে গেলেন রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ; ব্রিটিশ-ভারত পরিত্যাগ করে। তাঁর অবর্তমানে 'কর্মযোগীন'-এর দায়িত্ব এসে পড়ল নিবেদিতার উপর।

নিবেদিতা 'কর্মযোগীনে' লিখলেন—

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম সাম্রাজ্য-সমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে এবং আজিকার দিনে উহারই নাম জাতীয়তা।

আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ়-সংবদ্ধ, আর তাহার সামনে জ্বলজ্বল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা আমার নিকট আইস। আমায় তোমার করিয়া লও।"

সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সময় বুঝেছিল অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থানের পিছনে রয়েছে নিবেদিতার সাহায্য। সুতরাং নিবেদিতার নামও পুলিসের খাতায় উঠেছিল বিপ্লবী সন্দেহে। এবং নিবেদিতা এ সংবাদ পেয়েছিলেন যাঁর কাছ থেকে তিনি তখন ভারত ভাগ্য-বিধাতার সহধর্মিনী অর্থাৎ লেডী মিন্টো। এবং লেডী মিন্টোর চেষ্টাতেই নিবেদিতার উপর থেকে পুলিসী নেকনজর কিছুটা হ্রাস করা হয়।

সবই একটু একটু করে হ্রাস পাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। বিপ্লবের উত্তেজনা আসছে ঝিমিয়ে। মাঝে মাঝে ইতঃস্তত যা কিছু ঘটছে, তা বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টা। নেতাহীন দেশ। নীতিহীন আন্দোলন। এইভাবেই চলেছে মাস গড়িয়ে বছর।

তারপর মিণ্টো গিয়ে হার্ডিঞ্জ যেদিন ভারত ভাগ্যবিধাতারূপে ভারতে পদার্পণ করলেন, সেদিন অনেকেরই বুকে উথলে উঠেছিল আশার ঢেউ। এবার বোধ হয় একটা কিছু হবে। মনের মতো ঘটবে একটা কিছু। মডারেটদের আশা আরও একটু মাত্রা ছাড়িয়ে। তারা ভেবে বসলে নতুন বড়লাটকে ঠিক মতো বোঝাতে পারলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

হার্ডিঞ্জের পা পড়ল কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সভায় বিপুল অভিনন্দনের আয়োজন। নিবেদন-পন্থীদের প্রথম নৈবেদ্য।

তার কদিন পরে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার। বিশাল জনসভা। স্থান টাউন হল। কিসের জন্যে সভা?

হার্ডিঞ্জের কানে খবর পৌঁছতেই ডেকে পাঠালেন সুরেন্দ্র-নাথকে।

আপনারা সভা ডাকছেন টাউন হলে?

হ্যাঁ।

কিসের জন্যে সভা?

বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে বাঙালীর মত কি সেটা আপনাকে জানানোর জন্যেই সভা ডাকা।

এর জন্যে সভা করার কি দরকার। আপনারা একটা চিঠিতেই তো আপনাদের মতামত জানাতে পারেন।

আপনি নিজে যদি সে চিঠি পড়েন, এবং বাংলাদেশের জন-নায়কদের ডেকে তাদের মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আর সভা করার কোন প্রয়োজন হবে না।

হ্যাঁ, আমি তাই করব। সে সম্বন্ধে রাজকর্মচারীদের মতামত কি তা অবগত হব।

রাজকর্মচারীরা তো তাঁদের মতামত বহুবার জানিয়েছেন। বাংলার জননায়করা কি বলেন সেটাই আপনার অবগত হওয়া প্রয়োজন।

আমি রাজি।

মন জুড়ালো মডারেটদের। বাতিল হল টাউন হলের সভা।

ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারের সঙ্গে বসে স্থরেন্দ্রনাথ খাড়া করলেন আবেদন পত্রের খসড়া। সেটা পাঠানো হল বাংলার জেলায় জেলায়, নেতাদের সই সংগ্রহের জন্যে।

২৫শে জুন। ১৯১১ সাল। লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে দাখিল করা হল আবেদন পত্র। হার্ডিঞ্জ ছুমাস সেটা নিয়ে ভাবলেন, বুঝলেন। তারপর ২৫শে আগস্ট বিলেতে ভারতসচিবের কাছে পাঠালেন ডেসপ্যাচ। তাতে সুপারিশ করলেন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থাটা সত্যিই বাতিল করা প্রয়োজন। লর্ড ক্রু তখন ভারত-সচিব। বিচক্ষণ লোক। কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভূপেন্দ্রনাথ বস্থকে বিলেতে পাঠালেন ক্রু-র সঙ্গে আলোচনার জন্যে। ভূপেন্দ্র-নাথ ক্রু-র ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন এই বলে যে, বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করলে দেশের চেহারা হয়ে উঠবে আরো অগ্নিগর্ভ। ওদিকে বিলেতেও ছিলেন কিছু ভারত-সুহৃদ। স্যার হেনরী কটন, মিঃ হার্বাট পল, কেয়ার-হার্ডি, নেভিনসন, ব্লান্ট, হিনড্‌ম্যান এঁরাও ভারত-সচিবকে বোঝালেন, বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করলে ভারতবর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বিপ্লব ক্রমশ হয়ে উঠবে বহ্নিমান।

ক্রু মত দিলে বঙ্গভঙ্গ আইন বরবাদে।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর। সস্ত্রীক সম্রাট পঞ্চম জর্জ এসেছেন ভারত-ভ্রমণে। ঐ দিন দিল্লীতে তাঁর দরবার। সেই দরবার থেকে ঘোষণা করা হল—"সমস্ত বঙ্গ অখণ্ড থাকিবে, কিন্তু বিহার উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে। এবং ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে।"

কৃষ্ণকুমারের আত্মচরিতে পাই সেই উৎকণ্ঠা-পূর্ণ ঐতিহাসিক দিনের স্মৃতি।

"১২ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা

রাজা কি ঘোষণা করেন তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। দরবার আরম্ভ হইবার তিন চার ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তবু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোন সংবাদ না আসাতে সকলে অধীর হইয়া বলিতেছিল রাজা বুঝি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। যদি তাই হয় তবে আমরা নিরাশ হইব না। আরও তীব্র তেজে আন্দোলন করিব। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হইবে এই সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। তখন কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট সভা হইল। সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিলেন।

কেহ কেহ বলেন 'দিল্লীতে রাজধানী উঠিয়া গেল, বিহার ও উড়িষ্যা বাংলাদেশ হইতে পৃথক হইল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইল।' কিন্তু উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম বাঙ্গালা একত্র করিবার জন্য বাঙ্গালী যে পণ করিয়াছিল সেই পণ পূর্ণ হইল ইহা শুনিয়া সহস্র লোক বন্দেমাতরম্ বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।"

দিল্লীর খবর যখন তারযোগে কলকাতায় এসে পৌঁছল সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজের আপিসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বিশাল জনসভার আয়োজন, কলেজ স্কোয়ারে। সে-সভার অন্যতম প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ।

তিনি লিখেছেন—"সেই রাত্রে সভাস্থল থেকে প্রসন্নচিত্তে আমি এই চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরলাম যে, বাংলার একতা বজায় রাখবার যে চেষ্টা আমরা এতদিন করেছিলাম তা অবশেষে সফল হল।"

সফল কিছুটা হল বটে, কিন্তু সকলেই সেদিন প্রসন্ন নয়। রাজধানী বদলের সিদ্ধান্তে অনেকেই রুষ্ট, ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ। তার মধ্যে শুধু যে বাঙালীরাই রয়েছে তা নয়, রয়েছে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী মহল, রয়েছে হার্ডিঞ্জের আপন দেশের শ্বেতাঙ্গরাও।

স্টেট্‌সম্যান সরাসরি দাবি জানাল, রাজধানী বদলের ব্যাপারে

যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন, তার জন্যে দায়ী লোকটিকে এখুনি বরখাস্ত করা হোক।

কাগজে কাগজে চিঠি, প্রতিবাদপত্র, কবিতা, কার্টুনের, যেন শেষ নেই। একটা কার্টুনের চেহারা ছিল এই রকম। শূন্য রাজ-ভবন। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা, পরিধানে ছেঁড়া কাপড়, মলিন মুখে খোঁচা দাড়ির গোছা। পাশে একটা প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, খালি কুঠি, ভাড়াটে চাই। প্রতিবাদ শুধু কলকাতার কাগজেই নয়। সাগরপারের দেশেও। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' লিখলে, "এ রকম জবরদস্তি ঘটনা বোধ হয় রাশিয়াতেও সম্ভব নয়।"

সে যাই হোক, বঙ্গ-ভঙ্গের অবসান হল। মডারেটরা মহাখুশী। কিন্তু বাংলাদেশের দাবি তখন আর 'বঙ্গভঙ্গ'র সীমানার মধ্যে আটকে ছিল না। বঙ্গভঙ্গের চেয়ে আরও বৃহৎ দাবিকে কিভাবে সফলকাম করা যায় তার চিন্তাতেই নেতৃত্বহীন বাংলার যুবসমাজ যেন এক নিদ্রাহীন তপস্যায় মগ্ন।

তাদের তপস্যা, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে।

তাদের স্বপ্ন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে।

তাদের সংগ্রাম, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে।

ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে সেই সংগ্রামের দীপ্ত, উজ্জ্বল, মহিমাময় যে কাহিনী পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে আঁকা হয়ে আছে, সেই সপ্তকাণ্ড মহীরুহের মূল শিকড় এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলাদেশকে দিয়েছিল মৃত্যুহীন প্রাণের হদিশ। তারই প্রেরণা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের সুবিশাল প্রান্তরে, সুমহান প্রাণে প্রাণে।

ইংরেজ শাসিত অধীনতার বিপুল অন্ধকারে স্বাধীনতাবোধের প্রথম প্রাণময় অগ্নিশিখা, প্রথম অনির্বাণ পঞ্চপ্রদীপের নাম—

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

———



ভাঙা শরীরে জোড়া লাগাতে আনন্দমোহন বসু গেছেন বিদেশে। দীর্ঘ দিনের একটানা পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন, মন ক্লান্ত। বিদেশ যাত্রার পথে পড়ল জার্মানী। সেখানে কাটল কিছুকাল। সেখান থেকেই চিঠি লিখলেন তাঁর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা দেবীকে। বিষয়, জাতীয় সংগীত।

স্বর্ণপ্রভা স্বামীর মতোই স্বদেশপ্রাণা। লিখতে পারেন কবিতা। গড়তে পারেন স্বদেশী কাজের সভা সমিতি।

আনন্দমোহন চিঠিতে লিখলেন—

"গানের গুরুত্ব অসীম। ন্যায়-নীতি গুরু-বাক্যের (sermons) চেয়ে তার শেখাবার ক্ষমতা অনেক বেশী। একেবারে হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছায়।

জার্মানী থেকে তোমাকে চিঠি লিখছি। তোমাকে অনায়াসে বলতে পারি যে জাতীয় সংগীত এই জাতটাকে বেঁধেছে এক সূত্রে। সেনাবাহিনীর চেয়ে এদের জাতীয় সংগীত অনেক বেশী গর্বের। আসলে এদের সেনাবাহিনীর দেশ-জোড়া প্রবল তেজস্বীতা এদের জাতীয় সংগীতের উত্তাপে গড়া।"

স্ত্রীর পত্রের শেষাংশে উৎসাহ মেশানো অনুরোধ। দেশকে জাগানো-বাঁচানো কাঁপানোর জন্যে তিনিও যদি কোন গান লিখতে চেষ্টা করেন, সেটা হবে খুবই গৌরবের।

১৮৯৪ সাল। বাংলাদেশে তখন দেশাত্মবোধক গানের দুর্ভিক্ষ। এই অভাবটা তাই প্রাণে বেজেছিল আনন্দমোহনের। আরো গান চাই। ঘুম-ভাঙানিয়া গান। যা আছে, তার মূল্য অনেক। কিন্তু আরো বিস্তৃতি চাই। চাই আরো গভীর আবেদন। আগুনের উত্তাপ, বজ্রের তেজ নিয়ে মানুষের মর্মে মর্মে দেবে হানা। মৃত প্রাণকে করে তুলবে মৃত্যুঞ্জয়।

সিপাহী যুদ্ধের পর বাংলা গানের মধ্যে স্বদেশীয়ানার স্বাদ নিয়ে এলেন পদ্মিনী-উপাখ্যান রচয়িতা কবি রঙ্গলাল।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ডাঃ সুকুমার সেনের বিচারে—" 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে শিক্ষিত বাঙালী আপনার চিত্তের এক গূঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনী উপাখ্যানের (এবং রঙ্গলালের পরবর্তী কাব্যগুলির) আত্যন্তিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা 'নিশীথিনীর মৌন যবনিকা' অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার সতন্ত্র ও বিশিষ্ট মূল্য আছে।"

'হিন্দু মেলা' থেকেই বাংলাদেশে জাতীয় সংগীত রচনার উদ্বোধন। গান লিখলেন প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান ঠাকুরবাড়ীর সত্যেন্দ্রনাথ। নিজের বাল্যকথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"আমি বোম্বাইয়ে কার্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী' মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ) তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি

সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী জাতীয় সংগীত বক্তৃতাদি বিভিন্ন উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সংগীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারতসংগীতের জন্মদাতা।"

সত্যেন্দ্রনাথের গান—

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয়।

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারত ললনা
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি।

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি, মহামুণিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি।

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি।

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি

৭

কেন, ডর, ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্মোস্ততো জয়।
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি।

এই গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্র হয়েছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। তাঁর বুকের চাপা উচ্ছ্বাস একদিন ছাপার অক্ষরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে উঠল বঙ্গদর্শনের পাতায়।

"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

এই হিন্দুমেলার আরেক গীতিকার হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশানুরাগের গানের আদিতম জনকদের অন্যতম।

হিন্দুমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের পিছনে তাঁর অবদান অপরিমেয়। এই মেলার অন্যতম অংশীদার কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু। তাঁর বিবরণ বলে—"জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার (নবগোপাল মিত্রের) গুণানুবাদ করিলেই পর্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত স্বদেশ হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্বাগ্রে গণনীয়। রোমনগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্তমান জাতীয় অনুষ্ঠানপক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহীতকারী হইতেছেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের গান—

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা-রাত্রি ঝরিছে লোচন বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে।
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারী।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠারো। ছিলেন মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্যে আমেদাবাদ থেকে কলকাতায় চলে এলেন আট মাসের ছুটি নিয়ে। সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তারই কদিন পরে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন বসতে চলেছে আশুতোষ দেবের বাগানে।

নবগোপাল মিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ধরলেন—

লেখো না, জাতীয় ভাবের কবিতা লেখো না দু-একটা। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ আবেগ থাকবে। নাড়া খাবে মানুষ।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের চোখে লজ্জা, মুখে সলজ্জ বিনয়।

আমি তো কখনো লিখি নি কবিতা।

তাতে কি হয়েছে। লেখো, লেখো।

একবার আধবার নয়, ক্রমাগত অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সত্যি সত্যিই লিখে ফেললেন একটা কবিতা। নবগোপাল মিত্র সেটা নিয়ে গিয়ে দেখালেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তিনিই তখন হিন্দু মেলার সম্পাদক। জ্যোতিরিন্দ্র স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনালেন। বাঃ চমৎকার। গণেন্দ্রনাথ কবিতাটা শুধু তারিফ করেই ক্ষান্ত হলেন না। বললেন—

এটা এবারের মেলায় পড়তে হবে।

সেবারের মেলায় কবিতা পড়া হয়েছিল তিনজনের। শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু নিজে পড়েন নি। তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ বলে সেটা পাঠ করে শোনানোর দায়িত্ব পড়েছিল বজ্রকণ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর।

কবিতার নাম 'উদ্বোধন'।

জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান!
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্মসার;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয়,
শোষিছে শোনিত তার বিদরি হৃদয়;

স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড!
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃ-সুধা শতনদী ধারে
পিয়াইছে নিরবধি আমা সবা করে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।...

এই হাতেখড়ির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত ক্রমশ পাকতে লাগল নাটকে, গানে, অনুবাদে। ১৩০৪ সালে ছেপে বেরুল তাঁর একটি স্মরণীয় গান, 'বীণা বাদিনী'র পাতায়।

চল্ রে চল্ সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বল মা গো!
তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান
নবতানে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

লোকরঞ্জন লোক-গঞ্জন না করি দৃকপাত
যাহা শুভ যাহা ধ্রুব ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু-মুসলমান
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা নিশান।

রসরাজ অমৃতলাল তাঁর আপনকালের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, হিন্দুমেলার সংগঠনে "উদ্যোগ ছিল নবগোপাল ও তার সহকারিগণের, কিন্তু শক্তির সঞ্চার কর্তেন প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জোড়াসাঁকোর জ্যোতিষ্কগণ।"

নাট্য-রসিক গণেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাইপো। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে। হিন্দুমেলার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তখন তিনিও স্বদেশানুরাগের গান না লিখে পারেন নি। হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে তাঁর যে গানটি গাওয়া হয়, সেকালের জনপ্রিয় গানের মধ্যে সেটা ছিল অন্যতম।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি ক'রে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকার॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা ক'রে॥
দেশান্তর জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

এসব ছাড়া স্বদেশী গান বলতে তখন রঙ্গলাল আর হেমচন্দ্রের গান। তখনো 'বন্দেমাতরম্' বাঙালীর প্রাণের সংগীত হয়ে ওঠে নি। হয়ে ওঠে নি স্বদেশী-যুদ্ধের প্রধানতম সংগ্রাম-ধ্বনি।

জনসভায় বন্দেমাতরম্-এর সংগীত হিসেবে প্রথম আবির্ভাব ১৮৯৬ সালে। স্থান, কলকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন মঞ্চ। গায়ক, রবীন্দ্রনাথ। সুরও কবির স্বরচিত।

তারপরে এই গান নিয়ে আর বেশী উচ্ছ্বাস-উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেল না।

কবি হেমচন্দ্রের বুকে বোধ হয় এই ব্যথা বেজেছিল। তিনি এই মহাসংগীতের প্রচারে উদ্যোগী হলেন এক বিচিত্র উপায়ে। নিজে লিখলেন একটা গান। নাম রাখিবন্ধন। স্বরচিত সেই গানের মধ্যে জুড়ে দিলেন বন্দেমাতরমের কয়েকটি পংক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের কানে গেল কথাটা। হেমচন্দ্র নিজের গানে তাঁর লাইন বসিয়ে বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। জনপ্রিয়ও হয়েছে হেমচন্দ্রের সেই গান।

বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয়ই সুখী হয়েছিলেন শুনে। কারণ তাঁর মনের গভীর কোণে একটা গোপন বিশ্বাস ছিল—বন্দেমাতরম্ গানএকদিন সারা দেশ কণ্ঠে ধারণ করবে প্রাণোন্মাদ উৎসাহে।

হেমচন্দ্রের গান—

ভারত-জননী জাগিল।
পূরব বাংলা মগধ বিহার
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মাদ্রাজ শহর বোম্বাই
সুরাট গুজরাটী মারহাটী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।
প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে গেছে হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি করিল।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল 'বন্দেমাতরম্'
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনিং
সুখদাং বরদাং মাতরম্—
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং বন্দে মাতরম্।'
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগত মাতিল।
আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে
চরণ যুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটেছিল ১৮৭৩ সালে। মৃত্যুর চার বছর আগে নিজের বড় মেয়ের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "একদিন দেখিবে, বিশ ত্রিশ বৎসর পরে এই গান লইয়া বাঙলা উন্মত্ত হইয়াছে —বাঙালী মাতিয়াছে।"

এই সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল।

আড্ডা জমেছে বৈঠকখানায়। তখনকার দিনের নামজাদা সাহিত্য রসিকেরাই বসেছেন মজলিস জমিয়ে। আছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথবাবু, নবীন সেন প্রভৃতি। কথার পিঠে কথা। সহসা কথা শুরু হল আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ গান নিয়ে। নবীন সেন বললেন—ছাখো। একটা ভাল জিনিসকে আধা-সংস্কৃত

আর আধা বাঙলায় লিখে মাটি করা হয়েছে। এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মতো। লোকের ভাল লাগে না।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনের বঙ্কিম-কটাক্ষে আহত হলেন।

আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে, তাই ওরকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগে কি না ভেবে আমি লিখব?

ঋষি-বাক্য, তাই মিথ্যা হবার নয়।

একদিন তাই লোকের ভাল লাগল। এই ভাললাগা লুকিয়েছিল লোকের হিয়ার মাঝে, চরম মুহূর্তে মহান আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়।

১৮৮৩ সাল।

ইলবার্ট বিল নিয়ে হুলুস্থূল কাণ্ড হয়েছিল কলকাতায়। খেপে উঠেছিল সাদা চামড়ার মানুষগুলো। নেটিভের কাছে কিনা তারা এসে দাঁড়াবে নতমস্তকে, ন্যায়-বিচারের আশায়? নেভার, নেভার।

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতা 'নেভার নেভার'-এ ফুটে উঠল ইংরেজ সমাজের উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ।

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রানশন, কেশুয়িক, মিলার—
নেটিভের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার।

ইংরেজদের 'ইলবার্ট বিল' বিরোধী উগ্রচণ্ডী উত্তেজনার বিরুদ্ধে কলকাতার মানুষও প্রতিবাদে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল সেদিন।

কিন্তু সেদিনও 'বন্দেমাতরম্' শোনা যায় নি, কারো গলায়। তারই কিছু পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রবন্ধে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে পাঠানো হল জেলে। বাংলার গলায় ফুসে উঠল গর্জন। বিশেষ করে সেদিন, সেই প্রথম, কলকাতার ছাত্রসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছিল অস্থির অসহিষ্ণু।

কিন্তু সেদিনও 'বন্দেমাতরম্' বাজে নি তাদের গলায়।

বন্দেমাতরম্-এর প্রথম কল্লোল উঠল ১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট। টাউনহলে সেদিন ছিল এক ঐতিহাসিক জনসভা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালী প্রথম কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করল স্বদেশী আর বয়কটের শপথ। সেই শুভদিনের জনস্রোতের ভিতরে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের শুভ জন্মলাভ।

সেই যে শুরু, তারপর থেকে আর বিরাম নেই, বিনাশ নেই, বাংলা ছাড়িয়ে ক্রমশ সারা ভারতবর্ষের ধমনীর ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে চলল তার বজ্রনাদী আহ্বান।

যাঁরা সেই বাঁধন ছেঁড়ার যুগের বীর ছেলে, যাঁরা সেদিন কোমর বেঁধে সোজা শিরদাঁড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছিল এক মরা দেশের গায়ে বেঁচে ওঠার জীবন কাঠি ছোঁয়াতে, তাঁদের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অকুণ্ঠিত, অকৃত্রিম।

সতীশচন্দ্র তাঁর ডন পত্রিকায় লিখেছিলেন—

"কোন্ বাঙালীর হৃদয় এই দুটি জাদুময় শব্দে দ্রুতবেগে স্পন্দিত না হয়? স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অমর গ্রন্থ আনন্দমঠে প্রথম যেদিন রচনা করলেন এই হৃদয় মাতানো আত্মোদ্দীপক গান, যার গোড়ার দুটি শব্দ আজ এই নবীন বাংলাকে দিয়েছে সংগ্রামের ধ্বনি ও সুমহান প্রেরণা, তখন কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন এই অলৌকিক আশ্চর্য রূপান্তর-এর কথা, যে তার ঐ দুটি শ্রুতিমধুর শব্দ একদিন হয়ে উঠবে তাঁরই অধঃপতিত দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক। সমস্ত আকাশ জুড়ে আজ বাজছে বন্দেমাতরম্। কলকাতার অলিগলিতে এবং দেশের অন্যান্য অংশে বেজে চলেছে ঐ দুটি পবিত্র মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনি। বন্দেমাতরম্ আজ দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরে তুলেছে আলোড়ন।"

অরবিন্দও ঐ পত্রিকাতেই লিখেছিলেন—

"৩২ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন এই মহান সংগীত, খুব অল্প লোকেরই কানে ঢুকেছিল। কিন্তু দীর্ঘ মতিভ্রমের দশা কাটিয়ে আজ যে মুহূর্তে বাঙালী জাতি সত্যের সন্ধানে জেগে উঠল, সেই সৌভাগ্যের মুহূর্তে তাদের কণ্ঠে বেজে উঠল বন্দেমাতরম্।"

আরেকবার ১৯০৮-এ বোম্বাইয়ের অমরাবতী বন্দেমাতরম্ গানের ওপর এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"বন্দেমাতরম্ গান নয়, ইহা একটি মন্ত্র।"

বন্দেমাতরম্ কথাটার মানে কি? তাই নিয়ে ইংলণ্ডে একসময় শুরু হয়েছিল তুমুল বাদানুবাদ।

ডক্টর জি. এ. গ্রিয়ারসন-এর মত, হিন্দুধর্মের কোনও দেবীর উদ্দেশে—সংহারকর্ত্রী কালীর উদ্দেশে এই গান লিখিত হইয়াছে।

প্রতিবাদ করলেন স্যার হেনরী কটন।

"বন্দে মাতরম্ সংগীতটি জননী বঙ্গভূমির আহ্বান মাত্র।"

ডবলিউ. এইচ. লি. সমর্থন করলেন কটনকে।

জি. ডি. অ্যাণ্ডারসন লিখলেন—"আনন্দমঠের ১ম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা কালী প্রতিমার পূজা করিয়া বলিতেছে, মা যা হইয়াছেন; আর একটি মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রতিমাকে দেখাইয়া বলিতেছে, মা যা হইবেন! বন্দেমাতরম্ স্তোত্র এই দুই প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র একাদশ সংস্করণের ষষ্ঠ খণ্ডে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন—

"During Bankim Chatterjee's life time the 'Bande Mataram', though its dangerous tendency was recognised, was not used as a party war-cry; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath

Banerjee in 1883. It was, however. obtained an evil notoreity in the agitations that followed the partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it is impossible to believe."

১৯০৫-এর আগস্টে 'বন্দেমাতরম্' দেশের জনসাধারণের কণ্ঠে রূপ নিল রণ-ধ্বনির। তারই দুমাস পরে, অক্টোবরে, উত্তর কলকাতায় গড়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়'। সঙ্ঘের সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র। সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। কোষাধ্যক্ষ রায় অমৃতলাল মিত্র বাহাদুর। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের ব্যাপক প্রচার। প্রত্যেক রবিবারে পথ প্রদক্ষিণে সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বেরুত শোভাযাত্রা। এই রকম শোভাযাত্রায় একবার যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মাঝে মাঝে আসতেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও। গেয়ে শোনাতেন নিজের লেখা গান। ধর্মীয় চেতনার উপর রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য।

১৯০৫-এর ডিসেম্বর। কাশীতে বসেছে কংগ্রেসের অধিবেশন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সরলা দেবী। তিনি খুব সুন্দর করে গাইতে পারতেন বন্দেমাতরম্ গান। তাঁকে দেখেই প্রতিনিধিদের মধ্যে জেগে উঠল গান শোনার তীব্র বাসনা। তাঁদের সম্মিলিত অনুরোধ গিয়ে পৌঁছল গোখলের কাছে। নরমপন্থী গোখলে প্রমাদ গুণলেন। গান গাওয়া তো নয়, কংগ্রেসের ভিতর খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। বাংলাদেশের সভাসমিতিতে যে-গান সরকারী আইনে একেবারেই নিষিদ্ধ, সেই গান তিনি গাইবার অনুমতি দেবেন কিনা কংগ্রেসের অধিবেশনে? কংগ্রেসের গায়ে যদি তার ফলে রাজদ্রোহিতার ছাপ পড়ে? তবে একটা কথা, কাশী তো বাংলা নয়। এখানে নিষেধের মানা নেই। তবুও সাবধান থাকা ভাল, তার মার নেই। সুতরাং সাত-পাঁচ ভেবে গোখলে শেষ

পর্যন্ত দু-নৌকোয় পা রাখলেন। একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে পাঠালেন সরলা দেবীর কাছে। তাতে লেখা—সময় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং পুরো গানটি না গেয়ে যেন কেটে-ছেঁটে খানিকটা অংশই তিনি গান।

সরলা দেবী কেটে-ছেঁটে ছোট করেই গাইতে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রতিনিধিদের দাবি—পুরো গান শুনবো আমরা। শেষ পর্যন্ত তাই হল।

সেই অভিজ্ঞতাকে মনে রেখেই সরলা দেবী গোখলেকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'সাবধানপন্থী'।

১৯৩৭। সুভাষচন্দ্র বসুর প্রশ্ন এসে পৌঁছল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে, পত্রযোগে। বন্দেমাতরম্ জাতীয় সংগীত হতে পারে কি? জগদীশচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"যাহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনি-আপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।"

কার্লাইল সার্কুলারে ছাত্রদের যেদিন সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হল, সেদিন সেই নিষেধনামার শক্ত বেড়ীতে 'বন্দেমাতরম্' গান এমনকি শুধুমাত্র বন্দেমাতরম্ উচ্চারণকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার প্রচেষ্টায় সরকারী শাসনযন্ত্রের চেলা-চামুণ্ডা পাইক-বরকন্দাজ পুলিস-পিশাচের দল লাঠি বন্দুক বাগিয়ে একদম তৈরী। তবুও সেদিন বাংলাদেশ অমৃত মনে করে যে গানকে তুলে নিয়েছিল গলায়, অত্যাচারের বিষে জর্জরিত করেও তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনা গেল না। 'বন্দেমাতরম্' বললে যদি মৃত্যু ঘটে, ঘটুক, তবু বলবোই, বলবেই।

সেই স্বদেশী-মাতনের দিনে শুধু এই 'বন্দেমাতরম্' নিয়েই লেখা হয়েছে সংখ্যাতীত গান, যার প্রত্যেকটির পিছনে রয়েছে অসংখ্য নির্যাতীত নর-নারীর অশ্রু-ঝরার কাহিনী, রক্ত-ঝরার ইতিহাস।

প্রমথনাথ দত্তের গান—

ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাওরে 'বন্দেমাতরম্'
নিত্য, সত্য, স্নিগ্ধ, শুদ্ধ বল্‌রে 'বন্দেমাতরম্'।
কাব্যে গ্রন্থে ছন্দে যন্ত্রে
গদ্যে পদ্যে তন্ত্রে মন্ত্রে
গল্পে গাথায়, ভজনে-সাধনে সাধরে 'বন্দেমাতরম্';
সকল ভারত বল-বিধায়িনী বাণী—'বন্দেমাতরম্'।
ঐক্য বন্ধন অমোঘ সূত্র ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্'
দিব্য নেত্রে ঐ যায় দেখা
বিদ্যুদক্ষরে জলদে লেখা
বিধির আদেশ অভয় মন্ত্র জপরে 'বন্দেমাতরম্'

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের লেখা স্বদেশী গান সেদিনের মানুষকে যুগিয়েছিল বিপুল প্রেরণা।

'হিতবাদী'র সম্পাদক কলীপ্রসন্ন বিচিত্র স্বভাবের মানুষ। এক দেহে অসংখ্য তাঁর রূপ। গোড়ায় ছিলেন বিজ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত। তারপর মাতলেন জাদুবিদ্যা প্রদর্শনে। সঙ্গীদের নিয়ে গড়লেন 'আর্য ইন্দ্রজাল সমিতি'। মেসমিরিজম অর্থাৎ সম্মোহনবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল প্রসিদ্ধ। এসবের চেয়ে যা বড়ো, তাঁর ছিল সেই গান লেখার ক্ষমতা। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর গুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। গুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী A Nation in the making-এ শিষ্য-প্রতিম কালীপ্রসন্নের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা উল্লেখ করার মতো।

"মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে ফিরছি (১৮৯৪) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার Rewa-য় চেপে।··· কালীপ্রসন্ন

কাব্যবিশারদ, হিতবাদী-র সম্পাদক ছিলেন আমাদের দলে। জাহাজে তিনি ইউরোপীয়ান যাত্রীদের আমোদ বিতরণ করতেন তাসের ট্রিক ও আরও নানারকম মজার খেলা দেখিয়ে। বিশারদ, বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মানুষটি, একদা এ-সব খেলায় ওস্তাদ ছিলেন। ইনি স্বভাবে প্রাণময়, সাহিত্য রচনায় প্রতিভাময়, কবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য, সৌন্দর্য বেদনাময় অসংখ্য অপূর্ব সংগীতের রচয়িতা, যা স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করেছে।...

দুরারোগ্য ব্যাধিতে দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়েও প্রত্যেকটি স্বদেশী জনসভায় নিমন্ত্রণ পেলেই তিনি উপস্থিত থাকতেন। স্বদেশী জন-সভায় তাঁর একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল, যা আজকের দিনে প্রত্যেক সভাসমিতিতেই প্রচলিত, সভার ভাবোপযোগী দেশ-প্রেমাত্মক গান দিয়ে সভার উদ্বোধন করা। তিনি নিজে গান গাইতে পারতেন না, কিন্তু গান লিখতে পারেন অপূর্ব, স্বদেশী সভাসমিতিতে গাওয়া হত সে সব, এবং সেগুলো সব সময়েই মনের ওপর ফেলত গভীর এক অনুভূতির ছাপ। গান রচনার ব্যাপারে তাঁর ছিল সহজাত প্রতিভা। হিন্দী ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল না বটে, কিন্তু ঐ ভাষাতেই লেখা তাঁর হিন্দী গান (ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হল), নিজস্ব ঢঙ-এ ছিল স্বতন্ত্র। গানের মধ্যে ছিল স্বদেশের দ্রব্য সামগ্রীকে গ্রহণ করে বিদেশী দ্রব্যকে আবর্জনার মতো বর্জন করার দৃপ্ত আহ্বান। ১৯০৬-এর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে হাজার হাজার মানুষের সামনে এই গান যেদিন গাওয়া হল, শ্রোতাদের বুকের মধ্যে উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠল যেন। সবসময় কাব্যবিশারদের সঙ্গে থাকতো দুজন ওস্তাদ গাইয়ে, যাদের দিয়ে স্বদেশী সভায় গাওয়ানো হত সভারম্ভ ও সভাশেষের গান। তিনিই তাদের রক্ষক, শিক্ষক ও প্রতিপালক।

He was not much of a speaker, but as a writer he was

the master of a vigorous and caustic style which he ruthlessly employed against the enemies of Indian advancement. A devoted patriot, he never spared himself in the service of the motherland ; and I remember his attending the Lucknow Congress of 1899, with fever on him and a warrant in defamation case hanging over him. He was reckless of health and life : strongwilled and even obstinate above all advice and remonstrance."

কালীপ্রসন্নের গান—

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দে মাতরম্ বলে
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে।
(আমার) যায় যেন জীবন চ'লে।
(আমার) মান অপমান সবই সমান
দলুক না চরণ তলে।
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন্ কালে ? (আর)
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।
লাল টুপি কি কালো কোর্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক্ জেলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

আমায় বেত মেরে কি 'মা' ভোলাবে?
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।
আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।
যে মা'র, কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত অধম যে হয় সইতে রাজি
উত্তমে চাও মুখ তুলে
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের একজন সমর্থক ও কর্মী। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দাসও ছিলেন স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিনী।

ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর দিনে স্বামীর সঙ্গে শবানুগমন করেছিলেন। নিমতলা শ্মশানে শোকাভিভূতা হেমাঙ্গিনী উপাধ্যায়ের পদধূলি মাথায় নিয়ে তাঁর সম্পর্কে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণও দিয়েছিলেন।

সুন্দরীমোহনের গান—

আমরা চাই না তব শিক্ষা—
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা
এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্র
(এই বন্দে মাতরম্)
(যার বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে)
ঘুম-পাড়ানো এই মন্ত্র, ভাব-তাড়ান এই তন্ত্র
বল জাগানো এই মন্ত্র
(আমরা) শিখিব আপন শাস্ত্র, পরিব নিজেরি বস্ত্র
ধরিব আত্ম-অস্ত্র করিতে আপন রক্ষা।

বন্দে মাতরম্-এর বীর্যবান মন্ত্রকে কেন্দ্র করে লেখা গানের উদাহরণ এইখানেই শেষ নয়, আরো আছে। এ থেকে শুধু বোঝা গেল ঐ দুটি অলৌকিক শব্দ সেদিন কী ভীষণ শক্তি নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছিল আহত দেশবাসীর অন্তরে।

এই প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। তিনি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডীর জীবন চরিতের অনুবাদক। সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ 'আর্যদর্শন' পত্রিকার ম্যাৎসিনির জীবনচরিত প্রকাশ করলেন ধারাবাহিকভাবে। ঐ বাংলা অনুবাদ বই হয়ে ছেপে বেরুল যেদিন, সেদিন বাংলার তরুণ সমাজের আলোড়িত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে আর চেপে রাখা গেল না। সকলের হাতেই একটা করে বই। কৃষ্ণকুমার মিত্রের জবানী থেকে জানতে পারা যায় "বন্ধু বান্ধবের বিবাহে ঐ গ্রন্থ উপহার দেওয়া তখন খুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে বুকের রক্ত দিয়া কেহ কেহ দেশসেবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন।"

যোগেন্দ্রনাথের গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিতও বই হয়ে বেরুল। বইয়ের গোড়াতেই অনুবাদের ভূমিকা। যোগেন্দ্রনাথ তো শুধুমাত্র অনুবাদক নন। তাঁরও মর্মে মর্মে যে স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার

মন্ত্র-মর্মর। শ্রমিক নেতা মৃণালকান্তি বসু নিজের জীবনকথায় তাঁর ছাত্র জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে চোখে দেখা যোগেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন মারা যান আমি স্কুলে পড়ি। মিউনিসিপ্যাল অফিসে শোকসভা হয়। আমরা সভায় গিয়েছিলাম। বক্তৃতা করতে করতে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ উচ্চরবে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। ইনিই গ্যারিবল্ডী ম্যাৎসিনির জীবন-চরিত লেখক। তখন যশোরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমরা মাঝে মাঝে এঁর কাছে যেতাম। ইনি আমাদের গ্যারিবল্ডী ম্যাৎসিনির মতো হতে বলতেন। আমরা তাঁর কথার মর্ম বিশেষ বুঝতাম না। তবু তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগতো বলে যেতাম।"

সেই যোগেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের বইয়ের ভূমিকার শেষ অধ্যায়ে এসে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানালেন—"এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে!! গগন বিদারিয়া গাও "বন্দে মাতরম্"—স্বদেশানুরাগ ভগদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক !!!"

সাহিত্যক্ষেত্রে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে যোগেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা স্মরণীয়, শ্রদ্ধেয়।

এমন প্রাণোজ্জীবনের মন্ত্র যাঁর দেওয়া, তাঁর দেশবাসী সেদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে উন্নত মস্তকে, নম্র হৃদয়ে। কাঁঠাল পাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব তারই চরম প্রকাশ। প্রফুল্ল সরকারের 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ'-এ পাই এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ।

"বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবনেই এই উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 'বন্দে-মাতরম্ সম্প্রদায়' সদলবলে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল এবং জাতীয় সংগীত গান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে কয়েক

সহস্র লোক এই উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছিল। কাঁঠালপাড়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতেও বহু লোক আসিয়াছিল। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল জাতীয় মেলা। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখের বিস্তৃত মাঠে এই মেলা বসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা তাহাদের নানা কৃষিজাত ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য মেলায় বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, কবির দল, পাঁচালীর দল, তীর-ধনুকের খেলা প্রভৃতি গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। উপাধ্যায় বলিতেন যে, বিলাতী কায়দায় স্মৃতিসভা করা আমাদের জাতির ধাতের সঙ্গে খাপ খায় না, এই গ্রাম্য মেলার দ্বারাই আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে আরও ভাল করিয়া স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি। সে যাহা হউক, অপরাহ্নে আধুনিক রীতিতেও মেলাক্ষেত্রে একটি সভা হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ও সাহিত্য-শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তিনি সঙ্গে দুইটি বালক গায়ককে লইয়া আসিয়াছিলেন। সভার প্রথমে তাহারা উঠিয়া জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র' মধুকণ্ঠে গান করিল। একটি বালিকা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাজিয়ে যাব মল' কবিতাটি চমৎকার আবৃত্তি করিল। তারপর শ্বেতশ্মশ্রু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে করিয়া তাঁহার এমন ভাবাবেগ হইল যে, তিনি বক্তৃতা করিতে পারিলেন না, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভা শেষ করিলেন। সন্ধ্যার পর বঙ্কিচন্দ্রের পূজার দালানে রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়া 'আনন্দমঠ' অভিনীত হইল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বয়ং সত্যানন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ জীবানন্দ, মহেন্দ্র প্রভৃতির ভূমিকা কাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে না। এইরূপে রাত্রি প্রায় ৯টার পর বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসব শেষ হইল।" এসব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র

ঐ এক গানেই হয়ে উঠেছিলেন একটা জাতির 'নতুন-জাগা স্বদেশীয়ানার জনক।

বঙ্কিমচন্দ্র উৎস। রবীন্দ্রনাথ প্রস্রবন।

স্বদেশী যুগে গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ। একাই একশ।

দিন বদলের হাওয়া উঠেছে দেশ জুড়ে। সেদিন বাংলাদেশকে গানে গানে ভরিয়ে, ভাসিয়ে, মাতিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—"বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন লইয়া তখন দেশময় যে উত্তেজনা, তাহার তরঙ্গ কবিকেও উতলা করিয়া তুলিল। শান্তভাবে স্থির বুদ্ধিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহাই বলুন, অন্তরলোক যে নূতনের সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই পুলকিত আবেগে উচ্ছ্বাসে কবিহৃদয় দেশমাতৃকার পূজা আরতিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহারই প্রকাশ হইতেছে স্বদেশী কবিতা ও সংগীত।"

বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলনের আগেও স্বদেশী গান তিনি লিখেছেন। চোদ্দ বছর বয়সে 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।'

১৮৮৬। কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। সেখানে গেয়েছেন —'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। নিজের গানে নিজেরই দেওয়া সুর।

অনুরোধ নিয়ে এলেন অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়। গান লিখে দিতে হবে দুটো। কলকাতা কলেজের ছাত্রদের মিলন সভার জন্যে। লিখলেন দুটো গান। 'আগে চল্ আগে চল ভাই' আর 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ'।

অনেক গানের পিছনে আছে এমনি অনুরোধের তাগিদ। 'অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী'র মতো মোহন গানটিও এমনি এক অনুরোধের ফসল। বন্ধু হেমচন্দ্র এসেছেন অনুরোধ নিয়ে। সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁদের উদ্দেশ্য এবারের দুর্গাপূজাকে নতুন রূপে দেশের সামনে তুলে ধরা। মাতৃমূর্তির সঙ্গে মেলাতে

হবে মাতৃভূমির মূর্তি। চাই তার যোগ্য গান, যাতে ভক্তির সঙ্গে মিলবে উদ্দীপনা। সব শুনে কবি খুব উৎসাহিত হন নি। কৃত্রিম ভক্তিকে আন্তরিক করতে তিনি অপরাগ। কবি বললেন যে, বিষয়টা সাহিত্যের হলে নিজের ধর্মবিশ্বাসকে সরিয়ে রাখার সংকোচ থাকত না। কিন্তু ভক্তির বেলায় পূজার বেলায় তা অনধিকার প্রবেশের মতো অপরাধ। "আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। আমি রচনা করেছিলুম 'ভুবনমনমোহিনী'। এ গান পূজা-মণ্ডপের যোগ্য নয়, সেকথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্র সভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে বোধগম্য হবে না।"

স্বদেশী গানের প্লাবন বইল তাঁর কলমে সেদিনের দেশজোড়া আন্দোলনের দিনে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন—"স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুযন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে-সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।"

"ডন-সোসাইটি'তে তখন রবীন্দ্রনাথের নিত্য আসা-যাওয়া। প্রতিদিনই একটা না একটা সভা-বৈঠক লেগে আছে। আর সে সব সভা-বৈঠকের আদি অথবা অন্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত গান গাইবেন স্বকণ্ঠে—এ যেন প্রায় নিয়মের মতো।

কিন্তু গান শুধু গাওয়াতেই শেষ নয়। সেখানেও ছিল তাঁর আর একটা কাজ। বিনয় সরকারের এজাহারে পাই, তিনি "ডন সোসাইটির ছোকরাদের গানের সাকরেদ করে নিয়েছিলেন। তাঁর

তৈরি স্বদেশী গান শেখাবার ব্যবস্থা করা হল। কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর অন্যতম বড়-চেলা অজিত চক্রবর্তী নিয়মিত এসে আমাদেরকে গান শিখিয়ে যেতেন। মেট্রোপলিটন কলেজে চোআঁড়ে গলায়, গাধার গলায়, ফাটা গলায়, মিহি গলায়, সর্দি গলায় অ-সুরেরা সুর সাধনা করত।

অল্পদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলনের নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুপম জাতীয় সংগীতরাজী সৃষ্টি করে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত রাখেন। প্রত্যেক দিন বিকেলে তিনি অজিত চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে উপস্থিত হতেন ও তাঁর রচিত কবিতাগুলিতে সুর সংযোগ করতেন।" এই হল বিনয় সরকারের সহপাঠী সেকালের ডন-সোসাইটির আর এক পাণ্ডা-ছাত্র, পরবর্তীকালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জির সাক্ষ্য।

রাধাকুমুদের আরেক সমসাময়িক ছাত্র অতুলচন্দ্র গুপ্ত। পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধ আইনবিদ্ ও কাব্যবিচারক এবং প্রগতি-শীল চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক সাহিত্য-রসিক অতুলচন্দ্র তাঁর ছাত্র-জীবনের স্মৃতি-কথায় লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ যে সভায় প্রবন্ধ পড়তেন সেখানে ছাত্রদের ভিড় হ'তো অসম্ভব রকম। কিন্তু সে ভিড় কেবল তাঁর প্রবন্ধ শুনতে নয়, তাঁকে দেখতে ও তাঁর পড়া শুনতে। এবং সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-পাঠকই থাকুন আর সভাপতিই থাকুন সভার শেষে তাঁর গান শোনার দাবি ঐকতান চীৎকারে আমরা বরাবর জানিয়েছি। আর এ কাজে, ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোককেও মাঝে মাঝে abettor পাওয়া যেতো। তাঁর সাহিত্যে ও তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু।

এর পর যখন কলেজের উঁচু শ্রেণীতে উঠেছি তখন এল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। যে আবেগ ও উত্তেজনা বাঙালী শিক্ষিত

সম্প্রদায়ে, বিশেষ আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ে জেগে উঠল তার অনুরূপ কিছু এ সম্প্রদায়ের জীবনে পূর্বে কখনও ঘটে নি এবং পরেও আজ পর্যন্ত ঘটে নি। এই দেশব্যাপী উন্মাদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের মধ্যে এলেন, হয়ে উঠলেন ছাত্রদের অন্তরঙ্গ। প্রথম রাখীবন্ধনের দিনের গান চাই। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' প্রস্তুত। টাউন হলের বিরাট জনসভায় গাইবার জন্যে গান দরকার। এল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' তাঁর সুরের সঙ্গে আমাদের বেসুর মিশিয়ে সে গান আমরা সে সভায় গেয়েছি। দিনের পর দিন তাঁর প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে আমাদের অনুভূতির তন্ত্রী ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে উঠতে লাগল।

'মোদের যাত্রা হল শুরু এখন ওগো কর্ণধার।'
'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন্ শক্তিমান্।'
'ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।'
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'
'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না
ভয় থাকে তো করি মানা।'

সেদিনকার কতক গান কাব্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। কিন্তু সেদিনের তরুণ যুবকদের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ নিয়ে এসব গান যাচাই করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে নির্ভয়ে ফাঁসীকাঠে উঠতে পারে তার সংখ্যা আমাদের মধ্যে কম ছিল না। যে মোহের অবশেষ মনের মধ্যে আজো আছে।"

রবি-মণ্ডলের কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' বইয়ে স্বদেশী ভাবনার সেই স্বর্ণযুগের কথায় লিখেছেন—

"বাঙলার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে একই ধ্বনি,

একই প্রতিধ্বনি—বাঙলাকে খণ্ডিত হইতে দিব না। কবি সেদিন প্রবন্ধ পাঠে, বক্তৃতায়, গল্পে গানে একবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় প্রত্যহই গান লিখিতেন এবং সেই গান—সেই 'সোনার বাঙলা', 'আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী', 'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে, ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে,' 'একলা চল, একলা চল রে', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল,' 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, আমরা গান গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে',—প্রভৃতি গান পথে পথে ঘরে ঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইত।···কবির সেই অতন্দ্রিত দেশপ্রীতি, সেই 'অত্যুক্তি,' 'স্বদেশী সমাজ', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'কণ্ঠরোধ' প্রভৃতি প্রবন্ধে,—'শিবাজী', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কবিতায়,— 'মেঘ ও রৌদ্র' 'রাজটীকা' প্রভৃতি গল্পে এবং উল্লিখিত সংগীত রচনায় দেশে দেশাত্মবোধের যেন বন্যা বহিয়া গিয়াছিল।"

স্বদেশী যুগের আরেক স্বনামধন্য গীতিকার, রজনীকান্ত। সারাজীবনে গানের সোনালী ফসল ফলিয়েছেন অজস্র। কিন্তু সারা দেশের কাছে একটি গানেই তিনি অবিস্মরণীয়। সে গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' রাজশাহীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে সেদিন তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের কবি।'

কবি তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন—"আমার মনে পড়ে, যে-দিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে Procession (শোভাযাত্রা) বের ক'রে গান এই গাইতে গাইতে গেল, সেদিনের কথা মনে করে আমার আজও চক্ষে জল আসে।"

কান্তকবির এই গান-রচনার পিছনের ছোট্ট ইতিহাসটুকু প্রত্যক্ষদর্শী জলধর সেনের লেখায় জীবন্ত।

"তখন স্বদেশীর বড় ধুম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আপিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং রাজশাহীর খ্যাতনামা আমার পরমশ্রদ্ধেয় ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমার সরকার আপিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে গানের জন্য উৎসুক, সে বলিল—'এই ত গান হইয়াছে, চল জল'দা ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক।' এই জন্য তাহারা সেই বেলা একটার সময় আসিয়া উপস্থিত। অক্ষয়কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে—রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম 'আর কৈ রজনী?' সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাইবে।' সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে না করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুইজনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল; রজনী ও অক্ষয় ৩০-৪০খানা গানের কাগজ লইয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দলের অন্যান্য ছেলেরা আসিয়া ক্রমে (ছাপা) কাগজ লইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় আমি সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বিডন্ স্ট্রীটের বাড়ির উপরের বারান্দায় প্রমথবাবু ও আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম; ছেলেরা গাহিতেছে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!" এইটি রজনীকান্তের সেই গান—যাহা আমি কয়েক ঘণ্টা আগে ছাপিয়া

দিয়াছিলাম। গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল; তাহার পর ঘাটে, মাঠে, পথে, নৌকায়, দেশ-বিদেশে কতজনের মুখে শুনিয়াছি—।"

এই প্রাণ-মাতানো সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাণের কথা—

"···এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথম যেদিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই গীত-রচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।"

গীত-মুগ্ধ রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—"১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।"

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি শুধু এই গানের মুগ্ধ শ্রোতা নন, নিপুণ বিশ্লেষকও। তাঁর ভাষায়—"কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী-সংগীতের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিঞ্চিৎ কাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দেববাণীর মতো আদেশ করে, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মতো সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে, নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু,—পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশী যুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য, ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে নির্দেশ করি।"

১৯০৬। ৩রা ডিসেম্বর। সরকারি চাকরীর বোঝা কাঁধে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এসে পৌঁছলেন গয়ার জাহানাবাদ সাবডিভিশনে। ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারী কাজের অবসরে যথারীতি সাহিত্য রচনার বিরাম নেই। গয়ায় বসেই লিখছেন 'মেবার পতন' নাটকের অংশ বিশেষ, নতুন নাটক 'নুরজাহান'। এই সময় একদিন, ১৯০৭-এর জুন মাসে, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ বসু গয়ায় এসে পৌঁছলেন। সেই সুযোগে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল তাঁর পূর্ব-পরিচয়। মানুষ এবং স্রষ্টা এই দুই দ্বিজেন্দ্রলালই মুগ্ধ সশ্রদ্ধ করল জগদীশচন্দ্রকে। 'দ্বিজেন্দ্রলাল'-এর রচয়িতা দেবকুমার রায়চৌধুরীকে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর সেই আন্তরিক উচ্ছ্বাস।

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণ সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্ম-যুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বজ্রধ্বনির পিছনে জগদীশচন্দ্রের প্রেরণা ও পরামর্শ-এর গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। তাঁর প্রেরণাতেই গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল আর এক নতুন সম্মানের সিংহাসন খুঁজে পেলেন, তা হল স্বদেশী গানের স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল।

গয়ায় স্বল্পকালের ঘনিষ্ঠতার সুযোগেই একদিন সাহস করে বলে ফেলেছিলেন কথাটা। কথা নয়। একটা পরম বিবেচ্য পরামর্শ। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের ভাষায়—"গত পরশু স্বদেশপ্রাণ মনীষী জগদীশচন্দ্র বসুমহাশয় আমাকে স্বদেশী সংগীত রচনা সম্পর্কে একটি বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন।"

"আপনি রানাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, প্রভৃতির অনুপম চরিতগাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে যাহাতে এই মুমূর্ষ জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাংলাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন তো একবার সেই আদর্শ এ বাঙালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।"

প্রতিদিন রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে বুঝি আলোড়ন চলেছিল। এমন কিছু লিখতে হবে—যা একটা ম্রিয়মাণ জাতিকে জীইয়ে—মাতিয়ে তুলতে পারে। ঘুণ-ধরা পাঁজরে জাগবে ঝড়ের ঘন-ঘটা। ক্ষুদ্র হবে রুদ্র।

কয়েকমাস পরের কথা। পুজোর সময়। গয়াতে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে বেড়াতে এসেছেন দেবকুমার রায়চৌধুরী। দুই বন্ধু, অন্ত-রঙ্গতায় অভিন্ন, শয়নে-ভোজনে একত্র।

সেদিন বোধহয় অষ্টমী তিথি। দুপুরবেলার খাওয়া শেষ করে দুই বন্ধু বসে আছেন বিশ্রামসুখ লাভের প্রত্যাশায়। এমন সময় সহসা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন দ্বিজেন্দ্রলাল।

কি ব্যাপার? যাচ্ছ কোথায়?

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—

দেখ, আমার মধ্যে একটা গানের কয়েকটা লাইন এসে ভারী জ্বালাতন করছে। তুমি একটু বোসো ভাই, আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।

আর দ্বিধা না করেই দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তর্হিত হলেন। কেটে গেল আধ ঘণ্টা সময়। কিংবা আরো বেশী। হয়তো বা একটু তন্দ্রার আবেশ ছুঁয়েছিল দেবকুমারের চোখে। এই সময় হঠাৎ তাকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে দিগ্বিজয়ীর মতো দারুণ প্রাণময় উৎসাহে দ্বিজেন্দ্রলাল এসে দাঁড়ালেন। হাতে মৃদু করতালির ছন্দ। গলায় গানের গুঞ্জরণ।

দেখ, কী চমৎকার একটা গান লিখেছি। শুনবে? শোন।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।

"শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তখন, বলিতে লজ্জা হয়—পাষণ্ড আমি, আমারও চোখে জল আসিয়াছিল। নীরবে নতশিরে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তখন কি যেন একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে, উৎসাহে, গৌরবে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। গান শেষ করিয়া বন্ধু বলিলেন—"কি? কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"ধন্য আপনি!" বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার, শুধু একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। পরে, আর কিছু না বলিয়া, হাতে তাল দিতে দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।"

সে রাতে যথারীতি বন্ধু-বৎসল লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে আসিয়া এই বজ্রগর্ভ গানটি শুনিয়া উল্লাস ও উৎসাহে ঠিক যেন প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। পালিতসাহেব গান গাহিতে পারেন না, তাল বোধও তথৈবচ, তথাপি লাফাইয়া উঠিয়া

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সঙ্গে, পিছনে পিছনে সতেজে কক্ষময় পদক্ষেপ করিয়া বেড়াইলেন, এবং সঙ্গীতের ভাবানুযায়ী দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। "আমার দেশ" গানটি শুনিয়া প্রৌঢ় পালিতসাহেবের সেই যে অপূর্ব উন্মাদনা দেখিয়াছি, এ জীবনে তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

এই সংগীত রচনার পরদিবস প্রাতে, রাজ কার্যোপলক্ষে জেলা জজ সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় গয়ায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অতিথি হইলেন। সেদিনও সন্ধ্যার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অনুরোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেই জলদগম্ভীর স্বরে, তেমনই দর্পিত ভাব-বিন্যাস সহকারে আবার সে গানটি আমাদিগকে গাহিয়া শুনাইলেন। স্বদেশপ্রাণ শোতৃদ্বয় তাহা শুনিয়া, বিস্ময়ে, আনন্দে অপূর্ব গর্বে ও অকৃত্রিম দেশভক্তিতে যথার্থই একেবারে স্তব্ধ ও অভিভূত হইয়া গেলেন। গান শেষ হইয়া গেল, তবু বহুক্ষণ তাঁহাদের কাহারও কোন বাক্যস্ফূর্তি হইল না, তাঁহারা উভয়েই সম্মুখস্থ, মুক্ত গবাক্ষপথে সেই নীলাভ ধূসর, অনন্ত অম্বর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ এভাবে কাটিল বলিতে পারি না, শেষে সহসা উন্মত্ত উৎসাহে পালিত মহাশয় কবির করদ্বয় উভয় হস্তে সবেগে মর্দন করিতে করিতে কহিলেন—

> "Oh! how wonderful—how magnificent! Let me confess My dear Dwiju, it's undoubtedly the very-very-very best and noblest national song that I have ever heard or read in my life. It's indeed a Devine inspiration!"

এই উচ্ছ্বসিত, অযাচিত প্রশংসার প্রত্যুত্তর স্থলে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিতে গিয়া, অকস্মাৎ মুখখানা দু'হাতে ঢাকিয়া ফেলিলেন; তখন তাঁহার এই বিহ্বলতা দেখিয়া, কবি বরদাচরণ কোন কথা না বলিয়া

দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া, পার্শ্বস্থ আসনে বসাইয়া দিলেন।”

আরেক দিনের কথা।

সেদিন ১৬ই অক্টোবর। ৩০শে আশ্বিন। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে রাখী-বন্ধনের দিন।

“সেদিন সকালবেলায়, ৯॥টা কি ১০টা বাজিয়াছে, এমন সময় ‘কুন্তলীনে’র ৺হেমেন্দ্র বসু মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়াই ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন—‘আজ বিকালে গোলদীঘিতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। এখনই সেখানকার জন্যে একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই। ছাপতে হবে।

বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দণ্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ কি পনেরো মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্য রকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান; ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন। এবং তখনই উহা কুন্তলীন প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

অপরাহ্নকালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং একটি দলের নায়ক হইয়া বাগবাজারে পশুপতিবাবুর সুবিশাল গৃহপ্রাঙ্গণে গমন করিলেন, এবং সেই সম্মিলিত প্রমত্ত জনসমুদ্রের মধ্যে স্বরচিত সংগীতসুধার সঞ্জীবনী স্রোতধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন।”

পশুপতিবাবুর বাগানের সভা শেষ হল। এবার যেতে হবে গোলদীঘিতে। চলেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। খালি পা। রুক্ষ মাথার চুল। মালকোছা মেরে কাপড় পরা। উঠে পড়লেন শ্যামবাজারের ট্রামে। তাঁকে ট্রামে উঠতে দেখেই কৌতূহল বাড়ল অনেকের।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

গোলদীঘিতে।

ব্যাস, অমনি শ’য়ে শ’য়ে চলল গোলদীঘিতে। কেউ হনহনিয়ে হেঁটে, কেউ ট্রামে।

"পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থামত, তখন তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত সেই গানটি শেষ করিয়া একটা কেরোসিন তেলের কাঠের বাক্সর উপরে দাঁড়াইয়া খুব বেগে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে আর বেশীক্ষণ বিলম্ব না করিয়া ধীর মন্থর গতিতে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে, গদ্‌গদ আর্দ্র কণ্ঠে তাঁহার জনৈক সহগামী বন্ধুকে সহসা গলায় হাত দিয়া আপনার কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—

"আজ একি দেখিলাম, এঁ্যা। এতটা যে কোনদিনও ভাবা যায় নি। তবে কি এখনও সত্যিই আশা আছে নাকি?"

গোড়ার দিকে অনেকেরই মনের মধ্যে ছিল সংশয়। সরকারী মহলের অপপ্রচারের প্রভাবে অনেকেই ভেবেছিল এ শুধু দুদিনের তামাশা। এই হঠাৎ হুজুগের জ্বলন্ত দশা নিভন্ত হতে বেশী সময় লাগবে না। যেন এরই জবাব দিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন লিখেছিলেন—তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' কবিতা। পুস্তিকটির উৎসর্গ করলেন জাতীয় আন্দোলনের বীর নায়কদের উদ্দেশে।

যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার
তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।

কবিতার মধ্যে ফুটে উঠল কবির আশা মাখানো ভাষা।

এতদিনে, এতদিনে বুঝেছে বাঙালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ।
জগতের পুণ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আশা হয় পাব মোরা স্থান।
যে খুশী টিট্‌কারী দিক
অন্তরে বুঝেছে ঠিক
এ কেবল নহেক হুজুগ;
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ।

দেশের সত্যসাধনার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যে আত্মার যোগ ছিল, তার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর কবিতায় গানে। গানে লিখলেন—

কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।

কবিতায়— জননী গো আজি ফিরে
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে।

'সন্ধিক্ষণ'-এর শেষ ছত্রে কবির নির্ভয় বাণী

আত্মতেজে করি' ভর
কর্মে হও অগ্রসর
মূর্খ শুধু বলে এ' হুজুগ
বঙ্গ ইতিহাসে হের এল স্বর্ণ-যুগ।

স্বদেশী আন্দোলনের সেই স্বর্ণযুগে স্বদেশী গানের গীতিকারের সংখ্যা নগণ্য নয়, অগণ্য। তাঁদের মধ্যে সবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে যাঁদের নাম উচ্চারণ করতে হয়, তাঁরা হলেন, কবি অতুলপ্রসাদ সেন, কামিনী রায়, কামিনী ভট্টাচার্য, মুকুন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজ শশীকান্ত, হেম মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সুরেন্দ্র ভৌমিক, মোমিন ও অজ্ঞাত। এঁদেরই সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান লিখেছিলেন আরেকজন। তিনি কবি নন, পুরোদস্তুর রাজনৈতিক নেতা। শুনতে আশ্চর্য লাগবে, তাঁর নাম বিপিনচন্দ্র পাল।

আর সহে না, সহে না জননী, এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন, পড়ে থাকি প্রাণে চাহে না।
তুমি, মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার?
দানব-দলনী ত্রিদিব নাশিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা!
উর মা আজিকে সে রূপে পরানে
ডাকি মা কালিকে, ডাকি মা সঘনে
নয়নে অশনি জাগাও জননী, নহিলে এ ভয় যাবে না।

শুধু গান নয়, স্বদেশীবোধের উদ্‌বোধনে সেদিন নাটকের প্রভাবও ছিল প্রচণ্ড। তিন প্রতিভা ছিলেন সেই নাট্যআন্দোলনের পুরোহিত।

প্রফুল্ল সরকার-এর লেখা এই প্রসঙ্গে তথ্যবহুল।

"স্বদেশী যুগে বহু নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়া স্বদেশ প্রেম ও জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। গিরিশচন্দ্র প্রথমে পৌরাণিক এবং পরে সামাজিক নাটক রচনাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশী যুগে তিনি নূতন রূপে দেখা দিলেন। তাঁহার রচিত 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধনে অশেষ কার্য করিল। বিশেষভাবে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক এক অপূর্ব সৃষ্টি, দেশবাসীর মনে এই নাটক যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

স্বদেশী যুগে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক। ইহাকে যুগপ্রবর্তক নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ যদি একখানি মাত্র নাটক লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি অমর হইয়া থাকিতেন। এই নাটক স্বদেশী যুগে রঙ্গমঞ্চে শত শত রজনীতে অভিনীত হইয়া দেশবাসীর মনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেখানে এই নাটক দেখিবার জন্য এত ভিড় হইত যে প্রতিদিনই স্থানাভাবে বহু দর্শককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত।…ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'রঞ্জাবতী' প্রভৃতি নাটকও স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলার নাট্যসাহিত্যে নূতন ভাব ও রচনাভঙ্গী প্রবর্তন করেন। কবিতা ও হাসির গান রচনায় তিনি পূর্বেই খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন। স্বদেশী যুগে নাটক রচনাতেও তিনি অক্ষয় কীর্তি অর্জন

করিলেন। তীব্র স্বদেশানুরাগ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তাঁহার হাসির গানগুলির মধ্য দিয়াও স্বদেশপ্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার সেই স্বদেশপ্রেম জ্বালাময় গৈরিক স্রাবের মতো নাটক ও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। 'রানা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন', 'সিংহল বিজয়', প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবকে প্রবুদ্ধ করাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"

গিরিশচন্দ্রের যে-দুটি বিখ্যাত নাটক স্বদেশীযুগে নাট্য-রসিক সমাজে তুলেছিল তুমুল আলোড়ন, সে সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর সংগৃহীত তথ্য নাটকের পটভূমি বিচারের পক্ষে খুবই মূল্যবান।

"স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্বলিত অবস্থায় কলিকাতায় রঙ্গমঞ্চগুলি জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাপূর্ণ অনেকগুলি নাটক অভিনয় করিয়াছে। গিরিশবাবুর 'সিরাজদ্দৌলা' বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে স্বদেশভক্ত ও জাতীয়তার সমর্থকরূপেই অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মীরকাশিম'কেও তাই করিয়াছেন। তিলক মহারাজ যে-দিন প্রাতে ত্রিশ হাজার লোক লইয়া অবনীন্দ্রনাথের ভারত-মাতার ছবি মিছিলের সম্মুখে রাখিয়া পটকা বোমা ফাটাইয়া শিবাজী উৎসব সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন, ঠিক সেইদিন রাত্রে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মীরকাশিম প্রথম অভিনীত হইল।

দানিবাবু মীরকাশিম সাজিলেন। আর গিরিশবাবু নিজে মিরজাফর সাজিলেন। বাঙালীর অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। তাই করিমচাচা মীর-কাশিমকে বলিলেন, "বাংলা ফিরে গড়তে হবে। পুরাণ বাংলায় চলবে না।"

সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম নাটকে গিরিশবাবু দেখাইলেন যে, শুধু একজন রাজার স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না।

সেনানায়ক ও কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত যুদ্ধেই পরাজয় ঘটে, আর ঘটিয়াও ছিল তাই। রঙ্গমঞ্চে যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম ইংরেজ তাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, সেই সময় অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি ইংরেজ তাড়াইবার জন্য বারীন্দ্রকে দিয়া গোপনে ছোটলাট ফুলার বধের নিষ্ফল চেষ্টায় হন্তদন্ত হইতেছেন।"

স্বদেশী নাটক প্রসঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার উপর মনীষী বিনয় সরকার যে তুলনামূলক আলোচনার আলোকপাত করেছেন সেটিও আমাদের কাছে নানাকারণে স্মরণীয়।

"১৯০৫ সন হ'তে আজ পর্যন্ত এই বাংলাদেশ কবে কোথায় কতটুকু বেড়েছে এবং আজ তার আর কতটুকু বাড়বার সম্ভাবনা দেখছি, ইহাই আমার একমাত্র আলোচনার বস্তু।

১৮৭০ সন থেকে আজ পর্যন্ত এই সাতান্ন বৎসরের ভিতর ফ্রান্সে, জার্মানীতে, আমেরিকায়, বিলাতে, ইতালীতে, রুশিয়ায়, জাপানে যতগুলি পহেলা নম্বরের নাট্যকার বা কবি,—ঐতিহাসিকের কথা নয়, অর্থশাস্ত্রীর কথা বলছি না,—পহেলা নম্বরের নাট্যকার বা কবি জন্মেছে, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহাদের অন্যতম।

কষ্টিপাথরটা কিছু খুলে দেখানো দরকার। কিসের জোরে তাঁহাকে বর্তমান যুগের অন্যতম পহেলা নম্বরের কবি বলছি? ক্ষীরোদবাবু স্বদেশ-সেবক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানতেন, তাঁহারা জানেন, তিনি স্বরাজ-সাধক ছিলেন। এখানে বলে রাখছি স্বরাজ-সাধক বা স্বদেশ-সেবক হলেই কোন লোক বড় কবি বা নাট্যকার হতে পারে না। তার একটা দৃষ্টান্ত দিব। মান্ধাতার আমলের হোমার আর বৈদিক সাহিত্যের যুগ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যতগুলি পহেলা নম্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ-সেবক বা স্বরাজ-সাধক ছিলেন না। যারা একাধারে স্বরাজ বা স্বাধীনতার সেবকও বটে

তাহাদের ভিতর বোধ হয় মধ্যযুগের ইতালিয়ান কবি দান্তে এক বড় দৃষ্টান্তস্থল। ইনি ঘোড়-সওয়ার হয়ে দেশের জন্যে লড়েছেন, দেশ-দেশান্তরে নির্বাসিত হয়েছেন ; তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন কাব্যশিল্প সৃষ্টি করেছেন, যা দেখে দুনিয়ার সকলে বলেছে, আর আজও বলছে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম।

ক্ষীরোদপ্রসাদের দুনিয়ায় কথাবস্তু অনেক। আছে সেকাল-একাল, আছে হিন্দু-মুসলমান, আছে বাঙালী-অবাঙালী, আছে হাসি-ঠাট্টা-ছ্যাবলামি, আছে গুরু-গাম্ভীর্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের বই পড়ে কেহ মধ্যযুগের বাংলা বুঝতে চেষ্টা করে। কেহ বর্তমান সাঁওতাল, ডোম, বাগ্‌দীর ইতিবৃত্ত জানতে চেষ্টা করে। কেহ ইতিহাস হিসাবে, কেহ সমাজতত্ত্ব হিসাবে, কেহ পুরাণ হিসাবে, কেহ বেদান্ত-দর্শন হিসাবে, কেহ বৈষ্ণবতত্ত্ব হিসাবে ক্ষীরোদ-সাহিত্যের ভিতর এক একটা চরিত্র দেখতে চেষ্টা করেন। আমি বলি সে-সব দেখা যায় বলিয়াই ক্ষীরোদপ্রসাদ অমর হয়েছেন তা নয়, অথবা অমর থাকবেন তা নয়। এসব থাকা না থাকা অবান্তর কথা।...

সৃষ্টিকার্য অনেক রকমের হতে পারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্টি নতুন জিনিস। মান্ধাতার আমলের মুদ্রারাক্ষস অথবা কিংলিয়রের মতো জিনিস পৃথিবীতে আজকাল আর চলে না। তার জায়গায় আরেকটা জিনিস দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছি। মামুলি চিন্তায় রস নয় প্রকার। কিন্তু তুলনামূলক শিল্প-বিজ্ঞান, চিত্র-বিজ্ঞান, প্রভৃতি নানারকম বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখছি যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রবৃত্তি বা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলি, সেগুলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ মামুলি ভাগে বিভক্ত করা চলে না। ৯×৯=৮১ অথবা এমন কি নয় হাজার, উনিশ হাজার নানারকম জটিল চিত্ত-বৃত্তিতে দেখানো যেতে পারে।...

ক্ষীরোদপ্রসাদের মাথায় এই রস-বৈচিত্র্যের আর বৈচিত্র্য সৃষ্টির

জ্ঞান এসেছিল। যে-কোন চরিত্র আসুক, যে কোন গল্প বা ঘটনা আসুক, তাকে তিনি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিবেন যাতে প্রতি-মুহূর্তে আমরা কবির গড়ন-জ্ঞান বা রূপ-বিদ্যা দেখতে পাব।...

ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশেষত্ব দেখতে পাই, নরনারীর চরিত্র-গুলোকে ভাঙা-গড়ায়। রামা-শ্যামা-আবদুল-ইসমাইল, এরা যে ধরনের লোকই হউক না কেন, সেই লোকগুলোকে তিনি এমন ভাবে গড়ে তুলবেন যাতে পাঠকেরা তাঁর ওস্তাদি বুঝতে পারবে, লোকে বলাবলি করবে—'এই চেহারা এই মূর্তি আগে তো কখনও দেখিনি। অমুক চিত্তবৃত্তির সঙ্গে অমুক চিত্তবৃত্তির যোগাযোগ পূর্বে কখনো নজরে পড়ে নি।' এইভাবে ডজন ডজন চরিত্র সৃষ্টি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ অমরত্ব লাভ করেছেন। বাংলাদেশে পঞ্চাশ ষাট বৎসরের ভিতর যে সমস্ত লোক, মানুষের মতো মানুষ, 'বাপকা বেটা' জন্মেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, 'যে দুনিয়া দেখছি এ দুনিয়া কিছু নয়। এই যে বাংলার নরনারী দেখতে পাচ্ছি তাও কিছু নয়। বাংলাদেশে এমন সম্ভব যা এখন নাই। যা নাই তাই ঠিক, যা আছে তা ঠিক নয়। এই হিসাবে এমন কতকগুলি লোক সৃষ্টি করা দরকার যারা বাংলাদেশকে, বাংলা জাতিকে অভিনবরূপে গড়ে তুলবে।'

ঠিক সেই হিসাবেই, সেই মাপকাঠিতেই বলছি যে,—'বাপকা বেটা' ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যশিল্প একটা নতুন তাজা দুনিয়া সৃষ্টি করে গিয়েছে আর সেই শিল্প-দুনিয়ার লোকগুলি যেন রক্তমাংসেরই জ্যান্ত নরনারী, ঠিক যেমন জ্যান্ত নরনারী আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্নতাময় যুবক ভারত।"

আকাশ জুড়ে উনপঞ্চাশ পবনের ঝড়। সেই ঝড়ের ঘায়ে ভাঙছে পুরনো যা কিছু। জাগছে নতুন যৌবন ঝড়ের ভিতর থেকে অফুরান প্রাণের স্পর্শ নিয়ে। রাজনীতির জগতে রক্তের রঙ, আগুনের উত্তাপ। আত্মপ্রতিষ্ঠার উত্তাল বাসনা। এই পটভূমি

যেমন বাংলাদেশের স্বদেশী গানের বেলায়, স্বদেশী নাটকের বেলায়, তেমনিই একদিন ফুটে উঠল স্বদেশী চিত্রকলার বেলাতেও।

বিদেশী ছবির অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রথম যে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল, সেটা কোন শিল্পীর কণ্ঠ থেকে নয়। তা এক সন্ন্যাসীর। না, সন্ন্যাসী নয়, নতুন ভারত গড়ার তিনিও এক শিল্পী। তাঁর চিত্রপট সারা ভারতবর্ষ। তুলি ভারতবাসী। কালি, মহিমাময় মানবধর্ম। শিল্পীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে প্রথম শোনা গেল বিদেশী নকলনবিশির বিরুদ্ধে ধিক্কার।

"ওদের নকল করে এক আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশী চাল-চিত্রি করা পোটো ভাল। তাদের কাছে তবু ঝকমকে রঙ আছে। ওসব রবি বর্মা-ফর্মার চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।"

রবি বর্মার ছবি তখন ছাপা হচ্ছে কলকাতায় 'প্রবাসী'র পাতায়। চোখে পড়েছে নিবেদিতার। তিনি রামানন্দকে বোঝাতে বসলেন—এগুলো ভারতীয় ছবি নয়। আবার পাশ্চাত্যও হয়ে ওঠে নি পুরোপুরি। বোঝালেন, ভারতের ভাস্কর্য গ্রীক গান্ধার থেকে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর।

গুরুর কাছ থেকে শিষ্যার এই শিল্পদৃষ্টি লাভ। প্যারিসে যেবার ধর্ম ইতিহাসের কংগ্রেসে বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় প্রমাণ করেছিলেন ভারতীয় সভ্যতা বড় হয়েছে গ্রীক সভ্যতার কানাকড়ি ধার না করেই, তখন নিবেদিতা ছিলেন তাঁর পাশে। তারপরও বহুবার দুজনের মধ্যে হয়েছে শিল্পালোচনা চিত্রকলাকে শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, বোধ দিয়ে জানা। বহুবার নিজের বক্তৃতার মালমসলাও যোগাড় করেছেন গুরুর কাছ থেকে। শিল্পকে দেখার তৃতীয় নয়নটি তাই নিবেদিতার ললাট জোড়া।

প্রথম যাচ্ছেন বরোদায়। মহারাজার হোমরা-চোমরা রাজ-কর্মচারীরা এসেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। তাঁদের

সঙ্গে রয়েছেন অরবিন্দও। যেতে যেতে চোখে পড়ল কলেজ বাড়িটা। নিবেদিতা বলে উঠলেন—'What an ugly pile.'

কি কদাকার স্তূপ!

তারপর খানিকটা যেতে না যেতেই চোখে পড়ল ভারতীয় রীতিতে গড়া একটা সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি। নিবেদিতার মুগ্ধ দৃষ্টি। বলে উঠলেন—, 'Oh! how beautiful.'

দুই মন্তব্যই কানে গেল জনৈক রাজকর্মচারীর। তিনি তো শুনে হতবাক্। লাখ টাকার গম্বুজ-বসানো মিনার-হাঁকানো বাড়িটা হল কদাকার। আর কোথাকার কোন গেরস্তর কুঁড়েঘরটা হল অপূর্ব। কর্মচারীটি আর নিজের শিল্পবোধকে চেপে রাখতে পারলেন না। অরবিন্দর কানে কানে বললে—'I say, she is mad.'

এইরকম সব রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা চটকদারী বিদেশীয়ানার হাত থেকে নিবেদিতা মনে প্রাণে চেয়ে ছিলেন এদেশের শিল্পকে বাঁচাতে। এতে তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। উদ্যোগ অনলস। তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর পাতায় পাতায়। ইংরেজীতে তিনি নিয়মিত সেখানে লিখতেন 'চিত্র পরিচয়'। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার প্রমুখ স্বদেশী শিল্পীদের ছবির নিপুণ রস-বিশ্লেষণ ফুটে উঠতো তাঁর রসালো কলমে। সেই সঙ্গে বিদেশী classic চিত্রেরও। রামানন্দ তার বাঙলা অনুবাদ করে ছাপতেন প্রবাসীতে। 'চিত্র পরিচয়' ছাড়া নিয়মিত প্রবন্ধ বেরুত তাঁর, ভারত শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়, বিভিন্ন দিকের তুলনাহীন উৎকর্ষতাকে উন্মোচিত করে।

মুক্তিপ্রাণা লিখছেন—

"নিবেদিতা ছিলেন শিল্পী। ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ে তাঁহার দান কতখানি, তাহার উল্লেখ ব্যতীত আধুনিক ভারত-শিল্পের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি বলিতেন,

'শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।' বস্তুতঃ তাঁহাকে ভারতীয় চিত্রকলার ধাত্রী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসের প্রারম্ভে কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই, বি, হ্যাভেলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ঐ সময় হইতেই শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শিল্প ও শিল্পরসিকগণের যে সভা বসিত, তিনি ছিলেন তাহার অন্যতম উৎসাহী। তখন হইতেই অবনীন্দ্রনাথের সহিতও তাঁহার পরিচয়। মিঃ হ্যাভেল, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ, এই তিনজনের মিলন ভারতীয় চিত্রকলায় যুগান্তর আনিয়াছিল। ঐ চিত্রকলা সম্বন্ধে মিঃ হ্যাভেলের উচ্চ ধারণা থাকায় তিনি উহার গূঢ় অর্থ গ্রহণে উৎসুক ছিলেন। নিবেদিতার সহিত প্রথম সাক্ষাতে তিনি চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন,—'আমি ছেলেদের তুলি ধরতে এবং রং দিতে শেখাতে পারি, কিন্তু কাউকে শিল্পী করে তুলতে পারি না।' নিবেদিতার মনে হইল, তিনি নিজে পারেন।"

অবনীন্দ্রনাথ অন্য কাউকে শিল্পী করে তুলতে পেরেছিলেন কি পারেন নি, সেতো আমাদের অজানা নয়। সে কথা যাক্। তিনি নিজে কিভাবে শিল্পী থেকে স্বদেশী যুগের শিল্পী এবং নতুন-জাগা ভারত-শিল্পের জনক হয়ে উঠলেন সে কথায় আসা যাক্।

স্বদেশী যুগের সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী শিল্পের ভাবনাটা মাথায় এসেছিল তাঁর। "ছবি দেশী মতে ভাবতে হবে, দেশী মতে দেখতে হবে। রবি বর্মাও তো দেশী মতে ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেন নি। সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হল আমাদের পালা। বিলেতী পোট্রেট আঁকতুম, ছেড়েছুড়ে দিয়ে পট-পটুয়া যোগাড় করলুম। যে দেশে যা কিছু নিজের নিজের শিল্প আছে সব যোগাড় করলুম।"

শুরু হল ভারতশিল্পের নতুন পথ, নতুন প্রাণের সন্ধান। নন্দলালের ভাষায় "আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষ নজরে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে গেছে। সেই শুভলগ্নেই নবজন্ম হল একালের ভারতকলালক্ষ্মীর।"

প্রথম তাঁর যে-ছবিতে সাড়া পড়ে গেল দেশ জুড়ে, তা হল ভারতমাতার ছবি।

"আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি। হাতে অন্নবস্ত্র, বরাভয়। এক জাপানী আর্টিষ্ট সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে।......রবিকাকা গান তৈরি করলেন। দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে করে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল।"

গোড়ায় ঐ ছবির নাম ছিল বঙ্গমাতা। সে নাম পাল্টে দিলেন নিবেদিতা। ভারতমাতা। স্বদেশী আমলে যে কোন শোভাযাত্রার পুরোভাগে তার ছিল স্থান। নিবেদিতার উৎসাহেই জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর ঘরের দেওয়ালে ভারতমাতার ছবির একটা বিরাট আকারের রেখাচিত্র আঁকিয়ে নিয়েছিলেন।

তারপর শুরু হয়ে গেল অবনীন্দ্রনাথের স্কুল-মাস্টারী। একে একে ছাত্র জুটে গেল, সুরেন গাঙ্গুলী, নন্দলাল, অসিত হালদার এঁরা সব। নিবেদিতা নিজের তাগিদে এঁদের কাউকে পাঠালেন অজন্তার কপি করতে। কাউকে বোঝালেন, কী ভাবে রামায়ণ মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলো রূপ দিতে হবে নতুন যুগের ছবিতে।

অবনীন্দ্রনাথেরও সেই ভাবনা।

"এখন এক পণ্ডিত এসে জুটে গেলেন—চাকরি চাই। আমি

বললুম, বেশ লেগে যান. রোজ আমাদের মহাভারত রামায়ণ পড়ে শোনাবেন। আমাদের বাল্যকালের পণ্ডিত, নাম রজনী পণ্ডিত। সেই পণ্ডিত রোজ এসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতেন। আর তাই থেকে ছবি আঁকতুম।

নন্দলাল বললে, 'কি আঁকব?' আমি বললুম, 'আঁকো কর্ণের সূর্যস্তব। ও বিষয়টা আমি চেষ্টা করেছিলুম, ঠিক হয় নি। নন্দলাল এঁকে নিয়ে এল। আমি তার উপর এই দু-তিনটে ওয়াশ দিয়েছিলুম ছেড়ে—হাতে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাই নি।...নন্দলাল সূর্যের স্তব আঁকল তো সুরেন এদিকে রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন আঁকল, এই তীর-ধনুক বাঁকিয়ে রামচন্দ্র উঠে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নন্দলাল এঁকে আনল একটি মেয়ের ছবি, বেশ গড়ন-পিটন, টানা টানা চোখ ভুরু। আমি বললুম, 'এতো হল কৈকেয়ী, পিছনে মন্থরা বুড়ী এঁকে দাও'। হয়ে গেল কৈকেয়ী মন্থরা। ছবির পর ছবি বের হতে লাগল। চারিদিকে তখন খুব সাড়া পড়ে গেল, ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি খুলে গেল, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ান আর্ট শব্দ অভিধান ছেড়ে সেই প্রথম লোকের মুখে ফুটল।"

স্বদেশী যুগের হাওয়ায় এই হল স্বদেশী ছবির ফুটে ওঠার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের রাজা অবনীন্দ্রনাথ। আর যে-সব রত্ন উৎসাহ-উদ্দীপনা উপদেশ দিয়ে রাজসভাকে অলঙ্কৃত করে রাখতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিবেদিতা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী প্রভৃতি শিল্পজ্ঞানীর দল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে অরবিন্দ স্বদেশী শিল্পের কথা বলতে গিয়ে নিজের 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখলেন—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভায় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পর আশা করা যায় যে, ভারত

ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাক্তন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।"

'কর্মযোগীনে' লিখলেন '...for the first time since the decline of the Moghouls a new school of National Art developing itself, the school of which Abanindranath Tagore is the founder and master."

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সেদিন শুধু মানুষকে উত্তেজিত করে নি। উদ্বোধিত করেছিল আত্মানুসন্ধানে, আত্মসংগঠনে। এই আন্দোলন শুধু রক্তপাতে মৃত্যুতে, হত্যায়, আত্মহননেই বড় নয়। বড় কাব্যে, সাহিত্যে, সংগীতে, নাটকে শিল্পে, এইটেই তার বিরাটত্বের চিহ্ন। ব্যাপকত্বের প্রমাণ।

এইখানেই তার দাবি অবিনশ্বর স্মৃতির।

তাই সে মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ।

তাই ধন্য এ জাগরণ।

॥ গ্রন্থসূচী ॥

আত্মপরিচয় । কৃষ্ণকুমার মিত্র
জীবনস্মৃতি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘরোয়া । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জোড়াসাঁকোর ধারে । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ । হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়
কংগ্রেস ও বাংলা । হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস । হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ । গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ । গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
নিবেদিতা । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
নিবেদিতা । লেজেল রেমঁ—অনুবাদ নারায়ণী দেবী
কারাকাহিনী । অরবিন্দ ঘোষ
আমার আত্মকথা । বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
স্বদেশীযুগের স্মৃতি । মতিলাল রায়
ভারতে জাতীয় আন্দোলন । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-জীবনী । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বিনয় সরকারের বৈঠকে । বিনয় সরকার
নয়া বাংলার গোড়াপত্তন । বিনয় সরকার
ভারতের মুক্তি সন্ধানী । যোগেশচন্দ্র বাগল
হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত । যোগেশচন্দ্র বাগল
অশ্বিনীকুমার দত্ত । সুরেন্দ্রনাথ সেন
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার । শরৎকুমার রায়
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ । প্রফুল্লকুমার সরকার
যজ্ঞ ভঙ্গ । প্রিয়নাথ গুহ
শহীদ যুগল । নগেন্দ্রনাথ গুহ

দেশবন্ধু স্মৃতি । হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল । দেবকুমার রায়চৌধুরী
কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ । সূর্যকুমার ঘোষাল
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ । মণি বাগচী
কান্তকবি রজনীকান্ত । নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
রমেশচন্দ্র দত্ত । রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্দনা । সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা । হরপ্রসাদ মিত্র
শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা ও জীবনদর্শন । প্রমদারঞ্জন ঘোষ
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী । যোগেশচন্দ্র বাগল
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য । সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় । প্রবোধচন্দ্র সিংহ
বাংলার নবযুগ । বিপিনচন্দ্র পাল
স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্ত রায় । সংকলন
বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা । নলিনীকিশোর গুহ
সাহিত্যসাধক চরিতমালা ।
প্রবাসী । ভারতী । বঙ্গদর্শন । ভাণ্ডার । জয়শ্রী । কবিতা । দেশ
The Origin of the National Education Movement । Haridas & Uma Mukhopadhaya
Bandemataram & Indian Nationalism । Haridas & Uma Mukhopadhaya
Roll of Honour । K. C. Ghosh
History of the Freedom Movement in India । R. C. Majumdar
Millitant Nationalism in India । Biman Behari Majumdar
A Nation in the making । Surendra Nath Banerjee

—